বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড

…টিক্যাল ওয়ার্কস

লিমিটেড কলিকাতা

# জবা কুসুম তৈল।

হও' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। এই ৫০ জনের মধ্যে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মূতিব নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুসংহিতায় পৌণ্ড্রেরা পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়ে দেখা যায়, ভীম পুণ্ড্রাধিপকে জয় করিয়া বঙ্গরাজ-জয়ে গমন করেন। অতএব মহাভারতের কালে বঙ্গের পশ্চিমভাগ পুণ্ড্ররাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

মহিমাচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে ৭০০।৮০০ খৃষ্টের পূর্ব্বে ভোজগোড় নামক এক নৃপতি গৌড় নগর স্থাপন করেন।

বর্ত্তমান সাহাবাদ জেলার ভবুয়া মহকুমায় বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। ঐ স্থানের নাম ভোজপুর।

ঋগ্বেদে বিশ্বামিত্র ঋষির বিরচিত একটী সূক্তের দুইটী ঋকে কীকট, প্রমগন্দ ও ভোজ শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বটব্যাল মহাশয় উল্লিখিত প্রমাণ সকলের দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, বিশ্বামিত্রের যজমানগণ ভোজ নামে খ্যাত ছিল। বর্ত্তমান ভোজপুরে তাহাদের রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ এই ভোজপুরের ভোজ-গোড় নামক নৃপতিই গৌড় নগর স্থাপন করেন। পৌণ্ড্রগণ গৌড় দেশে বাস করিত, এবং উহারাই বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত-পুত্র-বংশীয় ছিল।

আমরা প্রথমতঃ বিশ্বামিত্র-রচিত ঋক্দ্বয় উদ্ধৃত করিয়া, বটব্যাল মহাশয়ের যুক্তি কত দূর সমীচীন, তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

কিম্। তে। কৃণ্বন্তি। কীকটেষু। গাবঃ ন। আশিরং। দুহ্রে। ন। তপন্তি। ঘর্ম্মম্।
আ। নঃ। ভর। প্রমগন্দস্য। বেদঃ নৈচাশাখম্। মঘবন্। রন্ধয়। নঃ।—৩।৫৩।১৪

কীকটদিগের গো সকল তোমার কি করে? (তাহারা) তোমার আশির (অর্থাৎ সোম-মিশ্রণ-দুগ্ধ) দোহন করে না। তোমার (সোমের) ঘড়া উত্তপ্ত করে না। হে মঘবন্! প্রমগন্দের ধন আমাদিগকে দাও; নীচাশাখ পুত্রকে আমাদিগের বশে আনয়ন কর।

[ সায়নাচার্য্য কীকটের 'অনার্য্য জনপদ সকল বা যাগ হোমাদি ক্রিয়ায় অবিশ্বাসী নাস্তিক' অর্থ করেন। প্রমগন্দ শব্দের অর্থ করেন—কুসীদি-কুল। ]

ইমে। ভোজাঃ। অঙ্গিরসঃ। বিরূপাঃ দিবঃ। পুত্রাসঃ। অসুরস্য। বীরাঃ।
বিশ্বামিত্রায়। দদতঃ। মঘানি সহস্রসাবে। প্র। তিরন্তে। আয়ুঃ।—৩।৫৩।৭

এই সকল ভোজ, বিবিধ-রূপ-যুক্ত, অঙ্গিরার বংশীয় পুত্রগণ, অসুরের বীরগণ, সহস্র (সোম) অভিষব যজ্ঞে বিশ্বামিত্রকে ধন সকল প্রদান করে, আয়ু বর্দ্ধিত করে।

বটব্যাল মহাশয় ১৪শ ঋক্ হইতে অনুমান করিয়াছেন, বিশ্বামিত্রের বাসস্থান কীকটদিগের সন্নিহিত ছিল, এবং কীকটদিগের দেশই মগধ দেশ। কারণ, এই

ঋকে 'প্রমগন্দ' শব্দ বর্ত্তমান। তাঁহার মতে, প্রমগন্দ হইতে মগন্দ এবং পরে মগন্দ হইতে মগধ শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। (১) এই শব্দতত্ত্ব দ্বারা তিনি কীকট-দিগের দেশকে মগধ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দেখাইয়াছেন, মগধের ঠিক্ পশ্চিমে অবস্থিত সাহাবাদ জেলার ভোজপুর নগরে বিশ্বামিত্রের যজমান ভোজগণ বাস করিতেন। কীকটগণ ভোজদিগের প্রতিবেশী বলিয়াই তাহাদের উপর উপদ্রব করিত, (২) ইহাই বটব্যাল মহাশয়ের ধারণা।

রাজা সুদাস দশ জন অ-যজ্ঞকারী রাজার সহিত যমুনাতীরে এক যুদ্ধ করেন। ঐ যুদ্ধ ভেদের যুদ্ধ বলিয়া বেদে প্রসিদ্ধ। বিশ্বামিত্র ঋষি ভারত-দিগের অধিনায়ক হইয়া সুদাসের সাহায্যার্থ ঐ যুদ্ধে গমন করেন। এই যুদ্ধ-জয়ের পর সুদাস এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞের অশ্ব লইয়াই বিশ্বামিত্র ঋষি কুশিকদিগের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হন। বটব্যাল মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, বিশ্বামিত্রের অনুচর 'কুশিকেরা সুদাসের অশ্বমেধের অশ্ব-রক্ষণে নিযুক্ত হয়েন।' (৩) পূর্ব্বোদ্ধৃত যে দুইটী ঋকের বলে বটব্যাল মহাশয় বিশ্বামিত্রের বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ঐ দুইটী একই সূক্তের অন্তর্গত। এই সূক্তটী বিশ্বামিত্র ঋষির বিরচিত। আমরা অনুমান করি, তিনি অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া ভ্রমণের কালে কীকটদিগের নিকট বাধা প্রাপ্ত হইলে, একটী যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র ও মরুৎগণকে রক্ষার্থ আহ্বান করেন। সেই যজ্ঞের জন্যই এই সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন। এরূপ অনুমান করিবার কারণ আমরা নিম্নে যথাক্রমে প্রকাশ করিতেছি।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের ভ্রমণের কি নিয়ম ছিল, তাহা শতপথ ব্রাহ্মণে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। (৪) এই ব্রাহ্মণ যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ ও ঋগ্বেদের

---

(১) বেদ-প্রবেশিকা; পৃঃ ৫৪।

(২) 'কীকট-ভূমির অন্য নাম মগন্দ, বা মগধ রাজ্য। ইহাতে মগধের সীমান্তেই বিশ্বামিত্রের বাস ছিল, বোধ হইতেছে। অন্যথা, মগধের দস্যুগণের সহিত বিশ্বামিত্র-যজমান-গণের বিরোধের কারণ কি? মগধের পশ্চিম পার্শ্বেই ভোজপুর। ইহাতেও বিশ্বামিত্রকে ভোজপুরীয়া বলিয়া অনুমান করি।'—বেদ-প্রবেশিকা, পৃঃ ৫৪।

(৩) বেদ-প্রবেশিকা; পৃঃ ১৪১।

(৪) In front (of the sacrificial ground) there are those keepers of it ready at hand,—to wit, a hundred royal princes, clad in armour; a hundred warriors armed with swords; a hundred sons of heralds and headmen, bearing quivers filled with arrows; and a hundred sons

পরে রচিত হইলেও, এই নিয়ম যে ঋগ্বেদের কালেও প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

অশ্বমেধের অশ্ব এক বৎসর তাহার ইচ্ছামত ভ্রমণ করিবে, এই নিয়ম শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যাইতেছে। এই ভ্রমণকালে তাহার সহিত শত বর্ম্মধারী রাজপুত্র, শত খড়্গধারী বীর, শত ধনুর্ব্বাণধারী ভট্ট ও গ্রামাধ্যক্ষ, শত যষ্টিধারী সারথি ও অনুচর এবং শত বৃদ্ধ অশ্ব গমন করিত। ইহাকে দিকে দিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আপ্য, সাধ্য, অন্বাধ্য ও মরুৎগণকে প্রার্থনা করা হইত।

অশ্বমেধের অশ্বকে ভ্রমণের জন্য মুক্ত করিবার সময় একটী যজ্ঞ করা হইত। পাছে শত্রুগণ ঐ অশ্বের অনিষ্ট করে, বা উহাকে আবদ্ধ করে, সেই জন্য উহার সহিত বীরপুরুষগণ গমন করিতেন। যদি কোনও জাতি অশ্বের ভ্রমণে বাধা দিত, তবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ বাধিত। আমরা অনুমান করি, বিশ্বামিত্র-প্রমুখ ভারতদিগের সহিত কীকট জাতির এইরূপ এক যুদ্ধ হইয়াছিল। বৈদিক যুগে, যুদ্ধকালে যজ্ঞ করিয়া দেবতাদিগের সহায়তা-লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইত। বিশ্বামিত্রও কীকটদিগের সহিত যুদ্ধকালে একটী যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র ও মরুৎদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঐ যজ্ঞে তিনি যে স্তব পাঠ করেন, তাহাই ৩য় মণ্ডলের ৫৩ সূক্ত; এবং বটব্যাল মহাশয়-ধৃত দুইটী ঋক্ ইহারই অন্তর্গত।

বিশ্বামিত্র ঋষি যে যজ্ঞে এই সূক্ত পাঠ করেন, তাহা অশ্বমেধের অশ্বকে এক বৎসর ভ্রমণার্থ মোচন করিবার যজ্ঞ নহে। কারণ, ঘোটক কোন্ স্থানে বা কোন্ জাতি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইবে, তাহা তখন জানা থাকে না। কিন্তু বিশ্বামিত্র-ঋষি-বিরচিত সূক্তে কীকটগণ শত্রুরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব আমাদের অনুমান যে সত্য, তাহা এই ঋক্ই সপ্রমাণ করিতেছে। এই সূক্তের অপরাপর

of attendants and charioteers, bearing staves ; and a hundred exhausted, worn-out horses amongst which, having let loose that ( sacrificial horse ), they guard it.—*XIII Kanda, 4 Adhyaya, 2 Brahmana 5.*

He says, 'O ye gods, guardians of the regions, guard ye this horse, consecrated for offering unto the gods !' The ( four kinds of ) human guardians of the ( four ) regions have been told, and these now are the divine ones, to wit, the Apyas, Sadhyas, Anvadhyas, and Maruts ; and both of these, gods and men, of one mind, guard it for a year without turning it back.—*XIII Kanda, 4 Adhyaya, 2 Brahmana, 16. Satapatha-Brahman Vol. V. pp. 355 and 359.*

ঋক্‌ও যে আমাদের মতের সমর্থন করে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত নিম্নে কতক-গুলি উদ্ধার করা যাইতেছে। (১)

উদ্ধৃত ৮ম ঋকে ইন্দ্রকে অনৃতুপা বলা হইয়াছে। কারণ, ইন্দ্র যুদ্ধের দেবতা বলিয়া অনেক সময় তাঁহার যজ্ঞের কালাকাল বিচার করা চলে না। ঋষি

---

(১) রূপং রূপং। মঘবা। বোভবীতি মায়াঃ। কৃণ্বানঃ। তন্বম্। পরি। স্বাম্।
ত্রিঃ। যৎ। দিবঃ। পরি। মুহূর্ত্তম্ আ। অগাৎ। স্বৈঃ। মন্ত্রৈঃ। অনৃতুপাঃ। ঋতাবা॥
—৩।৫৩।৮

মঘবান্ (ইন্দ্র) মায়া করিয়া নিজ তনুকে নানা রূপ দিতে পারেন। যেমন দিব্য লোক হইতে তিন (সবনে) ঋতুকালে সোমপানকারী (ইন্দ্র) স্বীয় মন্ত্র সকলের দ্বারা (আহূত হইয়া) মুহূর্ত্তমধ্যে আগমন করেন, অঋতুতেও (তিনি) সোমপানকারী।

মহান্। ঋষিঃ। দেবজাঃ। দেবজূতঃ অস্তভ্নাৎ। সিন্ধুং। অর্ণবম্। নৃচক্ষাঃ।

বিশ্বামিত্রঃ। যৎ। অবহৎ। সুদাসম্ অপ্রিয়ায়ত। কুশিকেভিঃ। ইন্দ্রঃ।—ঐ ৯

মহান্, ঋষি, দেবজাত, দেব-তেজে আকৃষ্ট, অধ্বর্য্যুদিগের মধ্যে তেজস্বী বিশ্বামিত্র জলপূর্ণ সিন্ধুকে নিরোধ করিয়াছিলেন, যখন সুদাসকে বহন করিয়াছিলেন; ইন্দ্র কুশিকদিগের সহিত প্রিয়বৎ আচরণ করিয়াছিলেন।

হংসাঃ ইব। কৃণুথ। শ্লোকম্। অদ্রিভিঃ অদন্তঃ। গীঃভিঃ। অধ্বরে। সুতে। সচা।

দেবেভিঃ। বিপ্রাঃ। ঋষয়ঃ। নৃচক্ষসঃ। বি পিবধ্বম্। কুশিকাঃ। সোম্যম্। মধু॥—ঐ ১০

হংস সকলের মত শ্লোক (উচ্চারণ) কর; মুষল দ্বারা যজ্ঞে সোম অভিষুত হইলে গীতি দ্বারা মত্ত হও। হে বিপ্র, ঋষি, নৃচক্ষা কুশিকগণ দেবতাদিগের সহিত সোম্যমধু পান কর।

উপ। প্র। ইৎ। কুশিকাঃ। চেতয়ধ্বম্ অশ্বং। রায়ে। প্র। মুঞ্চত। সুদাসঃ।

রাজা। বৃত্রম্। জঙ্ঘনৎ। প্রাক্। অপাক্ উদক্। অথ। যজাতে। বরে। আ। পৃথিব্যাঃ॥
—ঐ ১১

হে কুশিকগণ। সুদাসের অশ্ব-সমীপে গমন করিয়া চেতনা দাও, এবং ধনলাভার্থ মোচন কর। রাজা (সুদাস) পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকের বৃত্রকে বধ করিয়াছেন, অনন্তর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশে যজ্ঞ করিতেছেন।

যঃ। ইমে। রোদসী। উভে অহম্। ইন্দ্রম্। অতুষ্টবম্।

বিশ্বামিত্রস্য। রক্ষতি। ব্রহ্ম ইদম্। ভারতম্। জনম্॥—ঐ ১২

যে আমি উভয় দ্যাবা-পৃথিবীকে (ও) ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছি; বিশ্বামিত্রের স্তোত্র এই ভারত-জনকে রক্ষা করে।

বিশ্বামিত্রাঃ। অরাসত। ব্রহ্ম। ইন্দ্রায়। বজ্রিণে।

করৎ। ইৎ। নঃ। সুরাধসঃ॥—ঐ ১৩

বিশ্বামিত্রগণ বজ্রধারী ইন্দ্রের নিমিত্ত স্তব করিয়াছে; (তিনি) আমাদিগকে সুন্দর ধন প্রদান করুন।

বিশ্বামিত্র বিপদে পড়িয়াই অঋতুতে, অর্থাৎ অসময়ে তাঁহার যজ্ঞ করিতেছেন, এই ঋকে তাহারই আভাস দিয়াছেন। ভেদের যুদ্ধে গমনের সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষি বিপাশ ও শুতুদ্রী নদীর সঙ্গমস্থলে আগমন করিয়া দেখেন, তাহারা জল-পূর্ণা হইয়াছে। রথ, শকট, সৈন্য লইয়া পার হওয়া অসম্ভব। সেই জন্য তিনি

---

কিম্। তে। কৃণ্বন্তি। কীকটেষু। গাবঃ...।—ঐ ১৪

( পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়া অর্থ করা গিয়াছে )

স্থিরৌ। গাবৌ। ভবতাম্। বীডু। অক্ষঃ মা। ঈষা। বি। বর্হি। মা। যুগম্। বি। শারি।

ইন্দ্রঃ। পাতল্যে। দদতাম্। শরীতোঃ অরিষ্টনেমে। অভি। নঃ। সচস্ব॥—ঐ ১৭

( শকটের ) গোদ্বয় দৃঢ় ও ( শকটের ) অক্ষ দৃঢ় হউক্; দণ্ড না ভাঙ্গুক, যুগ বিদীর্ণ না হউক্; ইন্দ্র পতনকালে কীলকদ্বয়কে ধারণ কর; হে অরিষ্টনেমি রথ! আমাদিগের অভিমুখে সংগত হও।

বলং। ধেহি। তনূষু। নঃ বলং। ইন্দ্র। অনড়ুৎসু। নঃ।

বলং। তোকায়। তনয়ায়। জীবসে ত্বং। হি। বলদাঃ। অসি॥—ঐ ১৮

হে ইন্দ্র! আমাদিগের দেহ সকলে বল ধারণ কর, আমাদিগের বৃষ সকলে বল ( ধারণ কর ); পুত্র পৌত্রকে জীবন-( রক্ষার ) জন্য বল ( দাও ); তুমিই বলদাতা হও।

অভি। ব্যয়স্ব। খদিরস্য। সারম্ ওজঃ। ধেহি। স্পন্দনে। শিংশপায়াম্।

অক্ষ। বীড়ো। বীড়িত। বীড়য়স্ব। মা যামাৎ। অস্মাৎ। অব। জীহিপঃ। নঃ॥—ঐ ১৯

খদিরের সারকে ( আণির জন্য ) দৃঢ় কর; শিংশপা কাষ্ঠের স্পন্দনে শক্তি প্রদান কর; হে অক্ষ! দৃঢ় হও, দৃঢ়ীকৃত হও; এই গমন হইতে আমাদিগকে পাতিত করিও না।

অয়ম্। অস্মান্। বনস্পতিঃ মা। চ। হাঃ। মা। চ। রিরিষৎ।

স্বস্তি। আ। গৃহেভ্যঃ। আ অবসৈ। আ। বিমোচনাৎ॥—ঐ ২০

এই বনস্পতি ( অর্থাৎ রথ ) আমাদিগকে যেন না ফেলে, এবং বিনাশ না করে। গৃহে প্রত্যা-গমন, রথবেগ-সংবরণ ( ও অশ্ব )-বিমোচন পর্য্যন্ত মঙ্গল হউক।

ইন্দ্র। উতিভিঃ। বহুলাভিঃ। নঃ অদ্য। যাৎশ্রেষ্ঠাভিঃ। মঘবন্। শূর। জিন্ব।

যঃ। নঃ। দ্বেষ্টি। অধরঃ। সঃ। পদীষ্ট যম্। উঁ। দ্বিষ্মঃ। তম্। উঁ। প্রাণঃ। জহাতু॥

—ঐ ২১

হে ইন্দ্র। হে মঘবন্। হে শূর! অদ্য আমাদিগকে বহুল রক্ষার দ্বারা, বধ হইতে বাঁচাইবার শ্রেষ্ঠ ( রক্ষা ) সকলের দ্বারা প্রীত কর। যে আমাদিগকে দ্বেষ করিবে, সে দক্ষিণ দিকে ( বা নিম্ন দিকে ) গমন করিবে। ( আমরা ) যাহাকে দ্বেষ করিব, প্রাণ তাহাকে ত্যাগ করুক।

পরশুম্। চিৎ। বি। তপতি শিম্বলং। চিৎ। বি। বৃশ্চতি।

উখা। চিৎ। ইন্দ্র। যেষন্তী প্রযস্তা। ফেনম্। অস্যতি॥—ঐ ২২

হে ইন্দ্র! যেমন কুঠারকে ( প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষ ) দুঃখ পায়, ( যেমন ) শিম্বলকে ছেদ করে; কাটা স্থালী হইতে যেরূপ, ( যেটার ) সেইরূপ ( মুখ হইতে ) ফেনা বহির্গত হউক।

নদীদ্বয়ের স্তব করেন। তাহাতে জল কমিয়া গিয়াছিল, এবং তিনি সুখে সসৈন্যে পার হইয়াছিলেন। ৯ম ঋকে এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। সায়ণাচার্য্যও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র ঋষি সুদাসকে লইয়া নদীদ্বয় পার হইয়া গেলে, ইন্দ্র কুশিকদিগের প্রিয় কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহা উল্লেখ করতঃ কুশিকদিগকে তিনি সাহস দিতেছেন। ১০ম ঋকে তিনি কুশিকদিগকে সোম-পানে মত্ত হইতে বলিতেছেন। ১১শ ঋকে সুদাসের অশ্বকে চেতনা দিয়া বন্ধন-মোচন করিবার আদেশ দিতেছেন। এই ঋকে ইহাও জানাইতেছেন যে, সুদাস ঐ সময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থানে যজ্ঞে বৃত হইয়াছেন। ঐ শ্রেষ্ঠ স্থান আমরা রাভী নদীর তীর বলিয়া অনুমান করি। কারণ, তথায় সুদাসের রাজধানী ছিল। ১২শ ও ১৩শ ঋকে, রোদসী ও ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের স্তবে প্রীত হইয়া কুশিকদিগকে রক্ষা করিবেন, এই বলিয়া তিনি উৎসাহ দিতেছেন। কারণ, কীকটদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত। পর ঋকেই কীকটদিগের উল্লেখ রহিয়াছে। অনুদ্ধৃত ১৫শ ও ১৬শ ঋকে তিনি জমদগ্নির বাক্য উচ্চারণ

ন। সায়কস্য। চিকিতে। জনাসঃ লোধং। নয়ন্তি। পশু। মন্যমানাঃ।

ন। অবাজিনম্। বাজিনা। হাসয়ন্তি ন। গর্দভম্। পুরঃ। অশ্বাৎ। নয়ন্তি।—ঐ ২৩

হে জনগণ। (বেষ্টা) সায়কের (তেজ) জানে না; লুব্ধকে (অর্থাৎ বেষ্টাকে) পশু মনে করিয়া আনিতেছে। (দেবগণ) জ্ঞানী দ্বারা অজ্ঞানীকে হাসান না; অশ্বের অগ্রে গর্দভকে লইয়া যান্ না।

[আমরা মনে করি, বিশ্বামিত্রের বক্তব্য এই:—হে ভারতজন! শত্রু আমাদের সায়কের তেজ জানে না। ঐ দেখ, শত্রুকে পশুর মত ধরিয়া আনিতেছে। আমি জ্ঞানী, ঋষি; কিন্তু আমাদের শত্রুগণ অজ্ঞানী। ইন্দ্র কি অজ্ঞানীদিগকে জয় প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সুখী করিবেন? অশ্বের অগ্রে গর্দভকে লইয়া যাইবেন? তাহা কখনই নহে। সায়নাচার্য্য ইহার অন্য অর্থ করিয়াছেন।]

ইমে। ইন্দ্র। ভরতস্য। পুত্রাঃ অপপিত্বম্। চিকিতুঃ। ন। প্রপিত্বম্।

হিন্বন্তি। অশ্বম্। অরণম্। ন। নিত্যং জ্যাবাজং। পরি। নয়ন্তি। আজৌ।—ঐ ২৪

হে ইন্দ্র! এই ভরতের পুত্রগণ (বেষ্টার সহিত) শত্রুতা জানে, মিত্রতা জানে না। (তাহারা) অরণসদৃশ অশ্বকে নিত্য প্রেরণ করে; যুদ্ধে জ্যা-রূপ বল (অর্থাৎ ধনু) লইয়া যায়।

[নিরুক্তের টীকাকার বসিষ্ঠ-বংশীয়; সুতরাং তিনি এই ঋক্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'সা বসিষ্ঠদ্বেষি ঋক্ অহঞ্চ কাপিষ্ঠলো বাসিষ্ঠঃ অতঃ তাং ন নির্ব্রবীমি।' আচার্য্য রোথ ও মক্ষমুলর বলেন, ঋগ্বেদের অনেক হস্তলিপিতে এই ঋক্ একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। রমেশবাবুর ঋগ্বেদসংহিতা পৃঃ ৪২১

করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, এই ঋষির বাক্য 'পঞ্চজন'-দিগের কৃষকদিগকে সুমতি ও নূতন আয়ু প্রদান করে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বিশ্বামিত্র ঋষি, আর্য্য পঞ্চ-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই যজ্ঞে ইন্দ্র ও মরুৎদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ ঋকে তিনি রথে, রথবাহক বৃষে, পুত্র ও পৌত্রের দেহে বল প্রদান করিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। এ প্রার্থনা কিসের জন্য? কোনও যুদ্ধের প্রাক্কালেই এরূপ প্রার্থনার সার্থকতা বুঝা যায়। ২০শ ঋক্ আমাদের মতের সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। এই ঋকে দেখা যাইতেছে যে, ঋষি নিজ গৃহ হইতে দূরে আসিয়াছেন। এই দূর দেশ হইতে যেন 'ভালয় ভালয়' গৃহে প্রত্যাগমন ও অশ্ববিমোচন করিতে পারেন, এই প্রার্থনা করিয়াছেন। ২১শ হইতে ২৩শ ঋকে শত্রু-সংহারের প্রার্থনা আছে। ২৪শ ঋক্, সায়ন মনে করেন, বিশ্বামিত্র ঋষি বসিষ্ঠদিগের বিরুদ্ধে রচনা করিয়াছেন। অথচ ঐ ঋকে বা সমগ্র সূক্তের মধ্যে বসিষ্ঠের নামগন্ধ নাই। এই ঋকের উপর নির্ভর করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, বিশ্বামিত্র ঋষি দশটী ভারত জাতির সৈন্যাধ্যক্ষ (বা পুরোহিত) হইয়া রাজা সুদাসের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। পরাজিত হইয়া তিনি যখন গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন এই যজ্ঞ করেন। এই মত যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা এই সূক্তের অন্তর্গত ৯ম ও ১১শ ঋক্দ্বয়ের দ্বারা সুন্দররূপে সপ্রমাণ করা যায়। সায়নাচার্য্য ২৪শ ঋকের অর্থে বসিষ্ঠ ঋষিকে বিশ্বামিত্রের শত্রু-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ৯ম ঋকের অর্থে তিনি বিশ্বামিত্রকে সুদাসের মিত্র-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন, সায়নাচার্য্য এই স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রমেশ বাবু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতের অনুসরণ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতেছে।

'মূলে "বিশ্বামিত্রো যৎ অবহৎ সুদাসম্" এইরূপ আছে। সায়ন অর্থ করিয়াছেন যে, বিশ্বামিত্র সুদাসের জন্য যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু "অবহৎ" শব্দের সে অর্থ সঙ্গত নহে। এবং বিশ্বামিত্র সুদাসের শত্রুদিগের পুরোহিত, সুদাসের জন্য যজ্ঞ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে।'—৩।৫৩ সূক্তের ৯ম ঋকের পাদটীকা।

রমেশবাবু এই মত অবলম্বন করিয়া ৯ম ঋকের এই অর্থ করিতেছেন :—তিনি (অর্থাৎ বিশ্বামিত্র) সুদাস রাজাকে তাড়না করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রকে

কুশিক-বংশীয়দের প্রিয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ১১শ ঋকের কিরূপ অর্থ করিতেছেন, পাঠক একবার দেখুন:—'হে কুশিকগণ! তোমরা অশ্বের সমীপে গমন কর, অশ্বকে উত্তেজিত কর, ধনের জন্ম সুদাসের অশ্বকে ছাড়িয়া দাও। রাজা ইন্দ্র বৃত্রকে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দেশে বধ করিয়াছেন, অতএব সুদাস রাজা পৃথিবীর উত্তম স্থানে যজ্ঞ করিতেছেন।'

কেহ কি অনুমান করিতে পারেন, বিশ্বামিত্র ঋষি সুদাসের শত্রু হইয়া যজ্ঞে এইরূপ স্তব করিয়াছেন? রমেশবাবু ইহার কোনও টীকা করেন নাই। বটব্যাল মহাশয় এই ঋকের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন,—কুশিকগণ সুদাসের অশ্বমেধ-অশ্ব-রক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছিল। 'অতএব রমেশবাবু ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। এই সূক্তে কীকটদিগের নাম পাওয়া যাইতেছে। তাহারা যে ইন্দ্র-পূজা করে না, তাহাও দেখা যাইতেছে। ইহাদিগকে বশে আনিবার জন্ম ইন্দ্রের নিকট বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা। অথচ বসিষ্ঠ-বংশীয় নিরুক্তের টীকাকার ২৪শ ঋক্‌কে বসিষ্ঠদ্বেষিণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদ্যপি ধরিয়া লওয়া যায় যে, টীকাকারের মত ঐতিহাসিক সত্য, তাহা হইলেও, ঐ সূক্তের অপর ২৩টী ঋক্ যে বসিষ্ঠদ্বেষিণী নহে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

ভারতদিগের সহিত বসিষ্ঠ-বংশীয় তৃৎসুদিগের প্রতিযোগিতা ঋগ্বেদের কালেই বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু ইহা ঘোর শত্রুতার আকার ধারণ করিয়াছিল কি না, তাহা ঋগ্বেদ হইতে জানা যায় না। যদ্যপি পরবর্ত্তী যুগে তাহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও, বিশ্বামিত্র ঋষির স্কন্ধে উহার আরোপ কত দূর যুক্তিযুক্ত, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য।

পূর্ব্বোক্ত 'ইমে ভোজা' নামক ৭ম ঋকের অর্থ নির্দ্দেশ করিবার জন্ম এক্ষণে আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব, ঋগ্বেদে ভোজ অর্থ কি ছিল। দেখিতে পাই, ভোজ অর্থে দক্ষিণা-দাতা বা দাতা বুঝাইত। (১) কোনও কোনও ঋষি

(১) ন। ভোজাঃ। মম্রুঃ। ন। ন্যর্থং। ঈয়ুঃ। ন। রিষ্যন্তি। ন। ব্যথন্তে। হ। ভোজাঃ। ইদং। যৎ। বিশ্বং। ভুবনং। স্বঃ। চ এতৎ। সর্ব্বং। দক্ষিণা। এভ্যঃ। দদাতি॥

—১০।১০৭৮

ভোজগণ মরে না, নিকৃষ্ট গতি পায় না; ভোজগণ হিংসিত হয় না, ব্যথিত হয় না; এই যে বিশ্বভুবন ও স্বর্গ, এ সমস্তই ইহাদিগকে (তাহাদের) দক্ষিণা দান করে।

সেই জন্ম ইন্দ্রকে ভোজ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (১) বিশ্বামিত্র-ঋষি-রচিত ও বটব্যাল-মহাশয়-ধৃত ঋকের 'ইমে। ভোজাঃ। অঙ্গিরসঃ। বিরূপাঃ' অংশের অর্থ সায়ন এইরূপ করিয়াছেন,—'ভোজাঃ সৌদাসাঃ ক্ষত্রিয়াঃ তেষাং যাজকাঃ নানারূপা মেধাতিথিপ্রভৃতয়ঃ।' অর্থাৎ, সুদাস-বংশীয়দিগের যজ্ঞকারী, বিবিধ-রূপযুক্ত, মেধাতিথি প্রভৃতি পুরোহিতগণ। কিন্তু ইহার এইরূপ অর্থ যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, ঋগ্বেদের ঋষিগণ অগ্নিকে প্রধান অঙ্গিরা (২) ও নবগ্ব ও দশগ্বগণকে বিবিধ-রূপযুক্ত অঙ্গিরার পুত্রগণ বলিতেন। (৩) ইহাদিগকেই বিশ্বামিত্র ঋষি ভোজ বা দাতা বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন। যজ্ঞে মেধাতিথি প্রভৃতি সুদাসের পুরোহিতগণকে আহ্বান করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না।

ঋগ্বেদের মধ্যে একটী ঋকে পাকস্থামা নামক এক ব্যক্তিকে ভোজ ও দাতা বলা হইয়াছে। (৪) ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে, ঋগ্বেদের কালেও ভোজ-বংশীয় রাজা ছিলেন। কিন্তু রাজা সুদাসকে ঋগ্বেদের কোথাও ভোজ-বংশীয় বলা হয় নাই। যদ্যপি তর্কচ্ছলে সায়নের অর্থ আমরা মানিয়া লই, তাহা হইলে, সুদাসের রাজধানী বটব্যাল মহাশয়ের প্রদর্শিত ভোজপুর

---

(১) কিং। অঙ্গ। ত্বা। মঘবন্। ভোজং। আহুঃ।—১০।৪২।৩

হে মঘবন্! কি জন্য তোমাকে ভোজ বলে?

ভোজং। ত্বাং। ইন্দ্র। বয়ং। হুবেম।—২।১৭।৮

হে ইন্দ্র। ভোজ তোমাকে আমরা আহ্বান করি।

(২) ত্বং। অগ্নে। প্রথমঃ। অঙ্গিরাঃ। ঋষিঃ দেবঃ। দেবানাং। অভবঃ। শিবঃ। সখা।

—১।৩১।১

হে অগ্নি। তুমি প্রধান অঙ্গিরা, ঋষি, দেব, দেবতাদিগের শিব সখা হইয়াছ।

(৩) বিরূপাসঃ। ইৎ। ঋষয়ঃ তে। ইৎ। গম্ভীরবেপসঃ।

অঙ্গিরসঃ। সূনবঃ। তে অগ্নেঃ। পরি। জজ্ঞিরে।—১০।৬২।৫

বিবিধ-রূপ-যুক্ত ঋষিগণ, তাঁহারা গম্ভীরকর্ম্মা; তাঁহারা অঙ্গিরার পুত্রগণ, অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

যে। অগ্নেঃ। পরি। জজ্ঞিরে বিরূপাসঃ। দিবঃ। পরি।

নবগ্বঃ। নু। দশগ্বঃ। অঙ্গিরঃ তমঃ সচা। দেবেষু। মংহতে।—১০।৬২।৬

বিবিধ-রূপ-যুক্ত যাঁহারা দিব্যলোকে অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, (তাঁহারা) নবগ্ব ও দশগ্বগণ; অঙ্গিরাদিগের মধ্যে (যিনি) শ্রেষ্ঠ, দেবতাদিগের মধ্যে (তিনি) সমান মহীয়ান্ হইয়াছেন।

(৪) তুরীয়ং। ইৎ। রোহিতস্য। পাকস্থামানং। ভোজং। দাতারং। অব্রবং।—৮।৩।২৩

রোহিত (অশ্বের) দাতা ভোজ পাকস্থামাকে চতুর্থ (ঋক্) বলিয়াছি।

হইয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহার মতে, সুদাসের রাজধানী কুরুক্ষেত্রের সীমান্তে মৎস্য দেশে অবস্থিত ছিল। মহাভারতে দেখিতে পাই, কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে প্রথম শূরসেনদিগের রাজ্য, পরে মৎস্য রাজ্য। (১) তাহা হইলে, মৎস্য ও মগধের পশ্চিম ভোজপুর পরস্পর হইতে বহুদূরে অবস্থিত, দেখা যাইতেছে। অতএব বটব্যাল মহাশয়ের মীমাংসা কিরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়?

বৈদিক যুগে, মহাভারতীয় যুগে ও অশোকের কালে ভোজরাজ বা ভোজগণ কুরুক্ষেত্র হইতে দক্ষিণ দেশে বাস করিতেন, অবগত হওয়া যায়। (২) কারণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, দক্ষিণ দেশের সত্বৎ নামক জনগণের রাজা অভিষিক্ত হইয়া ভোজ উপাধি গ্রহণ করিতেন। এই দক্ষিণ দেশ যে ঐ ব্রাহ্মণে উক্ত মধ্য-দেশের দক্ষিণে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঐ মধ্যদেশ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই;—ধ্রুব-প্রতিষ্ঠিত মধ্যদেশে সবশ, উশীনর-গণের ও কুরু-পাঞ্চালগণের যে সকল রাজা আছেন, তাঁহারা অভিষিক্ত হইয়া রাজা নামে অভিহিত হইতেন। (৩)

মহাভারতে দেখিতে পাই, সহদেব দক্ষিণ দেশ জয় করিতে গমন করিয়া প্রথমে শূরসেন, পরে মৎস্য প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া কুন্তিভোজের রাজ্যে উপস্থিত হন। (৪) মহাভারতে আরও দেখিতে পাই, পুলিন্দ ও অন্ধ্রগণ দক্ষিণ দিকে বাস করিত। (৫) অশোকের সময়েও ভোজ, পুলিন্দ ও অন্ধ্রগণ দক্ষিণ দেশে বাস করিত। (৬) ইহার বহু কাল পরে ৮১৮ খৃঃ অব্দে

---

(১) তথৈব সহদেবোঽপি ধর্মরাজেন পূজিতঃ।
মহত্যা সেনয়া রাজন্ প্রযযৌ দক্ষিণাং দিশম্॥ ১
স শূরসেনান্ কাৎস্ন্যেন পূর্ব্বমেবাজয়ৎ প্রভুঃ।
মৎস্যরাজঞ্চ কৌরব্যো বশে চক্রে বলাদ্বলী॥ ২

(২) দক্ষিণস্যাং দিশি যে কে চ সত্বতাং রাজানো ভৌজ্যায়ৈব তেঽভিষিচ্যন্তে ভোজেত্যেনানভিষিক্তানাচক্ষত।

(৩) ধ্রুবায়াং মধ্যমায়াং প্রতিষ্ঠায়াং দিশি যে কে চ কুরুপঞ্চালানাং রাজানঃ সবশোশীনরাণাং রাজ্যায়ৈব তেঽভিষিচ্যন্তে রাজেত্যেনানভিষিক্তানাচক্ষত। ঐঃ ব্রাঃ; ৩৮।৩

(৪) নররাষ্ট্রঞ্চ নির্জ্জিত্য কুন্তিভোজমুপাদ্রবৎ।
প্রীতিপূর্ব্বঞ্চ তস্যাসৌ প্রতিজগ্রাহ শাসনম্॥—দিগ্বিজয় পর্ব্ব; ৩১ অধ্যায়; ৬।

(৫) পুলিন্দাংশ্চ রণে জিত্বা যযৌ দক্ষিণতঃ পুনঃ।—দিগ্বিজয় পর্ব্ব; ৩১। ১৩
অন্ধ্রাংস্তালবনাংশ্চৈব কলিঙ্গানুষ্ট্রকর্ণিকান্। ঐ; ৩১।৭১

(৬) The Bhojas, Pulindas and Pitanikas dwelling among the

রাজপুতানার অন্তর্গত গুর্জর-প্রতিহার রাজ্যের রাজা নাগভট্ট, কনৌজের রাজা চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়াছিলেন। (১) তিনি নিজে বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ কনৌজকে রাজধানী-রূপে গ্রহণ করেন। নাগভট্টের পৌত্র মিহির, 'ভোজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এত বড় রাজা ছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যকে সাম্রাজ্য বলা যাইতে পারে। (২) তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্ব্বে বিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মগধের পশ্চিমে যে ভোজপুর বর্ত্তমান, তাহা মিহির ভোজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়, কে বলিতে পারে? পাঠক আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবেন। রাজপুতানার এই রাজা যখন সম্রাট হন, তখন ভোজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জানিয়াছি। মগধের নিকট ভোজপুর নগর অতি প্রাচীন ঋগ্বেদের কালে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ, ভোজগণ অশোকের সময় পর্য্যন্তও দক্ষিণে বাস করিত।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত শুনঃশেপ উপাখ্যানের সাহায্যে বিশ্বামিত্রের বাসস্থান নির্দ্ধারিত করা যায় কি না, এক্ষণে আমরা তাহার বিচার করিব। প্রথম মনে রাখিতে হইবে, ইহা শুধু গল্প। শতপথ ব্রাহ্মণে এই গল্পের উল্লেখ না থাকায় মনে হয়, ঐ ব্রাহ্মণেরও পরে ইহা রচিত হইয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে

---

hills of the Vindhya and Western Ghats ; and the Andhra Kingdom between the Krishna and Godabari rivers.

*Vincent A. Smith's The Early History of India. p. 184.*

(১) About 818 Chakrayudha king of Kanouj was deprived of his throne by Nagbhatta, the ambitious king of the Gurjara-Pratihar kingdom in Rajputana the capital of which was Bhilmal. Nagbhatta presumably transferred the head quarters of his government to Kanouj which certainly was the capital of his successors for many generations, and so again became for a considerable time the premier city of Northern India.—*Vincent A. Smith's Early History of India. p. 378-379.*

(২) The next king, Rambhadra's son Mihir, usually known by his title Bhoja, enjoyed a long reign of about half a century (C. 840—890), and beyond question was a very powerful monarch, whose dominions may be called an 'empire' without exaggeration. They certainly included the Cis-Sutlaj districts of the Punjab, most of Rajputana, the greater part, if not the whole, of the United Provinces of Agra and Oudh, and the Gwalior territory...On the east his dominions abutted on the realm of Devapala, king of Bengal and Bihar, which he invaded successfully.—*Vincent A. Smith's Early History of India. p. 379.*

প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই গল্পে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মূতিব, এই কয় অন্ত্য জাতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা দস্যুদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া বর্ণিত। এই নামগুলি রচয়িতার স্বকপোলকল্পিত নহে; কারণ, ইহাদের অনেকগুলি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ইহাদিগকে তিনি বিশ্বামিত্র ঋষির অবাধ্য সন্তান-রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহা গল্প কি ইতিহাস, কে বলিবে?

অতি প্রাচীন কাল হইতে বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র-বংশীয়দিগের মধ্যে যে বিবাদ চলিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে বসিষ্ঠ-বংশীয় কেহ বিশ্বামিত্র-বংশীয়দিগের প্রতি কুৎসা বা অপবাদের আরোপ করিয়া উপন্যাস রচনা করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমরা অনুমান করি, শুনঃশেপ উপাখ্যানের লেখক সম্ভবতঃ বসিষ্ঠ-বংশীয় ছিলেন। সেই জন্য অঙ্গিরা-বংশীয় শুনঃশেপকে তিনি বিশ্বামিত্র-বংশের শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন। ইহা দ্বারা যেন বিশ্বামিত্র-বংশ সমাজে উন্নত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইল। আর, অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি অন্ত্য জাতি—যাহারা আর্য্যদিগের নিকট দাস দস্যু নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল—বিশ্বামিত্রের পুত্র বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ইহা বিশ্বামিত্র-বংশীয়গণের অপবাদ-রটনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

ঋগ্বেদে যে বিশ্বামিত্র ঋষির রচনা বর্ত্তমান, তিনি সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। আমরা অনুমান করি, সুদাসের রাজধানীর নিকট তাঁহার বংশীয় ভারত ও কুশিকগণ অবস্থান করিতেন। রাভী নদীর তীরে সুদাসের রাজধানী ছিল, আমাদের এই অনুমান যদ্যপি সত্য হয়, তবে সেই নদীর তীরেই বিশ্বামিত্রগণ বাস করিতেন, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

# নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য।

১

গল্প আছে, পুরোহিত যজমানের গৃহে আসিয়া 'নূতন পঞ্জিকা' চাহিলে যজমানের বালক পুত্র বহিরাবরণে 'নূতন পঞ্জিকা' মুদ্রিত দেখিয়া গত বৎসরের পঞ্জিকা আনিয়া দিয়াছিল; কিন্তু সে তাহার ভুলের জন্য লজ্জিত হইলে পুরোহিত বলিয়াছিলেন—যত দিন ব্যবহারফলে পঞ্জিকার বহিরাবরণ ছিন্ন হইয়া না যায়, তত দিন তাহা পুরাতন হইলেও নূতন বলিয়া বোধ হইতে পারে।

আমি আজ যে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিব, তাহা যদি অনেকের কাছে পুরাতন বোধ হয়, তবে, আশা করি, তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। কেন না, পত্রিকার বহিরাবরণ ব্যবহারফলে ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন তাহাকে 'নূতন' বলিয়াই বোধ হয়—সাহিত্যের নূতন স্তরও তেমনই নূতনতর স্তরের নিম্নে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত নূতন বলিয়াই পরিচিত হয়। নূতন ভাবের বন্যা সাহিত্যে নূতন স্তর গঠিত করে—ইংরাজীতে তাহাকে renaissance বলে। যত দিন নূতন ভাবের বন্যা পুরাতন বন্যার গঠিত স্তরের উপর নূতন স্তরের সৃষ্টি না করে, তত দিন পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর নূতন। বাঙ্গালা সাহিত্যে নানা বন্যার নানা স্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। শেষ স্তর—এ দেশে ইংরাজী ভাবের প্রভাবে ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রচারে নূতন ভাব-বন্যার ফল। আমরা আজ সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

বাঙ্গালা ভাষা পুরাতন ভাষা—কপিলবস্তুর প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে গৌতম বুদ্ধ সিদ্ধার্থ এই ভাষার পাঠ লইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে কবে এই ভাষার সৃষ্টি, তাহা জানিবার উপায় আজও হয় নাই—প্রাগৈতিহাসিক যুগের অজ্ঞতার অন্ধকার ভেদ করিবার উপায় আজও উদ্ভাবিত হয় নাই। কিন্তু তাহার পর হইতে এ ভাষার বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত দেশে পণ্ডিতের ভাষা ছিল, কিন্তু দেশের জনসাধারণের জন্য যে সাহিত্য রচিত হইত, তাহা তাহাদের নিত্য-ব্যবহৃত ভাষায়—বাঙ্গালায় রচিত হইত। তাহার অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছে। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, কাজেই পুস্তকের প্রচারও তত অধিক হইতে পারিত না। এ দেশের জলবায়ু তালপত্রের বা কাগজের দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের পক্ষে অনুকূল নহে; কীটের উদরে অনেক পুস্তক জীর্ণ হইয়াছে; রাষ্ট্রবিপ্লবের বন্যায়—বিজয়লালসামত্ত বাহিনীর অত্যাচারে—মোগল পাঠানের আক্রমণে অনেক পুঁথি লুপ্ত হইয়াছে; অনেক পুঁথির সামান্য অংশ পাওয়া গিয়াছে। আবার এখনও বাঙ্গালায় পুঁথির অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হয় নাই—যত সন্ধান হইতেছে, ততই নূতন নূতন পুস্তকের সন্ধান মিলিতেছে। যে সব পুস্তক সর্ব্বত্র সমাদৃত ছিল, সে সব সর্ব্ববিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালীর চিত্তবিনোদন করিয়াছে—বাঙ্গালায় লোকশিক্ষার পথ পরিষ্কৃত রাখিয়াছে। সেই সকলের মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,

চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের পদাবলী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সে কালের অনেক পুস্তক সংস্কৃত ভাবের সাক্ষ্য প্রদান করে; অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পুস্তকে ফারসী ভাবের ছাপ আছে। শেষোক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য 'ভারতী-ভরসা' ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'।

'অন্নদামঙ্গলে'র রচনাকাল ভারতের ইতিহাসে যুগসন্ধি-সময়। যে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' রচিত হইয়াছিল, তিনি পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজের অন্যতম সহায়। পলাশীর যুদ্ধে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নূতন যুগের আরম্ভ। দুর্ব্বল মুসলমান-শাসনের পতনকালে ও ইংরাজ-শাসনের প্রবর্ত্তন-কালে দেশে শৃঙ্খলার একান্ত অভাবে সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। ইংরাজ-শাসনে দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইলে, যখন রাজা প্রজা উভয়েরই বাঙ্গালার ভাষার প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তখন সে ভাষার সংস্কার-ভার সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদিগের উপর ন্যস্ত হইল। বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার-ভার যাঁহারা লইলেন, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে শ্রদ্ধা করিতেন না—বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক অনুরাগের একান্তই অভাব ছিল। কাজেই তাঁহাদের চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি বা বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীসাধনের সম্ভাবনা ছিল না। তখন বাঙ্গালা সাহিত্য-প্রবাহ সংস্কৃতের বাপী হইতে সামান্য সলিল লাভ করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল—গতি মন্দ হওয়ায় আবর্জ্জনায় ও শৈবালে তাহা পূর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, প্রবাহখাতে পঙ্ক সঞ্চিত হইতেছিল। সেই পঙ্কে মূল বিস্তার করিয়া কখনও কখনও দুই একটী পঙ্কজ শতদলে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল সত্য, কিন্তু জাতির উন্নতির কোনরূপ সহায়তা-সম্ভাবনা সে প্রবাহে ছিল না। তাহার বক্ষে পণ্য লইয়া তরণীর গতায়াত অসম্ভব হইয়াছিল—তাহার প্রবাহে পূতিগন্ধ ছিল। যাঁহারা এই সময়ের 'রজনীকান্ত' প্রভৃতি অপাঠ্য পুস্তক দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তখন বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—সে কালের একমাত্র শিশুপাঠ্য প্রথমশিক্ষার পুস্তক—'শিশুবোধক'। 'টেকচাঁদ ঠাকুরে'র কৃত কর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

যখন বাঙ্গালা সাহিত্যের এই দুর্দ্দশা, তখন আর এক দিকে ভাবের বারি সঞ্চিত হইতেছিল। ইংরাজী সাহিত্যের সহিত পরিচয়ফলে এবং ইংরাজী ভাবের প্রভাবে বাঙ্গালায় শিক্ষিত সমাজে নূতন ভাবের উৎস উৎসারিত হইয়াছিল।

সেই উৎসমুখনির্গত বারিরাশি সঞ্চিত হইয়া প্রবাহিত হইবার পথ সন্ধান করিতেছিল। তাহার প্রথম পরিচয়—প্রচলিত ভাষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে "টেক-চাঁদের" বিদ্রোহ-ঘোষণা। 'টেকচাঁদে'র ভাষা বিদ্রোহের ভাষা, তাঁহার রচনার আদর্শ বিদেশী। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—তিনি বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন; তিনিই প্রথম দেখাইয়াছিলেন যে, 'আমাদের সাহিত্যের উপাদান আমাদের ঘরেই আছে।'

তাহার পর নূতন ভাবের বন্যা বাঙ্গালা ভাষার খাতে প্রবাহিত হইল। তাহার প্রথম ফল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'। বাঙ্গালার নূতন renaissanceএর যুগপ্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের পর যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের দিক্‌পাল, সেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-সভায় বলিয়াছিলেন—

'বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল। পূর্ব্বে কি ছিল, এবং পরে কি পাইলাম, তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়-বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।' এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদীনির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল।'

সে দিন সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল। সে-ই নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ। তাহার পূর্ব্বে সংস্কৃত-পণ্ডিতরা বাঙ্গালাকে 'গ্রাম্য' এবং ইংরাজী-পণ্ডিতরা 'বর্ব্বর' জ্ঞান করিতেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তীরা ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়া ইংরাজী রচনায় যশ অর্জ্জন করিবার মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রামবাগানের দত্ত-পরিবার হইতে মধুসূদন পর্য্যন্ত সকলেই বিদেশী ভাষায় রচনা দ্বারা অমরত্ব-লাভের দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। মধুসূদন বিদেশে চতুর্দ্দশপদী কবিতা-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আপনার ভ্রমের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি শেষে বুঝিয়াছিলেন—

'ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি;
এ ভিখারী দশা তোর কেন তবে আজি?'

বঙ্কিমও প্রথমে সেই ভুল করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের মত তাঁহার ভ্রম অল্প দিনেই ঘুচিয়া গিয়াছিল। শেষে তিনিই রমেশচন্দ্র দত্তকে ইংরাজীতে পুস্তক রচনা

করিয়া যশ অর্জ্জন করিবার দুরাশা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং সেই উপদেশের ফলেই বাঙ্গালা সাহিত্য 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'জীবন-প্রভাত', 'জীবন-সন্ধ্যা', এই ঐতিহাসিক উপন্যাস-চতুষ্টয়ে সমৃদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজীতে তাঁহার আত্মচরিতের কতকাংশ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা প্রকাশিত হয় নাই। তাহাতে তিনি 'বঙ্গদর্শন'-প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র 'পত্রসূচনা'য় লিখিয়াছেন, যে ভাব বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত হয়, তাহা দেশের অধিকাংশ লোক বুঝে না, কাজেই তাহার প্রচার ব্যর্থ হয়। সুতরাং বাঙ্গালীকে কোনও কথা শুনাইতে হইলে তাহা বাঙ্গালাতেই বলিতে হইবে। তাঁহার আত্ম-চরিতে তিনি বলিয়াছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগের শিক্ষা-দান এক জনের দ্বারা সম্ভব নহে—কাজেই অনেককে এক সঙ্গে করিতে হইবে। সেই জন্যই 'বঙ্গদর্শনে'র সৃষ্টি। বাস্তবিক, বঙ্কিমচন্দ্র তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের নৃপতিমণ্ডলে রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনিই শাসক, তিনিই সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির নিয়ামক। তাঁহার সমসাময়িক ও সহকর্ম্মীদিগের উপর তাঁহার প্রভাব কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল, তাহা দেখিলে মনে হয়, পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিলে অর্জ্জুন যেমন আর গাণ্ডীব ব্যবহার করিতেও পারেন নাই, তেমনই বঙ্কিমের প্রভাবে যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে কীর্ত্তিস্থাপন করিতেছিলেন, বঙ্কিমের প্রভাব-তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কেহ কেহ আর সে কীর্ত্তিস্তম্ভ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই—সেই আরব্ধ কিন্তু অসম্পূর্ণকীর্ত্তি আকবরের ফতেপুর শিকরীর মত কালের ব্যবধানে আজ দর্শকের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উৎপাদন করে। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' চারি বৎসর মাত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে আদর্শ স্থাপন করিয়া 'জলবুদ্বুদ জলেই মিশাইয়াছিল'। কিন্তু সেই চারি বৎসরে যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন সম্পদ দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাসহকারে 'যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের মন্দিরে।' যাঁহার সমালোচনা করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য্য ছিল, কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না', বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সৌন্দর্য্যরসিক ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-পরিচালনে বঙ্কিমচন্দ্রের সহায় ছিলেন। প্রত্নতত্ত্বক্ষেত্রে হরপ্রসাদের অসাধারণ কৃতিত্বের ঔজ্জ্বল্যে আমরা যেন স্বল্পায়ু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বিস্মৃত না হই। 'নব-জীবনে'র অক্ষয়চন্দ্রের প্রথম উদয় 'বঙ্গদর্শনে'র গগনে। যে চন্দ্রশেখরের 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' বঙ্গসাহিত্যে গদ্যকাব্যের আদর্শ হইয়া আছে, তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে তাঁহার সহকারিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের

শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী জাতির উন্নতি সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই; কেন না, বঙ্গদেশে এক জন সুকবির আবির্ভাব হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবির জন্য যে দুই জন কবির রোদন 'বঙ্গদর্শনে' স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন—হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের নাম বাঙ্গালী কখনও ভুলিতে পারিবে না। প্রত্নতত্ত্বে মৌলিক গবেষণা অমূল্য, কিন্তু শ্রমশীল অনুসন্ধানকারী রামদাসের অনুসন্ধান-ফল যে বহুমূল্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 'গ্রীক ও হিন্দু'র লেখক প্রফুল্লচন্দ্রকেও আমরা এই শ্রেণীর লেখক মনে করিতে পারি।

এই সব সহযোগীর ও সহকর্ম্মীর সাহায্যে বঙ্কিম নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য গঠিত করিয়াছিলেন; ইঁহারা সেই নূতন সাহিত্য-গঠনে যাঁহার যাহা সাধ্য,সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' দেখিলেই বুঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রকেই সর্ব্ব বিভাগে রচনার আদর্শ-সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবার সময় তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু সে পথে বাহিনী চালন করিয়া কেহ ত অগ্রসর হয়েন নাই! আজ তাঁহার আর সে দুঃখের কারণ নাই। সে দিন যে তাঁহাকে দুঃখ করিতে হইয়াছিল, তাহার কারণ, তিনি সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার সমাজের অগ্রগামী ছিলেন। তিনি ঋষি, তাঁহার দৃষ্টি যত দূর লক্ষ্য করিতে পারিত, তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি তত দূর ভেদ করিতে পারিত না। এই দূরদৃষ্টিবলেই তিনি বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের প্রচ্ছন্ন শক্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই দূরদৃষ্টিবলেই তিনি সে দিন দেশকে মা বলিয়া চিনিয়া মাতৃমূর্ত্তির ধ্যান করিয়াছিলেন—

'দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত; পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী। দক্ষিণে লক্ষ্মী, ভাগ্যরূপিণী; বামে বাণী, বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী; সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়—কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।'

তাঁহার রচনার প্রায় পঞ্চবিংশ বর্ষ পরে 'বন্দে মাতরম্' তাঁহার সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির সর্ব্বত্র মাতৃপূজার মন্ত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছে—ভারতবর্ষের আকাশে, বাতাসে সেই বন্দনা-মন্ত্র ধ্বনিত—ঝঙ্কৃত হইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, ইতিহাস-রচনার আদর্শ স্থাপিত করিয়াছিলেন, সমালোচনায় দোষ-গুণ-বিচারের পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ অধিকার না থাকিলেও কেমন করিয়া বৈজ্ঞানিক বিষয় বুঝাইতে হয়, তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন, এবং 'সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত' করিয়াছিলেন। হাস্যরসের অভিব্যক্তি দুই প্রকারে হয়, ব্যঙ্গে ও বিদ্রূপে। ব্যঙ্গের ক্রিয়াক্ষেত্র—বুদ্ধি; বিদ্রূপের ক্রিয়াক্ষেত্র—মনোভাব। যাঁহারা 'লোক-রহস্য' ও 'কমলাকান্ত' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, বিমল ব্যঙ্গে ও শাণিত বিদ্রূপে বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন। কিন্তু এই দুইখানি পুস্তকের রচনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাব আরও গভীর; উপরে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মৃদুসমীরসঞ্চারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মির খেলা, আর নিম্নে গভীর ভাবের প্রবাহ। বঙ্কিমের স্বাভাবিক হাস্যরসজ্ঞতার পরিচয় সময় সময় অতি সামান্য বিষয়েও ফুটিয়া উঠিত—রবি-কর কেবল কমলদলই বিকশিত করে না, তাহার স্পর্শে তৃণ পুষ্পও মনোহর বর্ণে বিকশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচনায় এই রস যেন উছলিয়া উঠিত। কোনও নাটককার তাঁহার নায়িকাকে দিয়া নায়ককে বলাইয়াছিলেন, গুলঞ্চ যেমন নিম্ব-বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাঁহার ইচ্ছা তেমনই ভাবে প্রণয়াস্পদকে বেষ্টন করিয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা করিলেন—'এমন পিত্তহারী প্রেম সচরাচর দেখা যায় না।' এই এক ছত্রে যে সমালোচনা হইল, বুঝি শত পৃষ্ঠা লিখিলেও তাহা হয় না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল, সে তাহার শুচিতা। ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকদিগের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া এ বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যিকদিগের জন্য নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি সাহিত্যের সর্ব্ব বিভাগেই কিরূপ কঠোর ভাবে এই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তিনি বলিয়াছেন—'যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব।" আজ বাঙ্গালী লেখককে এই কথা, সাহিত্য-সম্রাটের এই উপদেশ বা আদেশ স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র যে সাহিত্যকে সর্ব্ববিধ অপবিত্রতা হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকরা যেন তাহাকে কলঙ্কিত না করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখকরা যে তাঁহার প্রতিভাপ্রবাহে পুষ্ট হইয়া-

ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহারই সমালোচনার আদর্শ তাঁহার পরে 'কাব্যসুন্দরী'র লেখক পূর্ণচন্দ্র বসুর ও ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের রচনার মধ্য দিয়া অধ্যাপক ললিতকুমারের রচনায় আসিয়া বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহারই 'কমলাকান্তে'র স্বদেশপ্রীতি 'আর্য্য-দর্শনে'র সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের রচনায় স্ফুরিত হইয়াছিল। যিনি আর এক দিকে বাঙ্গালায় যুগাবতার, যিনি আর এক ক্ষেত্রে আপনই স্বতন্ত্র এবং আপনার কীর্ত্তিগৌরবে বাঙ্গালীর নমস্য, সেই স্বামী বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার নিকট কত ঋণী, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগকে বলিয়াছেন—'আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্য-ব্যবসায়ী, তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কি চিরঋণে আবদ্ধ, তাহা যেন কোনও কালে বিস্মৃত না হন।'

আজ যে বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্ববিধ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব—সর্ব্ববিধ রচনা সহজ, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে সেই বাঙ্গালা ভাষার সেই স্বাভাবিক শক্তি কাহারও কল্পনায়ও আসিত না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার ও সাধনার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে তাহার সেই শক্তি বিকশিত হইয়াছিল। তাই আজ বাঙ্গালা ভাষা আনন্দে উচ্ছ্বসিত, বিষাদে বিকুণ্ঠিত, ক্রোধে বিকম্পিত, দ্বিধায় বিচলিত, লজ্জায় সঙ্কুচিত, শোকে বিলুণ্ঠিত, করুণায় বিগলিত, গর্ব্বে বিস্ফুরিত হইয়া উঠে। এই বাঙ্গালা ভাষা আমাদের নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা।

নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্রের আর এক কীর্ত্তি, তিনি সাহিত্যকে ধনীর আশ্রয় হইতে আনিয়া স্ব-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্য ধনীর আশ্রয়ে থাকিয়া কখনও বা শ্রদ্ধায় কখনও বা অনুগ্রহে পুষ্ট হইত। সে তাহার আপনার মন্দিরে আপনার ভক্তদিগের পুষ্পাঞ্জলি-লাভের কল্পনাও করিতে পারিত কি না সন্দেহ। সে কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থা দেখা যাউক। তখনও বাঙ্গালা সাহিত্য লতার মত ধনীকে আশ্রয়তরু-বোধে অবলম্বন করিত, এবং আপনার কুসুমের ঐশ্বর্য্যে সেই আশ্রয়কেও সুন্দর করিয়া তুলিত। আত্ম-শক্তিতে তাহার এই অপ্রত্যয়ে তাহার আত্মসম্মান যে ক্ষুণ্ণ হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। বর্দ্ধমান রাজবাড়ীতে বাঙ্গালায় মহাভারত ও রামায়ণ অনূদিত হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহের বদান্যতায় বাঙ্গালী মহাভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুবাদ পাইয়াছে। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রামায়ণও বাঙ্গালী ধনীর বদান্যতার

ফল। শোভাবাজার রাজবাড়ী হইতে রাজা সার রাধাকান্ত দেবের অর্থে 'শব্দকল্পদ্রুম অভিধান' প্রচারিত হয়। তাহা বাঙ্গালা অভিধান না হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যিকের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। বাঙ্গালা সাহিত্য তখনও আপনাকে বাঙ্গালীর উপযোগী করিতে পারে নাই, তাই বাঙ্গালীর শ্রদ্ধাও আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। সে সাহিত্য তখনও আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যকে বাঙ্গালীর অত্যাবশ্যক ও নিত্য-সহচর করিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যেরও এক দিন এই দশা ছিল। অভিধান-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া জনসন ধনী লর্ড চেষ্টারফিল্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যে দীর্ঘকাল জনসন সে কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তত দিন উপেক্ষার পর, তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি সমাপ্ত হইবার প্রাকালে, লর্ড চেষ্টারফিল্ড দরিদ্র লেখককে অনুগ্রহ প্রদান করিয়া পুস্তকের সহিত আপনার নাম কালজয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জনসনের প্রকৃতি প্রকৃতরূপে অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই। আহত-অভিমান-জনিত ক্রোধে জনসন তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা কটু কথনের হিসাবে অতুলনীয়। সেই উত্তরে জনসন বজ্রনাদে ইংরাজ-সমাজে ঘোষণা করিয়া দেন—ইংরাজী সাহিত্য আর কখনও ধনীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবে না। জনসন অপমান সহ্য করিয়া সাহিত্যের অপমান দূর করিয়াছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা বুঝিয়াই সাহিত্যের আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ইহার ফল কি হইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দরিদ্র লেখক রাজকৃষ্ণ রায় আপনার ক্ষমতায় নির্ভর করিয়া রামায়ণের ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ সম্পূর্ণ করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়া গিয়াছেন। আর তাহার পর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু জীবনব্যাপী শ্রমে বাঙ্গালায় বিরাট অভিধান 'বিশ্বকোষ' সম্পূর্ণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালী পাঠকের অবিচলিত ও অনাবিল শ্রদ্ধার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছেন। ধনীর অনুগ্রহ ব্যতীত যে তেমন বিরাট অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইতে পারে, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালী তাহা মনেও করিতে পারিত না। কিন্তু নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যে সে দিনের 'অসম্ভব' অনায়াসে সম্ভব হইয়াছে।

নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের আর একটি বিভাগ আছে, সে ক্ষণবিধ্বংসী সাময়িক সাহিত্য। সংবাদপত্রে যাহা লিখিত হয়, তাহা সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করে না বটে, কিন্তু তাহা জনসাধারণের স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিতে না

পারিলে ফুটিতে না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়ে, এবং সেই জন্যই তাহাতে লিপিচাতুর্য্য ও সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য আবশ্যক হয়। সংবাদপত্র এখন সভ্যতার সহচর ও নিদর্শন। আমাদের বাঙ্গালা দেশেও সংবাদপত্রের প্রচার ও প্রভাব দিন দিন বাড়িতেছে। তাহার রাজনীতিক কারণের আলোচনা আমাদের আজিকার উদ্দেশ্য-বহির্ভূত। তবে এই প্রসঙ্গে এ কথাও না বলিয়া নিরস্ত হইতে পারি না যে, সাহিত্যের এই বিভাগও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহায্যে বঞ্চিত হয় নাই; অক্ষয়-চন্দ্রের 'সাধারণী'র লেখকদিগের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এক জন ছিলেন। সে কথা অনেকে জানেন না। কিন্তু সমসাময়িক ঘটনার উপর তাঁহার মত-প্রকাশের ধারা কিরূপ ছিল, তাহা 'প্রচার'-পাঠকেরা অবগত আছেন। কংগ্রেস একটু সবল হইলেই সার অকল্যাণ্ড কলভিন প্রভৃতি কখনও প্রকাশ্যভাবে, কখনও বা ভিঙ্গার রাজা উদয়প্রতাপ সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিদিগের অন্তরালে থাকিয়া, তাহার প্রতি বাণবর্ষণে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। রাজা শিবপ্রসাদ সেই দলে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কথায় লিখিয়াছিলেন,—যাত্রার দলের রাজা হইলে মধ্যে মধ্যে সং দিতে হয়। আমাদের দেশের রাজত্বহীন রাজার যাত্রার দলের ঝুঁঠা মুকুট পরা এবং টিনের তরবারধারী রাজার সঙ্গে তুলনা কত মধুর তাহা 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান।' তাহার পর অধিকারীর আদেশে রাজার সাজ বদলাইয়া সং সাজিয়া আসরে আসার কথাটুকুর সার্থকতা অবশ্যই সপ্রকাশ।

এই নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীকে তাহার পুরাতন সাহিত্যের সন্ধানে উৎসাহিত করিয়াছে। সেই পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালীর ইতিহাসের উপকরণ লুক্কায়িত আছে। যাঁহারা রোমে বা বুদ্ধগয়ায় মৃত্তিকায় প্রোথিত পুরাতন কীর্ত্তির পুনরুদ্ধার দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সন্ধানের ফলে আমরা ইতিহাসের কি অমূল্য উপাদান পাইতে পারি। বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ; বাঙ্গালী প্রাচীন জাতি। এই দেশে এই জাতির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারক, কবি, দার্শনিক, শিল্পী, সকলেরই আবির্ভাব হইয়াছে। এই দেশে হিন্দুধর্ম্মে ও বৌদ্ধধর্ম্মে, হিন্দু-ধর্ম্মে ও মুসলমান ধর্ম্মে দ্বন্দ্ব হইয়া গিয়াছে; বৌদ্ধ বিহার হিন্দুর মন্দিরে পরিণত হইয়াছে, হিন্দুর মন্দিরের উপাদানে মুসলমানের মসজেদ রচিত হইয়াছে। সেই ধর্ম্মের দ্বন্দ্বে, রাজনীতির বাত্যায়, জিগীষার বন্যায় ইতিহাসের অনেক উপকরণ নষ্ট হইয়াছে; এই উষ্ণপ্রধান নদীমাতৃক দেশের জলবায়ুর প্রভাবে অনেক শিল্প-কীর্ত্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; ইহার দ্রুতবর্দ্ধনশীল লতাগুল্মে অনেক কীর্ত্তি আচ্ছন্ন হইয়া লোকলোচন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি সামান্য চেষ্টায়

কত কীর্ত্তির সন্ধানই পাইয়াছেন। যে দেশে সামান্য সন্ধানেই এত রত্ন মিলে, সে দেশে কত রত্নই ছিল! সামান্য সন্ধানের ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি, এই বঙ্গদেশে মাৎস্যন্যায় উচ্ছিন্ন করিবার জন্য প্রজারা আপনাদের শাসক নির্ব্বাচিত করিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এখন সে সব কীর্ত্তির সন্ধানে আমাদের উৎসাহ হইয়াছে। আর উৎসাহ হইয়াছে—প্রাচীন সাহিত্যের সন্ধানে। ভূস্তরে যেমন বিলুপ্ত জীব জন্তুর অবশেষ পাওয়া যায়, প্রাচীন সাহিত্যে তেমনই বিলুপ্ত আচার-ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়—বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বিবিধ ধর্ম্মমতের উত্থান-পতনের ইতিহাস জানিতে পারা যায়, বাঙ্গালীর উন্নতি-অবনতির ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীন-সাহিত্য-উদ্ধারের কার্য্যে সারদাচরণ মিত্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, কালিদাস নাথ প্রমুখ অনেকে সাহায্য করিয়াছেন। এখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ সেই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। *

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

---

# কারণটা কি?

১

মহেন্দ্রবাবু দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করিয়া দেশে আসিয়াছিলেন। শীঘ্রই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে 'প্রোফেসরি' করিতে যাইবেন। মহেন্দ্রের বাড়ী ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর নামক গ্রামে। সেখানে শিক্ষিত লোক নাই বলিলেও হয়। কেবল কৈবর্ত্তের বাস। তাহাদেরই মধ্যে রামধন নামক কৈবর্ত্ত মহেন্দ্রবাবুর বাটীর পুরাতন খানসামা। মহেন্দ্রবাবু তাহাকে লইয়াই আপাততঃ দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেছিলেন।

মহেন্দ্র। রামধন!

রামধন। হুজুর!

মহেন্দ্র। তুমি যে কাজ্‌টা ক'র্‌বে, এবং যা দেখ্‌বে, তার কারণটা প্রথমে ভেব। জগতে সব জিনিসের মধ্যে কারণ প্রবাহমান। কারণ না থাক্‌লে কোনও ঘটনাই ঘট্‌তে পারে না। যখন কারণ আছে, তখন কর্ত্তা আছে, এবং

* দ্বিতীয় 'বঙ্গ-সাহিত্য-সভা'য় পঠিত।

উদ্দেশ্য আছে। এ ব্যাপারটার মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতা ও অধীনতা। অদৃষ্ট ও পুরুষকার।

রামধন। হুজুর যা আজ্ঞা ক'চ্ছেন, তা আমার শিরোধার্য্য। ভবিষ্যতে আমি খুব কারণ দেখে বেড়াব। আপাততঃ আমি দশ দিনের ছুটী চাই।

মহেন্দ্র। কেন?

রামধন। ঐ যে কর্ত্তার কথা ব'ল্লেন, তিনি আজ আমাকে অনর্থক একটা চড় মেরেছেন। ও রকম ওজনের দুটো চারটে চড় খেলে কাজে ইস্তফা দিতে হবে।

মহেন্দ্রবাবু অতিশয় খুসী হইয়া বলিলেন, 'রামধন! এটা খুব জটিল বিষয়। তুমি স্থির হয়ে ব'স। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

'কর্ত্তাবাবু' মহেন্দ্রের খুল্লতাত। তাঁহার পুত্রসন্তান না হওয়াতে মহেন্দ্রই বিষয়ের উত্তরাধিকারী। মহেন্দ্র পিতৃ-মাতৃহীন।

মহেন্দ্রবাবু অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'প্রথমতঃ আমি ধ'রে নিলুম যে, তুমি চড় খেয়েছ। কারণ, তুমি বরাবর সত্যি কথা বল, এবারও ব'লবে, তা খুব সম্ভব। আর, কাকাও যে চড় মেরেছেন, তাও খুব সম্ভব; কারণ, হঠাৎ চড় মারা আমাদের বংশানুক্রমিক অভ্যাস।'

রামধন। কিন্তু চড় খাওয়া ত আমাদের বংশানুক্রমিক অভ্যাস নয়।

মহেন্দ্র। আমি ক্রমে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যে চড় মারে, সে কর্ত্তা। যে খায়, সে কর্ম্ম। কর্ত্তারই অভ্যাস হয়; কারণ, এ স্থলে ইচ্ছাশক্তি তিনিই ব্যবহার করেন। যে চড় খায়, তার 'চড় খাওয়া অভ্যাস', এ কথা বলা ভুল। 'সাম্‌লে যাওয়ার অভ্যাস' বরং সম্ভব। তা তোমার এখনও হয় নি। এখন দেখ্‌তে হবে যে, কর্ত্তার ক্রিয়াটা 'অটোম্যাটিক্' কিংবা 'ভলণ্টারি'। 'অটোম্যাটিক্' মানে—যা অভ্যাসবশতঃ হঠাৎ হয়ে যায়। এটার পুরাকালে কোনও উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমে বংশানুক্রমিক অভ্যাসটা থেকে যায়, উদ্দেশ্যটা বুঝা যায় না। যেমন 'গোঁফে তা'। 'ভলণ্টারি' মানে কোনও একটা মত্‌লব ক'রে, কাজটা যতগুলি উপায়ে হ'তে পারে, তার মধ্যে একটা বিশেষ উপায় বেছে নেওয়া। এখন মতলবটা আর তাঁর নির্ব্বাচিত উপায়টা, দুটোকেই বিচার করা দরকার।

'তুমি জান যে, চড় মারা আমাদের বংশানুক্রমিক অভ্যাস। আমি স্বীকার করি, অভ্যাসটা ভাল নয়। কেন না, যে মারে, তার হাতে ব্যথা লাগে, এবং যে খায়, তারও লাগে। কিন্তু কাজটা অন্যায় হয়েছে কি না, তার বিচার করা

যাক্। যখন তাঁর নিজের হাতে ব্যথা লাগ্‌বে নিশ্চয়, তখন আত্মসুখের জন্য চড় মারেন নি, সেটা ঠিক। সুতরাং তাঁর মতলবের মধ্যে ভাল একটা কিছু ছিল। খুব সম্ভবতঃ তোমার কোনও দোষ সংশোধন করা, কিংবা তদ্দ্বারা দশ জনের মঙ্গলসাধন করা। আচ্ছা বল, তুমি তখন কি কচ্ছিলে?

রামধন। গাছতলায় চুপ ক'রে বসেছিলুম।

মহেন্দ্র। চুপ ক'রে বসে থাকা জগতের অমঙ্গল। এই জন্য যখন শকুন্তলা কণ্বের আশ্রমে চুপ ক'রে বেকুফের মত দুষ্মন্তকে ভাবছিলেন, তখন সুযোগ পেয়ে দুর্ব্বাসা চট্ করে উপস্থিত হয়ে অভিশাপ দিয়ে গেল। তোমার বিষয়টাও সেই রকম। যা হোক, এখন দেখা যাক, জগতের মঙ্গলের জন্যও, চড় মারা ছাড়া অন্য উপায় আছে কি না? আপাততঃ বোধ হ'চ্ছে যে, তিনি মিষ্টি কথায় তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তুমি মিষ্টি কথায় ভাল হবার লোক, তার পরিচয় এ পর্য্যন্ত বোধ হয় কাকাবাবু পান নাই।

রামধন। আমি মিষ্টি কথার দাস।

মহেন্দ্র। সেটা তোমার কথায় বুঝতে পাচ্ছিনে। তুমি চড় খেয়ে যখন চাক্‌রী ছাড়বার মতলবে ছুটী নিচ্ছ, তখন বেশ বোধ হচ্ছে, তুমি স্বাধীন হতে চাও।

রামধন। কি করি বলুন? অদৃষ্ট মন্দ হলে আর কি উপায়?

মহেন্দ্র। এইখানে ভাল ক'রে বুঝা উচিত। চড় খেয়ে যে সাম্‌লে যায়, সেই স্বাধীন, এবং তারই পুরুষকার আছে। যে চড় খেয়ে চাক্‌রী ছাড়ে, সেই লোকই স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট, এবং অদৃষ্টের অধীন। আমরা এইটুকু বুঝতে পারিনে। অবশ্য, পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সেটা মঙ্গলের জন্য চড়। এ রকম চড় খেয়ে যদি স্বামী, কিংবা স্ত্রী, কিংবা প্রভু, কিংবা চাকর, কিংবা পুত্র কন্যা, সাম্‌লে যায়, তারাই স্বাধীন হয়, তারাই ভবিষ্যতে কর্ত্তা হয়। আর যাদের একটা ভ্রমাত্মক স্বাধীনতার ভাব চেগে উঠে, তারা অদৃষ্টক্রমে ক্রমে অহরহঃ চড় খেতে থাকে। তুমি যদি চড় খেয়ে চাক্‌রী না ছাড়, তবে তোমাকেই আমি বন্ধু ও ভাই ব'লে গ্রহণ করব।

ইহা বলিয়া মহেন্দ্র রামধনের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন। তাহাতে রামধন কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল, এবং মহেন্দ্রবাবুর পা টিপিতে লাগিল।

২

রামধনের সহিত তর্কে পরিশ্রান্ত হইয়া মহেন্দ্রবাবু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন,

এবং সেই ঘুমে সারাদিন কাটিয়া গেল। নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিলেন যে, বেলা তিনটা। লোক জনের সাড়া শব্দ নাই। জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইল।

ইহার কারণ কি? মহেন্দ্রবাবুর মনে পড়িল যে, নিদ্রাকালে তিনি বাহ্য-চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া আত্মচৈতন্যের ক্রোড়ে ছিলেন। 'যা নিশা সর্ব্বভূতেষু তস্মিন্ জাগর্ত্তি সংযমী'। তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনি হাসিলেন, এবং একটা বাঁশী লইয়া বাজাইতে সুরু করিলেন।

এমন সময় একটী রমণী আসিয়া ডাকিল, 'দাদা, তুমি জেগেছ?'

সেই রমণী-ক্রোড়স্থ একটী শিশু ডাকিয়া উঠিল, 'মামা!'

বিনোদিনী মহেন্দ্রের খুল্লতাত-কন্যা। সে আই. এ. পাশ্, এবং দাদাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করে। 'খোকা' বিনোদিনীর তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র। সে মহেন্দ্র-বাবুর স্কন্ধে উঠিয়া বাঁশী বাজাইতে বসিল। বিনোদিনী গোটাকতক সন্দেশ আনিয়া মহেন্দ্রকে খাইতে দিল। মহেন্দ্রবাবু তাহা প্রীতিসহকারে গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন, এবং খোকাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'তুমি বাঁশী বাজাইতে থাক, আমি সন্দেশ খাই।'

সন্দেশ খাইতে খাইতে মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, এই সন্দেশ খাওয়া, যত রকম জীবনধারণের উপায় আছে, তাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, এটা মেয়েরা ভাল তৈরী কর্‌তে পারে। ভাল করে তৈরী করার অভ্যাস বংশানুক্রমিক। এটা যখন দেশ জুড়ে সকলেরই অভ্যাস, তখন বুঝ্‌তে হবে যে, আদিম কালে এটা সমাজে খুব প্রচলিত ছিল। সমাজে যেটা প্রচলিত হয়, সেটা সেই সমাজের আদর্শপুরুষ কিংবা রাজার পছন্দসই জিনিস। সে কালের রাজা সকলেই ধার্ম্মিক ছিলেন, অতএব বুঝতে হবে যে, সন্দেশ ধার্ম্মিক পুরুষদের খাদ্য। এ সম্বন্ধে যদি তোমার সন্দেহ থাকে, তবে তোমার সঙ্গে তর্ক কর্‌তে রাজি। বোধ হয়, তোমার মনে থাক্‌তে পারে যে, ন্যায় শাস্ত্রে এ রকম 'সিলজিস্‌ম'-এর অনেক দোষ হয়।

বিনোদিনী তর্ক না করিয়া বলিল, 'বরং তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল্ আছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সন্দেশ খেতেন।'

মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'তার আরও একটা প্রমাণ যে, খোকা বাঁশী বাজাতে ভালবাসে'। ইহা বলিয়া তিনি খোকার মুখচুম্বন করিলেন।

বিনোদিনী সুযোগ পাইয়া বলিল, 'দাদা, যদি বংশানুক্রমে ধর্ম্ম রক্ষা হয় তবে—।'

মহেন্দ্রবাবুর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া পড়িল, এবং তিনি বন্দ্যাক্তক...র হইয়া পড়িলেন। দার্শনিক প্রশ্নের মধ্যে বিবাহ ও বংশরক্ষা তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা জটিল! মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'বিনু! এখনও আমার এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আলোচনা হয় নাই।'

বিনোদিনী। কিন্তু দাদা, তুমি ত আগ্রায় চাক্‌রী করতে যাবে, আর কবে আলোচনা করবে? আমাদের সকলেরই ইচ্ছা যে, যাবার আগে কাজটা হয়ে যায়।

মহেন্দ্রবাবু ঈষৎ চঞ্চলভাবে বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমাদের মনের ভাব আমাকে বল। আমার বক্তব্য আমি পরে বলব।'

বিনোদিনী। দাদা! কিছু মনে ক'র না। আমি মূর্খ। আমরা মোটামুটি এই বুঝি যে, বিয়ে করা ধর্ম্ম। খুব ভাল কাজ। ভগবানের বিধান। বংশ-রক্ষা, জাতিরক্ষা, প্রাণরক্ষা, সমাজরক্ষা, এ সবই জগতের ভাল নিয়ম। এর উদ্দেশ্য কি, জানিনে; তবে মনে নেয় যে, কষ্ট পেলেও এ কাজ্‌টা করা উচিত।

মহেন্দ্রবাবু। তোমার কথার মধ্যে খাঁটী সত্য আছে, তবুও আমি ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিই। মিল, বেন্থাম, স্পেন্সর, ডারউইন, সকলের সঙ্গে তোমার মত মেলে। জগতের ক্রমবিকাশের একটা কারণ আছে। মনে করা যাক্, সেটা মঙ্গলময়। ক্রমবিকাশ হতে গেলে বংশবৃদ্ধি চাই, এবং জীবনধারণ চাই। জননী না থাক্‌লে, জীবনধারণ অসম্ভব। অতএব বিয়ে করতেই হবে, বিয়ে না হলে বংশরক্ষা হয় না। এ বিধানটা সনাতন, এবং সকল জাতির মধ্যে, সকল ধর্ম্মের মধ্যে ও সকল জীবের মধ্যে কোনও না কোনও রকমে দেখ্‌তে পাই। অতএব এটার 'এক্‌স্‌টার্ণাল স্যাংক্‌শন্' আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এটাও 'অটোম্যাটিক্', অর্থাৎ, অভ্যাসের বশবর্ত্তী কর্ম্ম হয়ে পড়েছে। যেমন তোমরা এক থালা সন্দেশ এনে দিলে আমরা খেয়ে ফেলি, তেমনই একটা 'বৌ' এনে দিলে আমরা বিয়ে করি। কিন্তু বুঝে দেখ যে, ক্রমবিকাশে 'অটো-ম্যাটিক্'গুলো 'ভলণ্টারি' হয়ে পড়ে। ভাল উপায় অবলম্বন ক'রে, বেছে নিয়ে, একটা আদর্শ দেখে বিয়ে করাই যুক্তিযুক্ত। আমাদের সমাজ আগে খুব হুঁসিয়ার ছিল, এখন সেটুকুর দিকে কেউ চেয়ে দেখে না।

বিনোদিনী। দাদা! আমরা যে কনে' পছন্দ করেছি, সে খুব সুন্দরী। অতি সুন্দর স্বভাব। তুমি দেখ্‌লেই 'ভলণ্টারি' হয়ে পড়্‌বে।

মহেন্দ্র। সুন্দরী আমার আদর্শ নয়। বংশের হিত, জাতির হিত ও

ধর্ম্মের বিকাশ যাহার দ্বারা হ'তে পারে, এমন স্ত্রী বেছে নেওয়াই 'ভলন্টিয়ের'র কাজ। নচেৎ সুন্দরী দেখে বিয়ে করে ফেলা, কিংবা টাকার লোভে বিয়ে করা যাদের উদ্দেশ্য, তাদের 'মোটিভ' ও 'ইনটেন্সন্', অর্থাৎ, মতলব ও উপায়, দুই-ই খারাপ। নীতিশাস্ত্রের মতে তাদের মনুষ্যত্ব এখনও হয় নাই।

বিনোদিনী। তুমি ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখো এখন। সে মেয়ে কিছুতে খাটো নয়। বিশেষতঃ আমি যখন তাকে বেছে ঠিক ক'রেছি, তখন—

মহেন্দ্র। সে আমাকে পছন্দ করবে কেন?

বিনোদিনী। তাও আমি ভাল ক'রে ভেবে দেখেছি।

৩

বিনোদিনী কিঞ্চিৎ আশা পাইয়া চলিয়া গেল।

মহেন্দ্র বাবু ক্রমেই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'রামধন!'

রামধন। হুজুর!

মহেন্দ্র। তোমার স্ত্রী ছিল;—সে কোথায়?

রামধন। আপনি জগার মার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন? সে বিশ বৎসর আগে অক্কা পেয়েছে। জগা এখন পুলিসে কাজ ক'চ্ছে।

মহেন্দ্র। তোমার বিয়ে করে' কোনও কষ্ট হয়েছিল?

রামধন। কষ্ট বিশেষ কিছু হয়নি। তবে পূজোর সময় জগার মা এক ছড়া সোনার হার চেয়েছিল, না পেয়ে সেই দুঃখেই ম'রে গেল। আমার সেইটুকুই কষ্ট।

মহেন্দ্র। তোমার মন-কেমন করে?

রামধন। মাঝে মাঝে মাথা ঘোরে। আপনাদের হাতে কলম না থাকলে যেমন শূন্তিকার বোধ হয়, জগার মা না থাকাতে আমারও সেই রকম হয়।

মহেন্দ্র খুব চিন্তাপূর্ব্বক বলিলেন, 'ইহার কারণ কি?'

রামধন বলিল, 'আমার বোধ হয়, সে আমাকে সামলে রেখেছিল, এখন চালাবার কেউ নেই ব'লে আমি স্রোতের মুখে হেলে দুলে যাচ্ছি।'

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, 'তুমি কারণ এবং অবস্থা, উভয়ের মধ্যে গোলমাল বাধাচ্ছ। চার দিকে যদি শুকনো খড় থাকে, তার মধ্যে আগুন পড়লেই অগ্নিকাণ্ড হয়। ভিজে খড়ের মধ্যে হয় না।'

রামধন। আমি শুকনো খড়েরই মত। মুখে একবার আগুন দিলে হয়!

মহেন্দ্র। তার কোনও সন্দেহ নাই। যখন তোমার মাথা ঘুরছে, সেই সময়ই আগুন লেগেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে আগুন দিল কে ?

রামধন। হয় ত সে-ই দিয়ে গেছে, কিংবা ভগবান দিয়েছেন! একই কথা।

মহেন্দ্র (সহাস্যে)। তুমি অনেকটা বুঝেছ। কিন্তু তুমি পুড়ে যাবার আগে যদি আমি এক পশলা বৃষ্টি দিয়ে তোমার অবস্থা ভাল ক'রে দিই, তবে কি হয় ?

রামধন। বিয়ে করবার আর ইচ্ছে নেই হুজুর! বিশ বচ্ছর জ্বলে' পুড়ে কষ্ট পেয়েছি, এখন দুঃখই আমার ভাল লাগে। হুজুরেরই এখন বিয়ে করবার বয়স।

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, 'যদি আমি তোমার মতন এখনই দুঃখ পেয়ে থাকি, তবে আমি বিয়ে ক'র্‌ব কেন? আরও বুঝিয়ে বলি। কারও দুঃখ স্ত্রীবিয়োগে হয়, কারও দুঃখ জগতের দুঃখ দেখে কল্পনাতে হয়। যদি দুটোতেই সমান দুঃখ হয়, তবে আমি বেকুফের কাজ ক'র্‌ব কেন?'

রামধন। হুজুর একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছেন। হয় ত কারও স্ত্রী আগে মরে; কারও স্ত্রী পরে মরে। এক জনের দুঃখ ত হবেই। সহমরণ আর চলে না। বংশরক্ষা কর্‌তেই হবে। তবেই ভেবে দেখুন যে, ভগবানের নাম ক'রে কাজটা সেরে ফেলাই ভাল।

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, 'কথাটা বড় জটিল। আরও ভেবে দেখ্‌তে হবে। ইত্যবসরে তুমি একটা কাজ কর। তোমার দিদিমণিকে বল যে, তিনি যে কনের কথা বল্‌ছিলেন, তাঁকে আমি দেখ্‌তে রাজি আছি।'

ইহাতে নিতান্ত উৎফুল্ল হইয়া রামধন চলিয়া গেল। রামধন চলিয়া গেলে মহেন্দ্র বাবু এক রাশি কাগজ লিখিয়া ফেলিলেন, এবং লিখিয়া সেগুলি ছিঁড়িলেন, এবং পুনরায় নূতন করিয়া লিখিলেন। তাহার পর চুপ করিয়া বসিলেন; আবার চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

এমন সময় হরিনাথ ভট্টাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন, 'বাবা, তোমার অভিলাষ অনুযায়ী আমরা কালই কন্যা দেখ্‌বার বন্দোবস্ত করেছি।'

মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে নমস্কার করিয়া বলিলেন, 'বসুন। আচ্ছা, একটা কথা আপনি বল্‌তে পারেন? জগতে এই যে সকল পরিবর্ত্তন হচ্ছে, এটা চঞ্চলতার লক্ষণ। এর কারণ কি?'

ভট্টাচার্য্য। বাবা! এর কারণ শাস্ত্রে বলে যে, প্রকৃতি পুরুষকে অধিকার ক'রলে পুরুষ মুক্তি লাভ করবার জন্য চঞ্চল হয়।

রামধনের পরে খোকা, তাহার পরে বিনোদিনী, এবং সকলের পশ্চাতে একটী অবগুণ্ঠনবতী সুন্দরী। তাহার কেশ দীর্ঘ, বাহু মৃণালের ন্যায়, এবং কপালে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা—

'বৌ'

কি ভয়ানক! তার চক্ষু কই? মহেন্দ্রবাবু দেখিলেন, মুদিত পল্লব। ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত।

মহেন্দ্রবাবু স্বপ্নাবস্থায় বিনোদিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপারখানা কি?'

খোকা বলিল, 'এ মামী মা।'

রামধন বলিল, 'এই বৌ ঠাক্‌রুণ।'

মহেন্দ্রবাবু দারুণ ভীতিসহকারে বলিলেন, 'বিনু, 'বৌ' শব্দের অর্থ কি? তুমি ত ন্যায়শাস্ত্র পড়েছ। খানিকটা বুঝিয়ে দাও।'

বিনোদিনী হাসিয়া বলিল, 'দাদা! 'বৌ' শব্দের 'কন্‌সেপ্ট্' (ধারণা) হ'তে অনেক দিন লাগে। 'বৌ' একটী স্ত্রীলোক। কিন্তু অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে এর প্রভেদ এই যে, 'বৌ' তোমার। তোমার জিনিস অন্যের জিনিস থেকে কত তফাৎ, তা বুঝিতে গেলে তোমারই পরীক্ষা করা উচিত। তাই আমরা চ'লে যাচ্ছি।'

বিনোদিনী, খোকা ও রামধন চলিয়া গেল। যাইবার সময় বিনোদিনী গৃহে একটী ল্যাম্প জ্বালিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। তাহারই আলোকে মহেন্দ্র বাবু দেখিলেন যে, 'বৌ' নিস্তব্ধভাবে তখনও দাঁড়াইয়া।

মহেন্দ্র বাবু স্বপ্নে দেখিলেন যে, বৌর চারি দিকে ছায়ার মত কতকগুলি পদার্থ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মনে হইল, সেগুলি ভীষণ সংসারের কতকগুলি অংশ। যেন বৌ তাহার মধ্যে জড়সড়!

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, 'তুমি ব'স। ভয় নাই। গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা ক'রব, তার উত্তর দিতে যদি আপত্তি না থাকে, তবে দিও। আমি টুকে নেব।'

বৌ উপবিষ্টা হইলে মহেন্দ্র বাবু কাগজ ও পেন্সিল লইয়া বিবাহের দার্শনিক তত্ত্বগুলি প্রথমে টুকিয়া লইলেন, এবং সম্মুখীনা বৌকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—'তুমি মনে কর, আমি এক জন গুরুমহাশয়। আমার কথাগুলোর সরলভাবে উত্তর দাও। যা মনে আসে, তৎক্ষণাৎ ব'লে ফেল। বেশী ভেব না। যদি কোনও কথাতে হাসি পায় ত হেস', কান্না পায় ত কেঁদ। যদি সন্দেহ হয় ত আমার দিকে চেয়ে থেক। যখন সন্দেহ হবে, আমি আবার বুঝিয়ে দেব।'

৫

মহেন্দ্র বাবু স্বপ্নাবস্থাতে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র। আমার দিকে তাকিয়ে বল যে, আমি উল্টো না সোজা। অর্থাৎ, আমার মাথা নীচের দিকে ও পা ঊর্দ্ধ দিকে কি না? অন্য জিনিসগুলো কি রকম?

বৌ আঁখিপল্লব উন্মীলিত করিয়া মহেন্দ্রের দিকে তাকাইল। মহেন্দ্র বাবুর বোধ হইল, সমস্ত জগৎ তাহারই মধ্যে।

বৌ ধীরে ধীরে বলিল, 'আপনাকে উল্টো দেখ্‌ছি। আপনার মাথা নীচে, আর পা ঊর্দ্ধ দিকে। অন্য জিনিসগুলো সব সোজা দেখছি।'

মহেন্দ্র বাবু টুকিয়া লইলেন।

মহেন্দ্র। আমি যে প্রশ্ন কর্‌ছি, তাতে তোমার মনে কি ভাব হ'চ্ছে? হাসি পাচ্ছে, না কান্না পাচ্ছে?

বৌ। কান্না পাচ্ছে।

মহেন্দ্র বাবু টুকিয়া লইলেন।

মহেন্দ্র। তুমি কখনও পাখী পুষেছ?

বৌ। আমার একটা ময়না পাখী আছে।

মহেন্দ্র। সেটাকে ছেড়ে দাও না কেন?

বৌ। তাকে আমি বুলি শিখিয়েছি। তিন বৎসর ধ'রে লালন পালন করেছি। কি ক'রে ছেড়ে দেব?

মহেন্দ্র। সে উড়ে গেলে অন্য দেশে অনেক লোকের কাছে অনেক বুলি শিখবে। তাতে বাধা দাও কেন?

বৌ এবার হাসিয়া বলিল, 'তা কখনও শিখ্‌বে না। একটা শিখ্‌বে, আর একটা ভুলে যাবে। অর্থ একই, বুলি অনেক রকম। এক জনের কাছে শিখ্‌লেই ভাল। উড়ে বেড়ালে কোনটাই শেখে না।

মহেন্দ্র বাবু টুকিয়া লইলেন।

মহেন্দ্র। আচ্ছা, মনে কর, তোমার সঙ্গে যদি কারও বিয়ে হয়, আর সে যদি তোমাকে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখে, আর তারই বুলি যদি তোমাকে শেখায়, তবে তোমার মনে কষ্ট হয় কি না? তোমার কোনও লজ্জা নাই, ঠিক করে বল।

বৌ সন্দিগ্ধনয়নে মহেন্দ্রের দিকে চাহিল।

মহেন্দ্র। তুমি ত অনেক বৌ দেখেছ। তারা হয় ত তাদের মনের কথা তোমাকে বলেছে। তোমার ধারণা কি?

বৌ। আমি তা ঠিক বল্‌তে পার্‌ব না। আমার দুটো ময়না ছিল। তাদের দু'জনকেই একটা খাঁচায় রেখেছিলুম। প্রথমে তারা ঝগড়া কর্‌ত। তার পর আলাদা খাঁচায় রেখে তাদের ঝগড়া মিট্‌ল। আমি যে বুলি শেখাতুম, তা দু'জনেই শিখ্‌ত। আমি না থাক্‌লে এক জন আর এক জনকে শেখাত। তাদের ত কোনও কষ্ট হয়নি। মানুষেরও হবার কথা নেই।

মহেন্দ্র। দুটো পাখীই এখনও আছে?

বৌ। একটা মরে গিয়েছে। যেটা বেঁচে আছে, সেটা কেবল মরাটার বুলি আওড়ায়। নতুন কথা শেখালেও শেখে না।

মহেন্দ্র। সেটাকে এবার উড়িয়ে দাও না কেন?

বৌ। যে দুঃখ পেয়েছে, সে উড়ে যাবে কেন? সে দিন বিনুদিদির খোকা খাঁচার দোর খুলে রেখেছিল, তবুও সে উড়ে যায় নি। আমাদের বাড়ীর কাছে এক জন নাপিতের বৌ আছে। সে বাড়ীর বাহিরে যায় না। তাদের সংসারে এত দুঃখ কষ্ট যে, তাই দেখ্‌তেই তার সময় কেটে যায়, বাহিরে যাবে কেন? সকলেরই তাই।

মহেন্দ্র বাবু ঢুকিয়া লইলেন।

মহেন্দ্র। আচ্ছা, এই যে ঘর দেখ্‌ছ, এর জিনিসগুলোর মধ্যে কোনও দুঃখ কষ্ট টের পাচ্ছ? যদি পাও, সেগুলোকে ঠিক্ করে ফেল।

বৌ সানন্দে উঠিল। 'এই বালিসটা মাটীতে প'ড়ে কাঁদ্‌ছে।' বৌ সেই বালিস হইতে ধূলা ঝাড়িয়া মহেন্দ্র বাবুর বালিসের পার্শ্বে রাখিল। একটা খেল্‌না উলঙ্গ ছিল, তাহাকে বস্ত্র পরাইয়া দিল। একখানা পুরাতন ছবির ধূলা ঝাড়িয়া দেওয়ালে সযত্নে টাঙ্গাইয়া দিল। টেব্‌লে চা'র দাগ ধরিয়াছিল, সেগুলি ধুইল। মহেন্দ্রের জুতার এক পাটি ঘরের এক কোণে উল্টাইয়া ছিল, তাহা লইয়া আর এক পাটির সহিত যুক্ত করিয়া রাখিল। মশারির মধ্যে গোটাকতক মশা ছিল, তাহা উড়াইয়া দিয়া মশারিটি গুছাইয়া রাখিল। কতকগুলি ছেঁড়া কাগজ কুড়াইয়া একত্র করিয়া ফেলিয়া দিল। একটা ঘড়ী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা চাবি দিয়া পুনরায় চালাইয়া দিল।

বৌর গৃহকর্ম্ম আর শেষ হয় না। এই ছোট ঘরটুকুর মধ্যে যে দুঃখ, তাহাই দূর করিতে করিতে রাত্রি কাটিল। দীপ নিভিয়া গেল। মহেন্দ্র বাবু ঢুকিতে ঢুকিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। বোধ হইল, প্রভাত হইয়া গিয়াছে। ঘর নির্জ্জন। বৌ চলিয়া গিয়াছে। এ জগৎ কি নশ্বর? তা ত বোধ

হয় না। গৃহ হাস্যময়। সে হাসিটুকু বৌ তার গৃহকর্ম্মে রাখিয়া গিয়াছে। এই বদ্ধ জগতের মধ্যে জড় পদার্থের দুঃখটুকু বিমোচন করিয়া বৌ তাহার অমর হাসি তাহারই মধ্যে দিয়া গিয়াছে। জগতের মধ্যে গৃহ। গৃহের মধ্যে বৌ। বৌ তাহার গৃহিণী। তার এত কাজ যে, সেই ছোট গৃহ ছাড়া তাহার বাহিরে যাইবার অবসর নাই। যত দিন বাঁচিয়া থাকিবে, সেই গৃহ ও গৃহস্থবর্গ তাহারই আনন্দে সজীব। সে না থাকিলে সবই শূন্য।

৬

মহেন্দ্রবাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল।

তিনি সজ্জিত গৃহ দেখিয়া সন্দিহান হইলেন। পার্শ্বে রামধন দাঁড়াইয়াছিল।

মহেন্দ্র। রামধন!

রামধন। হুজুর!

মহেন্দ্র। আমার ঘর এমন ক'রে সাজিয়ে গেল কে?

রামধন। দিদিমণি ও বাড়ীর দত্ত মহাশয়ের মেয়েকে দিয়ে কাজ গুছিয়েছেন।

মহেন্দ্র। আমি তখন কোথায়?

রামধন। বোধ হয় ঘুমিয়ে ছিলেন।

মহেন্দ্র। তুমি বিনুকে ডে'কে আন।

বিনোদিনী জড়সড় হইয়া আসিল। মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'অনেক সময় স্বপ্ন সত্য হয়ে পড়ে, তার কারণ কি?'

বিনোদিনী। আমি তা ঠিক জানিনে, তবে শুন্‌তে পাই যে, স্বপ্নের 'আমি' ও জাগ্রত 'আমি' একই মানুষ। বিশ্বের যত পদার্থ, সব জিনিসেরই ছাপ প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে পড়ে। জাগ্রত অবস্থায় সেটুকু আমরা জানতে পারিনে। তবে ঘুমন্ত অবস্থায় কখনও কখনও স্বপ্নে সেটা বেরিয়ে পড়ে। খোকা এমনই দুষ্টু যে, অনেক সময় বাহিরে খেল্‌তে গিয়ে গুঁতোগাঁতা খায়। সে ভয়ে বলে না, কিন্তু আমি না দেখ্‌তে পেলেও আমার প্রাণ সেটা দেখে। হয় ত স্বপ্নের সময় সেটা বেরিয়ে পড়ে, তখন ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে বুকে করি।

মহেন্দ্র। এটা 'ইমানেন্স্' থিওরি। অর্থাৎ, সকলেই বিশ্বচৈতন্যবিশিষ্ট। যা হোক্, স্বপ্নে গোটাকতক কথা আমি মনে মনে টুকেছিলুম, তা তোমাকে বল্‌ব। অর্থাৎ, বৌ নামক স্ত্রীলোকের 'কন্‌সেপ্ট' বড় জটিল।

১। উঁহারা স্বামীকে বিপরীত ভাবে দেখে, এবং তাহাকে সোজা করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করে।

২। স্বামীর কথা শুনিলে তাহাদের কান্না পায়।

৩। তাহারা স্বামীকে বদ্ধ করিয়া আর ছাড়িয়া দিতে চাহে না।

৪। নিজের গৃহের দুঃখমোচন করিতেই তাহাদের জীবন কাটিয়া যায়। ফলে আনন্দ রাখিয়া যায়।

৫। ন্যায়শাস্ত্রের মতে স্ত্রীলোক নামক 'জীনসে'র (genus) মধ্যে বৌ একটী 'স্পিষিজ্' ( species ) ইহাই প্রথমে উপলব্ধি হইবে। কিন্তু আমি বলি যে, বৌ নামক পদার্থের কর্ম্মকলাপ দেখিলে বোধ হয় যে, উহারা বিশ্বপদার্থ। বিজ্ঞান, বিশ্বপদার্থের মধ্যে প্রকৃতিকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। স্ত্রী-প্রকৃতিই সেই বৌ। এবং তাহার আদর্শ আমাদের ঘরের বৌ। তাহাদের নয়নে স্বামীর যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেটা 'ইনভার্টেড্'। আত্মচৈতন্যতে সেটা তারা ক্রমশঃ ঠিক করিয়া লয়। এই জন্য বৌ পরপুরুষের মুখ দেখিতে কুণ্ঠিতা। কতকগুলি প্রতিবিম্ব একত্র করিলে 'স্বামী' ( অর্থাৎ 'পরমপুরুষ' ) কি, তাহার কোনও নির্ণয় হয় না। দার্শনিক ক্যাণ্ট, কিংবা হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সর বহু পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়া, সম্পূর্ণ জ্ঞান অসম্ভব, ইহাই ঠিক করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান পুরুষের পক্ষে শীঘ্র সম্ভবে না। যাহারা সতী, তাহাদেরই সৎপদার্থের শীঘ্র জ্ঞান হয়। 'বৌ' সেই সতী নামক জীব। স্বামীর সন্দেহ দেখিলে তাহাদের দুঃখ হয়, এবং তাহাকে সেই জন্য বদ্ধ করিয়া নিজে বদ্ধ হয়, এবং উভয়ে উভয়ের দুঃখে দুঃখী হইয়া জ্ঞান লাভ করে।

বিনোদিনী দাদার মন্তব্য শুনিয়া খুব আহ্লাদিতা হইল। 'দাদা! তবে বৌকে মনে ধরেছে?'

মহেন্দ্রবাবু খুব গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'হাঁ! কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হয়েছি যে, তুমি যাকে এই ঘরে এনেছিলে, তাকে আমি স্বপ্নাবস্থায় দেখলুম কি ক'রে?'

বিনোদিনী হাসিয়া বলিল, 'বৌ জিনিস স্বপ্নাবস্থাতেই আসে, স্বপ্নাবস্থাতেই চ'লে যায়।'

ইহা বলিয়া বিনোদিনী চলিয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু ডাকিলেন, 'রামধন!'

রামধন। 'হুজুর!'

মহেন্দ্র। আচ্ছা, আমি ঘুমোবার সময় ধড়ফড় করেছিলুম, ইহার কারণ কি? আমার বোধ হয়েছিল যে, হার্ট ফেল্ হবে।

রামধন করযোড়ে বলিল, 'কর্ত্তা যখন আমাকে চড় মেরেছিলেন, তখনও

আমার ঐ রকম হার্ট ফেল্ হবার উপক্রম হয়েছিল। কষ্ট পেলে আমরা সকলেই স্বাধীন হ'তে চাই. কিন্তু সান্ত্বনা ক'রলেই আবার অধীন হয়ে পড়ি। হয় ত হুজুরকেও কেউ এসে সান্ত্বনা করেছিল।'

মহেন্দ্র এই উত্তর শুনিয়া রামধনকে পাঁচ টাকা বখশিশ্ দিলেন, এবং আড়-নয়নে চাহিয়া বলিলেন, 'বল্ ত, কে সান্ত্বনা করেছিল?'

রামধন খুব দূরে গিয়া মাস্তুসহকারে কহিল, 'বৌ ঠাকরুণ।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

# সহযোগী সাহিত্য।

## ভারতীয় ভাষাবিবর্ত্তন।

ভারতের প্রচলিত ভাষাগুলির সম্বন্ধে আজ কাল নানা প্রকার গবেষণা আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু অতীতের ক্রমবিকাশ ও পরিণতির ফলেই বর্ত্তমানের বৈশিষ্ট্য, সুতরাং আধুনিক ভাষা-তত্ত্বের আলোচনায় উহাদের পূর্ব্বাপর ইতিহাসের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। এই প্রবন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ভাষাবিৎ পণ্ডিত সার জর্জ গ্রীয়ারসন * ও অধ্যাপক ভাণ্ডারকর প্রভৃতির মতের আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষে ও সিংহলে আর্য্য উপনিবেশের সহিত আর্য্য সভ্যতার প্রচার আরম্ভ হয়। উপনিবেশ উপলক্ষে আর্য্যগণ যখন যে স্থানে গিয়াছেন, তাঁহারা তথায় আপনাদের ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজগত রীতিনীতি ও আর্য্য ভাষার বিস্তৃতিসাধন করিয়াছেন। আপাততঃ আমরা দেখিতে পাই যে, ভারত ও সিংহলের হিন্দুসভ্যতা মুখ্যতঃ আর্য্য সভ্যতারই প্রকারভেদ। সুতরাং সহজেই মনে হয় যে, তত্রত্য ভাষাও আর্য্য ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়াই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে প্রথিতনামা পণ্ডিত সার জর্জ গ্রীয়ারসনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মত এই যে— 'আর্য্য ও অসভ্য অনার্য্য ভাষার সংঘর্ষে শেষোক্তের পরাজয়ই অবশ্যম্ভাবী। আর্য্যগণ অনার্য্য ভাষায় কথোপকথনের চেষ্টা করিতেন না। কিন্তু পরস্পর মনোগত ভাবের আদান-প্রদানের জন্য অনার্য্যগণকে বাধ্য হইয়া উচ্চতর আর্য্য সভ্যতার ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। প্রথমতঃ অশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ আর্য্য ভাষার এক প্রকার বিকৃত রূপ ( pigeon form ) ব্যবহৃত হইতে থাকে। কালক্রমে এই বিকৃত রূপ বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিতে থাকে; শেষে আর্য্য ভাষারই প্রকারভেদে পরিণত হয়; কিন্তু ইতিমধ্যে তাহাদের অনার্য্য ভাষা প্রথমে বিস্মৃত, পরে লুপ্ত হইয়া যায়।' সার জর্জের উক্তি আংশিক সত্য হইলেও এক বিষয়ে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। আর্য্য সভ্যতার বিস্তৃতির সহিত উত্তর-ভারতে আর্য্য ভাষার প্রচলনে অনার্য্য দ্রাবিড় ভাষা বিতাড়িত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে আর্য্য ভাষা ও অনার্য্য দ্রাবিড়

* Prakrita Bibhasha, F. R. A. S.

ভাষার সংঘর্ষে অনার্য্য ভাষারই জয় হইয়াছে, এবং আর্য্য ভাষার অবনতি ও তিরোভাব ঘটিয়াছে।

প্রথমতঃ, উত্তর-ভারতের ভাষাবিবর্ত্তনের ইতিহাস, তাহার ক্রমবিকাশ ও পরিণতির বিষয় আলোচনা করা যাউক। উত্তর-ভারতে আর্য্যগণের উপস্থিতির পূর্ব্বে যে তথায় অনার্য্য দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বেলুচিস্থানে খান-অধিকৃত কেলাট-ভূমির অধিবাসী পার্ব্বত্য জাতির ভাষা ব্রাহুইতে কেবল কতকগুলি দ্রবিড় শব্দমাত্র নয়, বহুতর দ্রবিড়-ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, রূপ ও ব্যবহার-রীতি দৃষ্ট হয়। সিন্ধুনদের উত্তরে প্রচলিত ভাষাতেও এই দ্রবিড় উপাদান দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, আর্য্য সিথিয়ান প্রভৃতির ন্যায় দ্রবিড়গণও উত্তর-পশ্চিম মার্গে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনেক সংস্কৃত শব্দও যে প্রকৃতপক্ষে দ্রবিড় শব্দ, ইহাও অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কন্নড়-ইংরাজী ( Kannada-English ) অভিধানে শ্রীযুত Kittel এইরূপ শব্দাবলীর একটী সুদীর্ঘ তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তালিকাটীর একটী প্রধান দোষ এই যে, গ্রন্থকার কেবলমাত্র পাণিনি-নিয়ন্ত্রিত ( classical ) সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই শব্দচয়ন করিয়াছেন। উক্ত সাহিত্য কদাপি কথিত-ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত কি না, সে বিষয়ে এখনও যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, বৈদিক সাহিত্যের ভাষা যে এক সময় লোকে কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করিত, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। ইহাতেও দ্রবিড় ভাষার প্রভাব প্রস্ফুট। ছান্দোগ্য উপনিষদে ( ১।১০।১ ) 'মতচী' শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়।

মটচী হতেষু কুরুষু আটিক্যা সহ জায়য়া
উষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণক উবাস।

ইহাতে কুরুদেশে মতচী কর্ত্তৃক শস্য-ধ্বংসের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এক জন ব্যতীত সকল টীকাকারই 'মতচী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'শিলাবৃষ্টি।' কিন্তু এক জন মাত্র ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'রক্তবর্ণ-ক্ষুদ্র-পক্ষিবিশেষঃ।' * ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, এই রক্তবর্ণ-পক্ষবিশিষ্ট জীবগণ প্রকৃতপক্ষে 'পঙ্গপাল', এবং উহারা কুরুদেশের শস্য নষ্ট করিয়া ফেলিত। অদ্যাবধি ভারতের নানা দেশে ইহাদের অত্যাচার সমানে চলিয়াছে। এই 'মতচী' শব্দটী সর্ব্বজনবিদিত কানারীস ( Kanarese ) শব্দ মিদিচের সংস্কৃত রূপভেদমাত্র। কিটেলের অভিধানে 'মিডিচের অর্থ,—ঘাসচারী পতঙ্গ, বা পঙ্গপাল'। বোম্বাই প্রদেশের ধারওয়ার জেলায় অদ্যাবধি উহা এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। †

ছান্দোগ্য উপনিষদ ভারতের একটী প্রাচীনতম উপনিষদ। উত্তর-ভারতের পঞ্জাব প্রদেশে এই উপনিষদ তৎকালীন প্রচলিত কথিত ভাষায় নিবদ্ধ হয়। ইহাতেও দ্রবিড় শব্দ পাওয়া যাইতেছে, এবং যদি দ্রবিড়-ভাষাজ্ঞ পণ্ডিতগণ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বহুতর দ্রবিড় শব্দ বৈদিক সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, আর্য্য-অভিযানের পূর্ব্বে দ্রবিড়ি ভাষাই উত্তর-ভারতের ভাষা ছিল। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত

* F. R. A. S., 1911, P. 510.
† IA., 1913, P.235.

'খোকা' ও 'খুকী' (বালক ও বালিকা অর্থে) ওরাওন (Oraon) ভাষায় 'কোকা' ও 'কোকী'; বাঙ্গালা 'তেলো' (মস্তক) তেলুগু ভাষায় 'তলা', এবং তামিল 'তলাই'; বাঙ্গালা 'নোলা' (জিহ্বা) তামিলে 'নলু'। বহুবচনার্থ বাঙ্গালা 'গুলি' ও 'গুলা' তামিলে 'গল'। সংস্কৃত-বহুল কথিত বাঙ্গালায় এবংবিধ বহু দ্রবিড় শব্দ দৃষ্ট হয়। * হিন্দী ভাষায় অনেক দ্রবিড় শব্দ ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বদা প্রযুক্ত 'ঝগড়া' প্রভৃতি শব্দও দ্রবিড় ভাষা হইতে প্রাপ্ত। অতএব দ্রবিড় ভাষা যে এক সময়ে উত্তর-ভারতের কথিত ভাষা ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। † কিন্তু আপাততঃ উত্তর-ভারতে আর্য্য ভাষার একাধিপত্য দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে, আর্য্য ভাষার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনার্য্য ভাষা অন্তর্হিত হইয়াছে।

এইবার দক্ষিণ-ভারতের ভাষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, উত্তর-ভারতের ভাষা-সংঘর্ষের ঠিক বিপরীত ফল পরিলক্ষিত হইবে। আর্য্য ও অনার্য্য ভাষার সংস্পর্শে অনার্য্য ভাষার প্রাধান্য ও পূর্ব্বোক্তের অবনতি ঘটিয়াছে। ইহার কারণ, অন্বেষণ-চেষ্টার পূর্ব্বেই কিন্তু বিচার করা আবশ্যক যে, আর্য্য ও অনার্য্য ভাষার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল কি না; অর্থাৎ, আর্য্যগণ দক্ষিণ-ভারতে উপনিবেশস্থাপন করিবার পরও তত্রত্য অনার্য্য অধিবাসিগণ আর্য্য ভাষা বুঝিতে বা ঐ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত কি না? এ সমস্যার সমাধানে প্রত্নতত্ত্বের প্রমাণ প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ, দক্ষিণ-ভারতের তেলুগু-প্রধান প্রদেশটী গ্রহণ করা যাউক। এ স্থানে প্রাপ্ত অনুশাসনরাজির মধ্যে অশোক-অনুশাসনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মাদ্রাজের উত্তর-পূর্ব্বে গঞ্জাম জেলার জৌগড়া নামক স্থানে ক্ষোদিত অশোকের চতুর্দ্দশ গিরিলিপি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অনুশাসনগুলির উপর তত দূর নির্ভর করা যায় না; কারণ, এখানকার ভাষা প্রধানতঃ তেলুগু হইলেও উত্তরাংশে উড়িয়া ভাষাও প্রচলিত আছে। কেবলমাত্র দ্রবিড় ভাষা ব্যবহৃত হয়, এরূপ একটী স্থান গ্রহণ করা উচিত। দক্ষিণে কৃষ্ণা জেলা এইরূপ একটী স্থান। এ স্থানে তিনটী বৌদ্ধস্তূপ ও কয়েকটী অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। ভট্টিপ্রোলু প্রাচীনতম, তদনন্তর অমরাবতী, তাহার পর জগজ্জপেত। সবগুলিই দানসূচক দলীল, ইহাতে দাতা ও দানের বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অনুশাসনসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, সর্ব্ববিধ সমাজ ও অবস্থার লোকই এবংবিধ ধর্ম্মার্থদানে প্রবৃত্ত হইতেন। বৌদ্ধ শ্রেণী অথবা বণিক্‌সম্প্রদায়ের ন্যায় উচ্চতর অবস্থার ব্যক্তিবর্গের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; কারণ, অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন যে, তাঁহারা আর্য্য বিজেতৃগণের শাখাভেদ। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণকেও বর্জ্জন করা যাইতে পারে; কারণ, তাহাদের আদি সামাজিক অবস্থার বিষয় অনুশাসনলিপি হইতে স্পষ্টতঃ কিছু জানা যায় না। গহপতি বা গ্রাম্য ভূম্যধিকারী, হেবণিক বা স্বর্ণকার এবং চম্মকার বা চর্ম্মব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিষয় বিচারসাপেক্ষ, কারণ ইহারা নিঃসন্দেহরূপে অনার্য্য জাতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইহাদের ব্যবহৃত অধিকাংশ সংজ্ঞাই আর্য্য নাম, সুতরাং ইহারা যে আর্য্য সভ্যতার অনুশীলন ও অনুকরণের ফলেই আর্য্য নাম গ্রহণ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর থাকে না। এক জন ভূম্যধিকারীর নাম ইন্দ, অর্থাৎ

* বাঙ্গালা ভাষার দ্রাবিড়ি উপাদান, সা. পরিষৎ-পত্রিকা, Vol. XX. Pt. I.
† IA. 1916, P. 16.

ইন্দ্র ; তাহার পত্নী কন্হা অর্থাৎ কৃষ্ণা, তাহার কন্যার নাম রন্না। * এক জন স্বর্ণকারের নাম সিদ্ধথ, অর্থাৎ সিদ্ধার্থ,এবং দুই জন চর্ম্মকার পিতা পুত্রের নাম, বিধিক,অর্থাৎ বৃদ্ধিক, এবং নাগ। ইহাদের প্রত্যেকটীই যে আর্য্য নাম, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এক ব্যক্তির নাম কন্হ, অর্থাৎ কৃষ্ণ। ইহাও একটী আর্য্য নাম, কিন্তু সংজ্ঞাধারী নিজেকে দমিল নামে অভিহিত করিয়াছে। এই দামিল, তামিল ও সংস্কৃত দ্রাবিড় অভিন্ন। বস্তুতঃ উক্ত নামনির্দ্দেশই দ্রাবিড় জাতির প্রাচীনতম উল্লেখ। অতএব বেশ দেখা যাইতেছে যে, কৃষ্ণা জেলায় আর্য্য-উপনিবেশের ফলে তত্রত্য অনার্য্য অধিবাসিগণ আর্য্য সভ্যতায় এতাদৃশ বশীভূত হইয়া পড়ে যে, নিজেদের নামস্বরূপ আর্য্যসংজ্ঞা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে।

কিন্তু তাহারা আর্য্য-ভাষা বুঝিতে এবং উহাতে কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত কি? কৃষ্ণা জেলায় প্রাপ্ত অনুশাসনলিপি হইতে এ বিষয়ের কোনও প্রকার সন্ধান পাওয়া যায় কি না? অনুশাসনে ব্যবহৃত ভাষা হইতে এ প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর পাওয়া যায়। ইহাদের ভাষা পালি, এবং পালি আর্য্য-ভাষা। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রীঃ-পূঃ ১৫০ হইতে খ্রীষ্টাব্দের ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত কৃষ্ণা জেলায় আর্য্য ভাষা ব্যবহৃত হইত। অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, উক্ত আর্য্য-ভাষা উপনিবেশকারী আর্য্যগণই ব্যবহার করিতেন; ইতর লোকে উহা বুঝিত না। কিন্তু এরূপ আপত্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ; কারণ, মূল বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, ইতর ভদ্র সকলের ভিতরই ধর্ম্মের প্রচার কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত জেলায় সর্ব্ববিধ অবস্থার আদিম অনার্য্য অধিবাসীর ভিতর হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শিষ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা সকলেই যে ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিত, বুঝিতে পারিত, উহার ব্যবহারই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। এ বিষয়ে একটী প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। মহীশূর রাজ্যে কানারীস-( Kanarese )-ভাষা-প্রধান প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মহীশূরের অন্তর্গত চিতলদ্রুগ জেলায় অশোকের তিনটী ক্ষুদ্রতর গিরিলিপি ( Minor Rock Edicts ) পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের একটীতে অশোকের 'ধম্ম'শব্দের অর্থবোধক গুণসমূহের বর্ণনা, এবং সকলকে, বিশেষতঃ হীন অবস্থার লোকদিগকে উচ্চতম-জীবন-লাভের জন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সকল গিরিলিপির মুখ্য উদ্দেশ্য, লোকের শিক্ষাদান ও সৎ-কার্য্যে উৎসাহবর্দ্ধন। সর্ব্ববিধ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিনিচয়ের সহজসাধ্য ও বোধগম্য না হইলে উক্ত উদ্দেশ্যের সাফল্য অসম্ভব। এই সকল অনুশাসন পালিতে রচিত। সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, পালি তাহাদের জাতীয় ভাষা না হইলেও অন্ততঃ সকল শ্রেণীর লোকেরই সুখবোধ্য ও কথোপকথনের জন্য ব্যবহৃত হইত।

জাতীয় ভাষা ও সুখবোধ্য ভাষার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য একটী দৃষ্টান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিব। বহুসংখ্যক কানারীস-ভাষাভাষী প্রদেশ মারহাট্টাগণ কর্ত্তৃক বিজিত ও অধিকৃত হইয়াছিল, এবং তাহাদের কয়েকটী অদ্যাবধি মারহাট্টা অধিকারে রহিয়াছে। অত্রত্য আদিম অধিবাসিগণ সকলেই স্ব স্ব গৃহে বা পরস্পরের সহিত কথোপকথনে কানারীস ভাষা ব্যবহার করেন, কিন্তু অতি নীচ শ্রেণীর লোকেও মারহাট্টা বুঝিতে পারে। কানারীসদিগের নিজ

* A S S T., I. 55.

শিল্পকলা ও সাহিত্য বিদ্যমান থাকিতেও দুই শতাব্দীর মারহাট্টা অধিকারের ফলে এইরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু উপরিউক্ত পালি অনুশাসন হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্যগণ অন্ততঃ দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দী ধরিয়া আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব, অশোক অনুশাসন ও বৌদ্ধ স্তূপের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর আদিম দ্রাবিড় অধিবাসীই আর্য্য ভাষায় বাক্যালাপ করিতে, অন্ততঃ উহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেন।

কিন্তু আর্য্য ভাষা যে জাতীয় অনার্য্য ভাষার স্থান অধিকার করিতে পারে নাই, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিতরূপে একটী চমৎকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মিসর দেশে Oxyrtynctus নামক স্থানে একখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে কোনও অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের রচিত একটী গ্রীক প্রহসন নিবদ্ধ আছে।* ইহাতে চারিটিয়ন (Charition) নাম্নী গ্রীক মহিলার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। চারিটিয়ন জলযান-ধ্বংস নিবন্ধন ভারতীয় মহাসাগরের উপকূলস্থ কোনও স্থানে পতিত হইয়াছেন। ঐ দেশের রাজা স্বীয় অনুচরবর্গকে 'ভারতীয় নেতৃবর্গ' নামে সম্বোধন করিতেছেন। স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ যে স্থানে চারিটিয়ন তাঁহাদিগকে মদ্য বণ্টন করিয়া দিতেছেন, তথায় উক্ত রাজা ও তাঁহার স্বদেশবাসিগণ আপনাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতেছেন। অনেক বিচ্ছিন্ন শব্দ বুঝা যায়, কিন্তু আপাততঃ দুইটী সম্পূর্ণ বাক্য উদ্ধার করা গিয়াছে। ইহা হইতে নিশ্চিত সপ্রমাণ হয় যে, তাঁহাদের মাতৃভাষা কানারীস। একটী বাক্য—'বেরে কোঞ্চ মধু পত্রকেহকি'; অর্থাৎ, 'প্রত্যেক পাত্রে পৃথক্‌ভাবে কিঞ্চিৎ মধু ঢালিয়া'। দ্বিতীয়—'পানম্ বের এত্তি কত্তি মধুবম্ বের এত্তুবেনু'; অর্থাৎ, 'পাত্রটী পৃথক্‌রূপে গ্রহণ ও আচ্ছাদন করিয়া আমি স্বতন্ত্রভাবে মদ্য পান করিব।'

পাপিরাস (Papyrus) লিপিতে প্রযুক্ত ভারতীয় কানারীস ভাষা দেখিয়া অনুমান হয় যে, ভারতের পশ্চিম তীরভূমিতে কারওয়ার ও ম্যাঙ্গালোরের মধ্যবর্ত্তী কোনও বন্দরে চারিটিয়নের বৃত্তান্ত সংঘটিত হয়। প্রহসনের অভিনয়স্থান মিশর, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, মিশরে অনেকেই কানারীস ভাষা বুঝিত। কারণ, যদি মিশরের গ্রীক অভিনয়-দর্শনের জন্য সমাগত দর্শকবর্গ বিন্দুমাত্র কানারীস না জানিতেন, তাহা হইলে মদ্যপান-দৃশ্যটীর রসাস্বাদন দুরূহ হইত, এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যাপারটীই অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতিভাত হইত। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে মিশর ও ভারতের পশ্চিম উপকূলের মধ্যে রীতিমত বাণিজ্য চলিত; সুতরাং মিশরের কতক লোক যে কানারীস বুঝিতে পারিত, তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ সত্য। উক্ত পাপিরাস হইতে বেশ প্রতীতি হয় যে, খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতে দ্রবিড়-জাতীয় শাসক-সম্প্রদায় কানারীস ভাষায় কথোপকথন করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের কথিত কানারীস বিশুদ্ধ কানারীস নহে; ইহাতে পালি ভাষার বহু শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। গ্রীক প্রহসন হইতে যে দুইটী বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে পাত্র, পানম্ ও মধু (মদ্য) অনাবিল আর্য্য শব্দ; বৈদিক সাহিত্যেও তাহাদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। মদ্যপানের ন্যায় সাধারণ দৈনন্দিন

* F. R. A. S. 1904. p. 399 ff.

কার্য্যেও নিজেদের কানারীস শব্দ ব্যবহার না করিয়া আর্য্য শব্দের প্রয়োগ হইতে সপ্রমাণ হয় যে, আর্য্য ভাষার প্রভাব অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং জাতীয় ভাষা কানারীসের উপর স্থায়ী প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল।

যাহা হউক, সপ্ত শতাব্দীর আর্য্য আধিপত্য ও দক্ষিণ-ভারত হইতে অনার্য্য দ্রবিড় ভাষার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে নাই। ইহার কারণ কি? ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, দক্ষিণ-ভারতেও সভ্যতা, সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি প্রধানতঃ আর্য্যভাব-প্রণোদিত। এমন কি, দ্রাবিড় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন তামিল সাহিত্যেরও এমন কোনও অবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায় না, যখন মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ আর্য্যপ্রভাব প্রস্ফুট নহে। * তামিল দেশে সঙ্গম্ নামে এক প্রকার বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতি অনুসারে কয়েক জন নিয়ামক ( censor ) সাহিত্য হইতে আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্ম নিয়োজিত হইতেন। এই বিজ্ঞ সমালোচক-সম্প্রদায়ের মনোনীত হইলে গ্রন্থ রাজকীয় সাহায্যলাভের অধিকারী হইত। প্রবাদ আছে যে, মদুরায় এবংবিধ তিনটী তামিল 'সঙ্গ' ছিল। প্রথম দুইটী অলীক হইতে পারে, কিন্তু তৃতীয়টী যে ঐতিহাসিক সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তামিল পণ্ডিতগণের মতে ইহা খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দী বা তাহারও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু দেওয়ান বাহাদুর এল. ডি. এস. স্বামিকন্নি পিলাই জ্যোতিষ-গণনার উপর নির্ভর করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তামিল সাহিত্যের কোনও অংশই, এমন কি, 'তোল-কপ্যম্' † পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই যে, ঠিক এই সময়ে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাজকীয় শাসনলিপি প্রভৃতিতে পালি ভাষার প্রয়োগ প্রথমে বিরল, পরে লুপ্ত হয়।

অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পঞ্চম শতাব্দীতে দ্রাবিড় ভাষার পুনরভ্যুদয়ের জন্ম বিশেষ প্রবল উদ্যোগ হয়, এবং তাহারই ফলে আর্য্য ভাষা দ্রাবিড় ভাষার কিছুমাত্র ক্ষতি করিয়া উঠিতে পারে নাই। দ্রাবিড় ভাষাই আর্য্য ভাষাকে হীন করিয়া অনুশাসনলিপি ও সাহিত্যের ভাষা হইয়া দাঁড়ায়। দ্রাবিড়ী-কথিত ভাষাগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কানারীসের আবির্ভাব হয়। ৫৯৭—৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে চলুক্যরাজ মঙ্গলেশের শাসনপত্রে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তাহার পরে তামিল ৬১০—৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্ম্মা স্বীয় শাসনপত্রে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপে আর্য্য ভাষার প্রাবল্যে দ্রাবিড়ী ভাষার ক্ষতি না হইয়া, উহাই কেবলমাত্র দ্রাবিড় জাতির নহে, আর্য্যবংশধরগণেরও ভাষায় পরিণত হইল।

খ্রীষ্টীয় ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত আর্য্য ভাষা ও অনার্য্য ভাষা দক্ষিণ-ভারতে যুগপৎ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু তাহার পর আর্য্য ভাষার লোপ ও শেষোক্তের একাধিপত্য ঘটিল। অদ্যাবধি ঐ একাধিপত্য অব্যাহত।

দক্ষিণ-ভারত হইতে আর্য্যগণ সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ফলে সিংহলে উত্তর-ভারতের ভাষাবিপর্য্যয়ের পুনরভিনয় ও সার জর্জ গ্রীয়ারসনের সিদ্ধান্ত অব্যর্থ হইয়াছে। আর্য্য ভাষার প্রভুত্বে অনার্য্য সিংহলীয় অবনতি ও আর্য্য পালির বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে।

* S. Krishnaswami Aiyangar, Ancient India, p. 70.

† Syst. Chron. Early Tamil Lit. p. 23 pt. IV.

এই কারণে সিংহলের বৌদ্ধ ধর্ম্মসাহিত্য পালি ভাষায় রচিত। স্বনামধন্য বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের পুত্র কর্ত্তৃক খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে সিংহল বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইহাতে অনেকে অনুমান করিতে পারেন যে, মহেন্দ্র তাঁহার পিতার রাজধানী হইতে যে সকল ধর্ম্মপুস্তক সিংহলে আনয়ন করেন, তাহা নিশ্চয়ই মগধী ভাষায় লিখিত হইবে। কার্য্যতঃ কিন্তু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটী মাগধিক কথা বর্জ্জন করিলে সিংহলে প্রচলিত ধর্ম্ম-সাহিত্যের সহিত মাগধী পালির সাদৃশ্য অতি অল্প বলিয়া বোধ হয়। ইহার কারণ-অনুসন্ধানের ব্যপদেশে অধ্যাপক ওল্‌ডেনবার্গ সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তক-আনয়ন-প্রসঙ্গে মহেন্দ্রের বিবরণ মিথ্যা জনবাদ বলিয়া পরিহার করিয়াছেন। ইনি দেখাইয়াছেন যে, মহারাষ্ট্রের অনুশাসনাবলী ও উড়িষ্যার মহারাজ খারবেলের হথিগুম্ফা-অনুশাসনের সহিত সিংহলী পালির প্রভূত সামঞ্জস্য বিদ্যমান। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, দক্ষিণ-ভারতের মহারাষ্ট্র অথবা কলিঙ্গ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের সময়ে ত্রিপিটক সিংহল দ্বীপে আনীত হয়। মহারাষ্ট্র ও কলিঙ্গ উপনিবেশী আর্য্যগণ একই ভাষা ব্যবহার করিতেন, ইহা তাঁহাদের অনুশাসন হইতে প্রকাশিত হয়। পরে যখন তাঁহারা সিংহল অধিকার করিয়া তথায় বসতি করিলেন, তখন সেখানে তাঁহাদের আর্য্য ভাষা প্রচারিত হইল। এই উপনিবেশ-স্থাপন কার্য্য মৌর্য্য-অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে সুসম্পন্ন হয়, এবং আর্য্য ভাষা সিংহলীগণের ভাষায় পরিণত হয়। সুতরাং অধ্যাপক ওল্‌ডেনবার্গের মহেন্দ্রবিষয়ক মত স্বীকার না করিয়া বলা যাইতে পারে যে, মহেন্দ্র সিংহলে ধর্ম্মপ্রচারার্থ আসিবার পূর্ব্বেই পালি ভাষা সিংহলের কথিত ভাষা ছিল। মহেন্দ্রের আনীত বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ অবশ্য মাগধী পালিতে রচিত। কিন্তু বিনয়পিটকের চুল্লবগ্গে * ভগবান বুদ্ধদেব স্পষ্টরূপে আদেশ করিয়াছেন যে, ভিক্ষুগণ তথাগতের বার্ত্তা জনবর্গের নিকট তাহাদের নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা করিবেন। অতএব মহেন্দ্রের মাগধী সাহিত্যের পরিবর্ত্তে সিংহলের কথিত পালির প্রয়োগ অক্ষুণ্ণ রহিল। কয়েকটী মাগধী শব্দ ও রূপ থাকিয়া গিয়াছে; কারণ, মাগধী ও সিংহলী পালি প্রকৃতপক্ষে একটী আর্য্য ভাষারই রূপভেদমাত্র; উভয়ই পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আধুনিক সিংহলের ভাষাসমূহ পূর্ব্বোক্ত পালি ভাষার ক্রমবিকাশ।

আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিশ্লেষণকালে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উত্তর-ভারত ও সিংহলের ভাষা আর্য্যভাষাসম্ভূত, এবং দক্ষিণ-ভারতে অনার্য্য দ্রাবিড় ভাষা আর্য্য পালিকে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং বহুতর সমৃদ্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। †

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* Vinonya-Pitakam, Vol. I. Intro. pp. liv-lo

† Prof. D. R. Bhandarkar, Carmichæl Lecture.

# রায় পরিবার।

৫

শ্বশুরবাড়ীতে গৌরীর আদর যত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটী ছিল না। তাহার শাশুড়ী মুখে যাহা বলিয়াছিলেন, মনেও তাহাই ভাবিতেন; বধূরা 'ছেলেমানুষ', সুখে লালিতাপালিতা, পাছে তাহাদের কোনও অসুবিধা হয়, সেই জন্য তিনি তাহাদিগকে সংসারের কোনও কাজ করিতে দিতেন না; যে কাজ তাহারা সখ করিয়া করিতে চাহিত, কেবল তাহাই তাহারা করিতে পাইত। সে বিষয়ে গৌরীর মাতা গৌরীর অপেক্ষা অধিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিল; সে জিদ করিয়া কাজ করিত; গৌরীর সে বিষয়ে তেমন আগ্রহ দেখা যাইত না। বিধাত্রী দেবী তাহাকে যত আদরেই রাখিয়া থাকুন না, সর্ব্বদাই কাজ করিতে উপদেশ দিতেন, এবং শিখাইতেন। গৌরী যখন 'ঘর করিতে' যায়, তখনও তিনি তাহাকে সে বিষয়ে বিশেষ সদুপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু গৌরীর মাতার ভাবটা গৌরীতে সংক্রান্ত হইয়াছিল। মা যে সর্ব্বদাই মনে করিতেন, গৌরীর শ্বশুরবাড়ী তাঁহার মেয়ের উপযুক্ত হয় নাই, মেয়ে তাহা জানিত। সে পিতামহীকে সংসারের সব কাজ করিতে দেখিয়াছিল, এবং আপনার সংসারের কাজ আপনি করা যে অপমানজনক নহে, তাহাও বুঝিত; কিন্তু তাহার মা তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন, সে ত আর সংসারের কর্ত্রী নহে, কাজেই যে সংসারে ঝির অভাবে বাড়ীর বধূকে সংসারের কাজ করিতে হয়, সে সংসারে কাজ করা বধূর পক্ষে অপমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই গৌরী কাজ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত না। তাহাতে তাহার শাশুড়ী কিছুই মনে করিতেন না; কিন্তু সুশীল বিরক্ত হইত। বিশেষ শাশুড়ীর যে মতের বিষয় সে জানিতে পারিয়াছিল, তাহাতে সে গৌরীর ব্যবহারে সন্দেহ করিত, সেও মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে, শ্বশুরবাড়ী তাহার মত ধনী কন্যার উপযুক্ত হয় নাই। এইরূপ বিশ্বাস যুবকের পক্ষে যেমন কষ্টকর, তাহার ভালবাসার পক্ষে তেমনই মারাত্মক। ইহা সসর্প গৃহে বাসের অপেক্ষাও ভয়ানক, চক্ষুতে বালু লইয়া কাজ করার অপেক্ষাও কষ্টকর। সে যাহাই হউক, শ্বশুরবাড়ী যে গৌরীর কোনরূপ অসুবিধা হইতেছে, এমন কথা বলিবার অবকাশ তাহার মাতাও পাইলেন না।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেলে সুশীলকুমারের পরিবারে একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিল। মফঃস্বলে একটা মামলা করিতে যাইয়া তাহার ভগিনী-

পতি জ্বর লইয়া আসিয়াছিলেন। ক্রমে তাহা প্রবল হইলে ডাক্তারেরা রক্ত-পরীক্ষায় তাহার নিদান নির্ণয় করিলেন—কালাজ্বর। দীর্ঘ ছয় মাস সর্ব্ববিধ চিকিৎসা চলিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। জ্বরে পড়িবার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি অনেক টাকা খরচ করিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন, ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার খরচ কুলাইতে অবশিষ্ট সঞ্চিত অর্থ ফুরাইয়া গিয়াছিল। কাজেই তাঁহার মৃত্যুর পর সুশীল ও তাহার ভ্রাতা দিদিকে আপনাদের সংসার-ভুক্তা করাই সঙ্গত ও কর্ত্তব্য বিবেচনা করিল।

সুশীল হাইকোর্টের বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও ভাল করিয়া ওকালতী আরম্ভ করিতে পারে নাই; ভগিনীপতির চিকিৎসায় ও শুশ্রূষার জন্য বিব্রত ছিল। দিদিকে সংসারভুক্তা করিবার পর সে-ই জিদ করিল, বড় ভাগিনেয়কে বিলাতে পড়িতে পাঠাইবে। ছেলেকে বিলাতে পাঠাইবার সব ব্যবস্থা তাহার ভগিনীপতিই করিয়াছিলেন—কিন্তু কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সুশীল যখন তাঁহার সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে জিদ করিল, তখন তাহার দিদিই তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, 'ভাই, আমার পোড়া কপালে সে আশাও শ্মশানে পুড়িয়াছে, ও কথা আর তুলিও না। সে আশা এখন ছেঁড়া চেটাইয়ে শুইয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখার সমান।' সুশীল কিন্তু ছাড়িল না। দিদি বলিলেন, 'তুমি কি পাগল? একে এই সব ছেলে মেয়ে লইয়া তোমাদের গলগ্রহ হইয়াছি—তোমাদের অবস্থা যাহা, তাহাও ত জানি; এখন কি আর মাসে মাসে দুই শত তিন শত টাকা জোগান যায়!' সুশীল যেটা জিদ ধরিত, সহজে সেটা ছাড়িত না; সে হিসাব করিয়া দেখাইল, মাসে দুই শত টাকা হইলেই খরচ কুলাইবে, আর তাহাতে শেষে লাভ ব্যতীত লোকসান নাই; কারণ, এ দেশে ডাক্তার হইতে ভাগিনেয়ের আরও চারি বৎসর লাগিবে। বিলাতে যাইলে সে দুই বৎসরে ডাক্তার হইয়া আসিতে পারিবে। সে বলিল, 'তোমার বাড়ীর ভাড়া মাসে এক শত টাকা আছে, আর আমার শ্বশুরবাড়ীর এক শত টাকা আছে, ইহাতেই কুলাইয়া যাইবে।' দিদি অনেক করিয়া বুঝাইলেন, এখন আর সুধীরকে বিলাতে পাঠান সম্ভব নহে। সুশীল কিছুতেই বুঝিল না। সুধীর প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল—তাহাকে সে এক মাসের মধ্যেই বিলাতে পাঠাইবে। সে তখনই সব ব্যবস্থা করিতে বসিয়া গেল। দিদি সংসারভুক্তা হওয়ায় খরচ বাড়িয়াছে, যথাসম্ভব ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইবে। কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও, পাছে বধূদিগের অসুবিধা হয়,

সেই আশঙ্কায় তাহার মাতা দুই বধূর জন্য দুই জন দাসী রাখিয়াছিলেন। সেই বাহুল্য কমাইয়া সুশীল ব্যয়সঙ্কোচের প্রস্তাব করিল। সেই প্রস্তাব হইতে সংসারে বিষম গোল বাধিল।

গৌরীর দাসীর কাজ কিছুই ছিল না বলিলেই হয়। কাজের মধ্যে তাহার বাপের বাড়ী সংবাদ-বহন। সে দেখিল, এইবার সে অবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; তাই সে নানা কথায় গৌরীর 'কান ভারী' করিতে লাগিল। গৌরী তাহার কথায় বুঝিল, এই যে ব্যবস্থা হইতেছে, ইহাতে তাহার মর্য্যাদার হানি হইতেও পারে, অসুবিধা হইবেই।

পর দিন অপরাহ্ণে গৌরী সংবাদ পাঠাইয়া বাপের বাড়ীর গাড়ী আনাইয়া মার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। মা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ তাড়াতাড়ি আসিলি কেন? আজ মাসের সংক্রান্তি, আজই ফিরিয়া যাইতে হইবে; যখন আসিলি, দুই দিন পরে আসিলে ত দুই দিন থাকিয়া যাইতে পারিতিস'। উত্তরে গৌরী বলিল, 'কাল হইতে আমার ঝি সংসারের কাজে যাইবে, আর ত আসিবার অবসর পাইব না, তাই আজ আসিলাম।' মা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন রে?' তখন গৌরী সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'ঠাকরুণ যে কি বুঝ বুঝিয়া এ কাজ করিয়াছিলেন!' তাহার পর তিনি বলিলেন, 'আমি কাল সুশীলকে বলিব, তা হইবে না; তোর ঝি রাখিতে হইবে।' গৌরী বলিল, 'না—তুমি কিছু বলিও না; কি জানি কে কি মনে করে।' মা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, 'কেন? আমি ত মাসে এক শত টাকা দিয়া থাকি, আমার মেয়ের একটা ঝি রাখিতে হইবে, সে কথাও বলিব না? এত ভয় কিসের?'

সন্ধ্যার পর গৌরী যখন ফিরিয়া গেল, তখন মার আদেশে রমা দিদির সঙ্গে যাইয়া সুশীলকে পর দিন নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল।

মেয়ের বিবাহে যে তাঁহার কথা থাকে নাই, শাশুড়ী আপনার মতে কাজ করিয়াছিলেন, সে কথা গৌরীর মা কখনও ভুলিতে পারেন নাই। সে বিষয়ে তাঁহার আহত অভিমান মনের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া, বাহির হইবার পথ সন্ধান করিতেছিল—পথ পাইতেছিল না, কাজেই সুশীলের সঙ্গে ঝি রাখার কথায় তিনি রাখিয়া ঢাকিয়া কথা কহিতে পারিলেন না, কথাটা গোড়া হইতেই একটু কড়া হইল। সুশীলও এই বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্ক ছিল; গোড়া হইতেই কথাটা একটু বাঁকা ভাবে ধরিল। শাশুড়ী যখন প্রথমে বলিলেন, 'গৌরীর

ঝিকে না কি জবাব দিতেছ?' তখনই সুশীল বুঝিল, পূর্ব্ব দিন গৌরীই আসিয়া সে সংবাদ দিয়া গিয়াছে। সে দৃঢ়ভাবে বলিল, 'জবাব দিতেছি না, অন্য কাজ দিতেছি।' শাশুড়ী সে ব্যবস্থায় আপত্তি করিয়া বলিলেন, 'দেখ বাবা, তা হইবে না—আমার ঐ এক মেয়ে, উহার কোনও কষ্ট আমি সহ্য করিতে পারিব না।' সুশীল উত্তর দিল, 'যাহাতে কোনও কষ্ট না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করিয়াছি।' শাশুড়ী মাত্রা আর একটু চড়াইয়া বলিলেন, 'দেখ, আমি যে মাসে মাসে এক শত টাকা দিয়া থাকি, সে তোমার ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীর জন্য নহে, আমার মেয়ের জন্য।' সুশীল বলিল, 'অনুগ্রহ করিয়া এই মাস হইতে আর টাকা দিবেন না। যত দিন সে টাকা স্নেহের উপহার ছিল, তত দিনই ভাল ছিল; এখন তাহা অনুগ্রহ হইয়াছে, সুতরাং আমার পক্ষে সে টাকা লওয়া একেবারেই নিগ্রহ।' তাহার মাসহারা যে অনুগ্রহে পরিণত হইয়াছে, ইহা সে এত দিন লক্ষ্য করিতে পারে নাই বলিয়া, সুশীল আপনাকে ধিক্কার দিল। বিধাত্রী দেবীর আমলের আর বর্তমান সময়ের ব্যবস্থায় প্রভেদ মুহূর্ত্তে তাহার কাছে পরিস্ফুট হইল। তিনি গোপনে তাহাকেই মাসহারার টাকা দিতেন—সে আসিতে না পারিলে দুইবার তাহার বাড়ীতে যাইয়াও দিয়া আসিয়াছিলেন; এখন আর সে আবরণ নাই। এই কথা স্মরণ করিয়া সুশীল আপনার প্রতি ধিক্কারে একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শাশুড়ী বলিলেন, 'আজ তাহা বলিতে পার—এখন বুঝি 'মানুষ' হইয়াছ—আর দরকার নাই।' সুশীল বলিল, 'যে ভুল হইয়াছে, তাহা সংশোধন করা অসম্ভব, সুতরাং আমি আর কোনও কথা বলিতে চাহি না। আমি জানি, রূপে ও অর্থে যেমন জামাই আপনি চাহিয়াছিলেন, তেমন পান নাই। কিন্তু সে জন্য আমাকে অপরাধী করিতে পারিবেন না।'

সুশীল বুঝিতে পারিল, সে আপনার ধীরতা রক্ষা করিতে পারিতেছিল না; তাই সে ব্যস্ত হইয়া প্রস্থান করিল। শাশুড়ীর কাছে বিদায় লইবার সময় সে যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহা গৌরীর কাছে শুনিবার পূর্ব্বে তাহার মনেও হয় নাই। রাত্রিকালে শয়নকক্ষে আসিয়া সে দেখিল, গৌরী বসিয়া আছে। সুশীলের মনে হইত, তাহার সুন্দরী পত্নীর সঙ্গে সাগরের সাদৃশ্য অসাধারণ। গৌরীর মুখে সাগরের সৌন্দর্য্য, নয়নে সূর্য্যকরোজ্জ্বল নীলোর্ম্মির দীপ্তি, হৃদয়ে সাগরবারির চাঞ্চল্য, হাসিতে তরঙ্গলীলা, কুন্দদন্তে সাগরের ফেন-শোভা। আজ সে সাদৃশ্য আরও পরিস্ফুট মনে হইল আজ তাহার নয়নের দীপ্তি মধ্যাহ্ন-দিবাকরের কিরণপ্রদীপ্ত সাগরের

তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত, তাহার অধরে সাগরোর্ম্মির কুঞ্চন। গৌরী সুশীলকে বলিল, 'আমাদের বাড়ী গিয়াছিলে?' স্বরে কোমলতার লেশমাত্র ছিল না।

সুশীল বলিল, 'হাঁ।'

'মাকে প্রণামেরও অযোগ্য মনে করিয়া তাচ্ছীল্য করিয়া আসিয়াছ!'

সুশীল বুঝিল, ইহার মধ্যেই তাহার মাতা তাহাকে সংবাদ পাঠাইয়াছেন। কিন্তু শাশুড়ীর সঙ্গে কথা কহিবার সময় তাহার মনের বেগ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল—সে আর বিচলিত হইল না, বলিল, 'আমি বড় চঞ্চল হইয়াছিলাম, তাই, বোধ হয়, ভুল করিয়াছি; ইচ্ছা করিয়া যে তাঁহাকে প্রণাম করি নাই, এমন নহে।'

সুশীল নরম হইল দেখিয়া গৌরী সুরে আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিল—'তাহাতে মার কোনও ক্ষতি হইবে না, ক্ষতি যদি কাহারও হয়, সে তোমাদেরই। মাসহারার টাকা আর লইবে না, বলিয়া আসিয়াছ?'

'হাঁ।'

'তা'র পর? এ দিকে ত ভাগিনেয়কে বিলাতে পাঠাইতেছ!'

'তা'র পরের জন্য তত ভাবি না। গরীবের ছেলে অবস্থার উপযোগী আকারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া পরের পয়সায় 'বড়মানুষ' হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সে স্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছে, এখন আপনার অবস্থায় আপনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব।'

গৌরী আর কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, কেবল বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে বলিল, 'ওঃ—'

সে রাত্রিতে সুশীল ঘুমাইতে পারিল না। সে বুঝিল, তাহার জীবনে দাম্পত্য সুখের আশা গৌরীর সে দিনের ব্যবহারের অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্ম হইয়াছে—কেবল তাহাকে যাবজ্জীবন বহ্নিজ্বালা সহ্য করিতে হইবে। অথচ এই যাতনার কথা কাহাকেও বলিবার নহে। সে যত ভাবিতে লাগিল, তত দারিদ্র্যের মাহাত্ম্যে তাহার শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। তাহার মনে সঙ্কল্প দৃঢ় হইতে লাগিল—এক দিন সে ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব পদাঘাতে চূর্ণ করিবে, তাহার সমগ্র শক্তি অর্থার্জ্জনে প্রযুক্ত করিয়া সে দেখাইবে, সে অর্থ ধূলির মত পরিহার করিতে পারে। কিন্তু হায়!—জীবনের সব সুখ ত স্বপ্নের মত বিলীন হইয়া গেল। কেবল অর্থার্জ্জনে কি জীবন ব্যয়িত হইবে? সঙ্গে সঙ্গে সুধীরকে ব্যয়সাধ্য শিক্ষা দিবার সঙ্কল্পও সে করিল—সে সঙ্কল্প যেন গৌরীর ব্যবহারের প্রতিশোধ।

পর দিন আর একটা ঘটনা ঘটিল। সুশীল ভাগিনেয়ের যাত্রার জন্য

আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। বাজার করিয়া ফিরিয়া সে হিসাবটা লিখিবার জন্য আপনার বসিবার ঘরে গেল। তাহার শয়নকক্ষ তাহার পার্শ্বেই। গৌরী সেই ঘরে ছিল, এবং সুশীলের আগমন লক্ষ্যও করিয়াছিল—দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী দ্বার মুক্ত ছিল। অল্পক্ষণ পরেই সুশীল শুনিতে পাইল, এক জন স্ত্রীলোক গৌরীকে বলিল, 'কি গো, ছোট বৌদিদি, একা ঘরে বসিয়া আছ?'

গৌরী বলিল, 'এই যে তাঁতিনী! কাপড় আনিয়াছিলে?'

'না, বৌদিদি; আজ টাকা দিবার কথা ছিল, তাই আসিয়াছিলাম।'

'কত টাকা?'

'এই—তত্ত্বতাবাসের কাপড়ের দরুণ, প্রায় এক শত টাকা পাওনা ছিল, মাসে মাসে শোধ হয়ে আর টাকা ত্রিশ আছে।'

'আজ কত টাকা পাইয়াছ?'

'আজ টাকা পাই নাই; নাতির বিলাত যাইবার খরচ, তাই গিন্নী-মা বলিলেন, সামনের মাসে দিবেন।'

'ছিঃ—কথার ঠিক থাকে না!'

'ও কথা বলিও না, বৌদিদি, এ বাড়ীতে কথার নড়চড় হয় না—তবে এবার —অমন সংসার করিতে গেলেই হয়।'

'যাহার কথার ঠিক থাকে না, তাহার জীবনে থাকে কি? কথার ঠিক না থাকিলে কেবল ত আপনারাই ইতর জানান হয় না, যে যেখানে আছে, সবাইকেই ইতর করা হয়।'

'সে কি কথা, বৌদিদি!'

তাহার পর গৌরী তাঁতিনীকে কাপড়ের পুঁটুলী খুলিতে বলিল—কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও প্রায় সব কয়খানা কাপড়ই কিনিল, এবং 'ধারে আমার বড় ঘৃণা' বলিয়া আলমারী খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া দাম চুকাইয়া দিল।

গৌরীর এই ব্যবহারের লক্ষ্য কে, সুশীলের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না— যাতনায় যেন তাহার বুক কাটিয়া যাইতে লাগিল; নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সব আশা শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে নিরাশার বিস্ফোটক লইয়া জীবনে কেবল যাতনা ভোগ করিতে হইবে, ইহাই তাহার নিয়তি। কিন্তু সে কেমন করিয়া গৌরীর সান্নিধ্যে থাকিবে? যে সান্নিধ্য উভয়ের পক্ষে অনন্ত সুখের কারণ হইবার আশা সে করিয়াছিল, তাহা এখন অনন্ত দুঃখের কারণে

পরিণত হইয়াছে। গৌরী যখন তাহাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন সে তাহার গর্ব্ব লইয়াই সুখে থাকুক ; সে নিষ্ফল জীবনের বেদনা অনুভব করিবে না। কিন্তু সুশীল ? সে কি লইয়া থাকিবে ? অর্থ, যশ—এ সব কিসের জন্য ? যখন এ সকলে প্রেমাস্পদের সুখবিধান হয়, তখনই এ সব সুখের, নহিলে এ সব কেবল সময় কাটাইবার উপাদান, ব্যর্থ জীবনের বেদনা কার্য্যের প্রলেপে আবৃত করিয়া গোপন করিবার প্রয়াস। এই গৃহ, পিতার স্মৃতিপূত, মাতার স্নেহস্নিগ্ধ, স্বজনের ভালবাসায় সমুজ্জ্বল, এই গৃহে বাসও তাহার পক্ষে কেবল কষ্টের কারণ হইয়াছে। তবে সে কি করিবে ?

সুশীলের মনে পড়িল, কয় দিন পূর্ব্বে সে তাহার এক সতীর্থের পত্র পাইয়াছে। গিরিজা ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গিয়াছে। বঙ্গদেশে উকীলের আধিক্যে বিশেষ সুযোগ বা অসাধারণ প্রতিভা ব্যতীত নূতন লোকের পক্ষে অল্প দিনে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। গিরিজার আর্থিক অবস্থা তাহার পক্ষে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিবার অন্তরায় বলিয়া সে 'বিদেশে' গিয়াছে। সে সুশীলকে লিখিয়াছে, সে অল্প দিনের মধ্যেই পশার করিয়াছে। সে আরও লিখিয়াছে, তথায় সুশীলের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে সাফল্য সুলভ। সুশীল ভাবিল, সে 'বিদেশে' যাইলেই ত সব গোল চুকিয়া যায়। সে তাহাই করিবে।

হিসাব লেখা রাখিয়া সে সুধীরকে ডাকিল, এবং বলিল, সাত দিন পরে যে জাহাজ যাইবে, সে সেই জাহাজে যাইতে পারিবে ত ? বিলাতে যাইবার ঝোঁক সুধীরের পক্ষে নেশার মত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, 'নিশ্চয় পারিব।' তখন সুশীল যাইয়া মাতাকে সে কথা বলিল। মা বলিলেন, 'তোর, বাবা, যখন যেটায় ঝোঁক হয় ! এত তাড়াতাড়ি কেন ?' সুশীল বলিল, গিরিজার পত্র পাইয়া সে স্থির করিয়াছে, সে গিরিজার কর্ম্মস্থানে যাইবে, তাই সুধীরকে পাঠাইয়া যাইতে চাহে। মা আপত্তি করিয়া বলিলেন, 'তাহাতে কাজ নাই, আমি তোকে 'বিদেশে' যাইতে দিব না। সুখে হউক দুঃখে হউক, সব এক জায়গায় থাকিব।' সুশীল বলিল, 'দেখ, মা, এখন টাকার দরকার বাড়িতে চলিল—আর 'বিদেশ' ত এক দিনের পথ।' দিদি বলিলেন, 'তা কিছুতেই হইবে না।' কিন্তু সুশীলের মত বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে স্নেহযুক্তিসম্বল দুই জন নারীকে যুক্তিতর্কে পরাভূত করা সহজসাধ্য। যদিও আপনার প্রতিভায় তাহার যে প্রত্যয় ছিল, তাহাতে সে বিশেষ জানিত, সে কখনই তাঁহাদের

পশ্চাতে বদ্ধ 'গাধা-বোটে'র মত পরের শক্তিতে চালিত হইয়া সাফল্যের গঙ্গে ভিড়িবে না, তথাপি সে বলিল, 'মা, যখন ওকালতী করিব স্থির করিয়াছিলাম, তখন ভরসা ছিল, জামাই বাবুর সাহায্য। দিন কাল যেরূপ, তাহাতে তেমন সাহায্য না হইলে, এখানে পশার করা দুষ্কর। কিন্তু অন্য স্থানে এখনও সে সুবিধা আছে। তাই অনেক ভাবিয়া আমি যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি।' সুশীলের দাদাও তাহার যুক্তির সমর্থন করিলেন। তখন আর কোনও বাধা রহিল না। কেবল দিদির নয়নে অশ্রু শুকাইল না—তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, 'হায়, এমন পোড়া কপাল লইয়াই জন্মিয়াছিলাম! ভাই আমার—আমারই জন্য সর্ব্বত্যাগী, বনবাসী হইতেছে।'

মা এক দিন সুশীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর যাইবার কথা তোর শাশুড়ীকে বলিয়াছিস?' সে কথাটার খোলসা উত্তর না দিয়া সে বলিল, 'আমার যত ভয় ছিল তোমাকে। যখন তোমার মত হইয়াছে, তখন আর কাহারও মতের জন্য ভাবনা নাই।' তাহার পর মা প্রস্তাব করিলেন, সুশীল গৌরীকে লইয়া যাইবে—'না হয়, আমি দিন কতক থাকিয়া সংসার পাতাইয়া দিয়া আসিব। তোর দিদি থাকিতে এখানে কোনও অসুবিধা হইবে না।' সুশীল বলিল, 'মা, যে সাঁতার শিখিতে যাইতেছে, তাহার কোমরে ভারী জিনিস বাঁধিয়া দেওয়াটা সুবুদ্ধির কাজ নহে। সুবিধা হইবে আশা করিয়া যাইতেছি, যদি না হয়, ফিরিয়া আসিতে হইবে। এ সময় কি ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা করা চলে?' মা নিরুত্তর হইলেন; কিন্তু সে যে একা 'বিদেশে' যাইতেছে, সেটা কিছুতেই তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। বিশেষ, তাহার একা যাওয়াটা তিনি কিছুতেই ভাল মনে করিতে পারিতেছিলেন না।

সুশীলের যাইবার কথা বাড়ীর মধ্যে কেবল গৌরীই জানিতে পারে নাই। তাহার ঝি যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ছোটবাবু নাকি 'বিদেশে' যাইতেছেন?' তখন সে বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কই—আমি ত কিছু জানি না!' ঝি বলিল, 'তুমি আবার জান না! বিদেশে যাওয়া কেন?'

সুশীলের বিদেশে যাইবার প্রস্তাব এমনই অপ্রত্যাশিত যে, তাহা অসম্ভব মনে করিয়া গৌরী তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। সেরূপ ব্যবস্থা তাহার কল্পনারও অতীত, এবং ধারণারও সীমার বাহিরে।

কিন্তু অসম্ভবই সম্ভব হইল। সাত দিন পরেই এক দিন মধ্যাহ্নে সুশীরকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিয়া সন্ধ্যার পর সুশীল তাহার মনোনীত কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিল। ক্রমশঃ।

শ্রী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

# ঘাতকের মায়া।

১

মহেশ চক্রবর্ত্তীর ছেলে শিবু চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য হইলেও পাঁঠা কাটিয়া আপনার নামটাকে প্রসিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল।

সে গ্রাম্য দেবতা সিদ্ধেশ্বরীর সেবায়েত ছিল। এক পুরুষের সেবায়েত নয়, পাঁচ পুরুষের সেবা। সুতরাং পূজকের উপযুক্ত বিদ্যা না থাকিলেও সে পৈতৃক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই। পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত, গুরুর ছেলে গুরু, ইহাই নিয়ম। শিবুর বেলাতেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। দেবতার যে আয় ছিল, তাহাতেই সুখে স্বচ্ছন্দে তাহার সংসার চলিয়া যাইত।

সংসারে খরচও তেমন বেশী ছিল না; শুধু সে নিজে আর বুড়া পিসী। মা বাপ মারা গেলে পিসীই শিবুকে মানুষ করিয়াছিলেন। লেখাপড়া শিখাইবারও চেষ্টা যে না করিয়াছিলেন, এমন নহে; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। নিষ্ফলতার কারণ কতকটা তাঁহার আদর, কতকটা শিবুর অমনোযোগ। সাধারণ জ্ঞান হইবার পর শিবু দেখিল, সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় যে চাল কলা সন্দেশ বাতাসা ঘরে আসে, তাহাই খাইয়া যখন শেষ করিতে পারা যায় না, তখন ইহার উপর সরস্বতীর কৃপালাভের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিরর্থক। সুতরাং পাঠশালায় বর্ণপরিচয় শেষ করিবার পর যখন কৃত্তিবাসী রামায়ণ বানান করিয়া পড়িতে পারিল, তখন সে কেবল গুরুমহাশয়ের নিকট নয়, সরস্বতীর নিকট হইতেও বিদায় গ্রহণ করিল। পিসীমা এ জন্য অনুযোগ করিলে উত্তর দিল, 'ভাবনা কি পিসীমা, মা সিদ্ধেশ্বরী থাকৃতে আমাদের বংশে কারও গুরুমহাশয়ের বেত খাবার দরকার হবে না।'

উপনয়নের পর শিবু রামসদয় বাচস্পতির টোলে গিয়া জনৈক ছাত্রের নিকট হইতে কালীর ধ্যানটা লিখিয়া আনিয়া তাহা মুখস্থ করিল, এবং তাহার পর হইতে নিজে দেবতার পূজার ভার গ্রহণ করিল। পূজারীর ছেলে পূজারী হইবে, সুতরাং ইহাতে গ্রামের লোকের কোনও আপত্তি রহিল না। মূর্খ বলিয়া যে দুই এক জনের আপত্তি ছিল, পূজার কল্পকে দ্বিগুণ করিয়া লইয়া শিবু তাহাদের সে আপত্তির খণ্ডন করিয়া দিল। যদিও সে ধ্যানপাঠকালে 'দ্বিভুজা দক্ষিণে দেব্যাং মুণ্ডমালাং প্রসেবিতাং, সম্ভবিহ্বাং শিরং খড়্গো বামাদূর্দ্ধে করাম্বুজাং' পাঠ করিত, এবং 'সিদ্ধেশ্বরী কালিকায় নমঃ' বলিয়া দেবীর চরণে

পুষ্প প্রদান করিত, তথাপি সে মন্ত্রগুলি সুরের সহিত এমনই উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিতে থাকিত যে, বাজারের দোকানদারেরা তাহা শুনিয়া প্রশংসা করিয়া বলিত, 'লেখাপড়া না জানলে কি হয়, পূজারী ঠাকুরের ভক্তিটুকু বেশ আছে।'

শিবুর এই ভক্তিটুকু আরও বর্দ্ধিত হইত,যে দিন কোনও যজমান পাঁঠা লইয়া মানসিক শোধ করিতে আসিত। সে দিন সে নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির 'ব্রহ্মমুরারি ত্রিপুরান্তকারী' হইতে আরম্ভ করিয়া 'নমঃ শিবায় শান্তায়' পর্য্যন্ত একনিঃশ্বাসে পড়িয়া যাইত। এই ভক্তিবৃদ্ধির কারণও ছিল। আগে কামারে পাঁঠা কাটিত, এবং সে পারিশ্রমিকস্বরূপ ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হইত। শিবু ইহাঁতে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল, এবং সে দেশের যেখানে যত বেল গাছ ছিল, তাহা উজাড় করিয়া বেল আনিয়া তাহা কাটিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সে ছেদন কার্য্যে হাত পাকাইয়া প্রচার করিল যে, বলিচ্ছেদ পূজকেরই কার্য্য, সুতরাং এখন হইতে সে নিজেই বলিদান করিবে। ইহাতে কামার বৃত্তিলোপের আশঙ্কায় আপত্তি তুলিল। কিন্তু শিবু তাহার প্রাপ্য ছাগমুণ্ড তাহাকে দিতে স্বীকৃত হওয়ায় কামার নিরস্ত হইল।

শিবু দিন কতক আপনার কথা রাখিল, নিজে পাঁঠার মুড়ি লইয়া কামারের ঘরে পঁহুছাইয়া দিত। তার পর আর কে বা যায়! কামারও ভাবিল, দূর হউক, বামুনের ছেলে পাঁঠা কাটবে, আর আমি তার মুড়ি খাব। তার চেয়ে বামুনে খায় মন্দ কি। তদবধি ছাগমুণ্ড শিবুর নিজের ঘরেই আসিত, এবং তদ্দ্বারা তাহার পরিপাটীরূপে নৈশ-ভোজনের আয়োজন হইত। যে দিন দুই তিনটা পাঁঠা কাটা হইত, সে দিন শিবু দুই এক জন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত, এবং তাহার গাঁজার পরিমাণটা ডবল মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত।

ক্রমে শিবু পাঁঠা কাটায় এমনই সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিল যে, গ্রামের যেখানে যত বড় বড় পাঁঠা কাটা হইত, সেইখানেই পূজারী ঠাকুরের ডাক পড়িত। অনেক স্থলে সে আবার উপযাচক হইয়া, বিনা পারিশ্রমিকে পাঁঠা কাটিতে ছুটিত, এবং বড় বড় পাঁঠাগুলাকে এক এক কোপে কাটিয়া দর্শকগণের বিস্ময় ও প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিকেই স্বীয় বীরত্বের যথেষ্ট পারিশ্রমিক বলিয়া মনে করিত। তার পর মুদীর দোকানে, কামারশালায় বসিয়া পাঁঠা কাটার মধ্যে যে কত প্রকার কৌশল আছে, তাহাই ব্যক্ত করিতে থাকিত। তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া লোকে বুঝিতে পারিত, পাঁঠা কাটার মত মহৎ কার্য্য পৃথিবীতে আর নাই!

এই মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া, মধ্যে মধ্যে গাঁজায় দম দিয়া, এবং সিদ্ধেশ্বরীর পূজা করিয়া শিবু যখন স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছিল, তখন পিসীমা ধরিয়া বসিল, 'বিয়ে কর্ শিবে, বাপের বংশরক্ষা হউক্।'

বংশরক্ষায় শিবুরও আপত্তি ছিল না। সুতরাং সে বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে সাত বিঘা জমী বন্ধক দিয়া চারি শত টাকা সংগ্রহ করিল, এবং সেনহাটীর পরমেশ্বর বাউলী মহাশয়কে সেই টাকা ধরিয়া দিয়া, তাঁহার সাড়ে সাত বৎসরের কন্যার পাণিগ্রহণ করিল। কিন্তু বিবাহের পর একটা গোল উঠিল, পরমেশ্বর বাউলীর বিবাহগত দোষ আছে; তিনি অধিকারী ব্রাহ্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; শিবুর চারি শত টাকা মূল্যের পত্নী সেই অধিকারী-কন্যার গর্ভজাত। গ্রামে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। গ্রামের প্রধানেরা ধরিয়া বসিল, হয় মেয়েটীকে ত্যাগ কর, নয় সিদ্ধেশ্বরীর সেবা ছাড়।

শিবু জীবিকার একমাত্র অবলম্বন দেবসেবা ছাড়িতে পারিল না, নববিবাহিতা পত্নীকেই ত্যাগ করিল।

সে আজ প্রায় সাত আট বৎসরের কথা। তার পর অনেকেই শিবুকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। শিবু কিন্তু তাহাদের কথায় কান দেয় নাই, বা বিবাহের কোনও চেষ্টাও করে নাই। কেবল সকালে এক ছিলিম গাঁজা বাড়াইয়া দিয়াছিল।

২

সকালে গাঁজায় দম দিয়া বেশ এক ছিলিম কড়া তামাক সাজিয়া লইয়া, শিবু রাস্তার ধারের চালাটীতে বসিয়া আছে, এমন সময় একটী কৃষ্ণবর্ণ ছাগশিশু কুর্দ্দন করিতে করিতে তাহার সম্মুখে আসিল, এবং দুই একবার অস্ফুট শব্দ করিয়া তাহার জানুতে শৃঙ্গহীন মস্তক ঘর্ষণ করিতে লাগিল। শিবু বাঁ হাতে হুঁকা ধরিয়া ডান হাত দিয়া তাহার পিটে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল।

রসিক রায় রাস্তা দিয়া যাইতেছিল; পূজারী ঠাকুরকে তামাক খাইতে দেখিয়া সে আসিয়া পাশে বসিল। শিবু কলিকা-সমেত হুঁকাটা তাহার দিকে হেলাইয়া দিল। রসিক হাত বাড়াইয়া হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটা খুলিয়া লইল, এবং উভয়-হস্ত-সংযোগে তাহাতে টান দিতে দিতে শিবুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছাগশিশুটীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'দিব্যি নধর পাঁঠাটা! কার হে?'

শিবু সম্মুখস্থ কুটীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'দীনুর মায়ের।'

রসিক বলিল, 'বুড়ী বুঝি ছাগল চাষ করে?'

শিবু বলিল, 'কাজেই। ছেলে গেছে, কিন্তু পেট তো আছে।'

শিবুর স্বরটা যেন করুণায় আর্দ্র হইয়া আসিল। রসিক সে দিকে মনোযোগ না দিয়া, ছাগশিশুর উপর লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'পাঁঠাটী কিন্তু চমৎকার। তবে এখনও বলির লায়েক হয় নি।'

শিবু বলিল, 'এই মোটে মাস ছ'য়ের।'

ছাগশিশুটী তখন সরিয়া আসিয়া শিবুর পৃষ্ঠ-লেহনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। রসিক ধূমপান শেষ করিয়া, কলিকাটা শিবুর হস্ত-ধৃত হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিয়া বলিল, 'তোমার সঙ্গে যে খুব ভাব দেখ্‌ছি।'

সহাস্যে শিবু বলিল, 'আমি এখানে বসলেই ছুটে আমার কাছে আসে।'

রসিক বলিল, 'দিন থাকতে ভাব ক'রে রাখছে। তোমার হাতেই তো এক দিন ওর নিয়ৎ আছে।'

রসিক হাসিয়া উঠিল। তাহার সে উচ্চ হাস্যধ্বনিতে ভীত হইয়া ছাগশিশু অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে শিবুর কোলের কাছে সরিয়া আসিল। শিবু ডান হাত দিয়া তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া তামাক টানিতে লাগিল। রসিক উঠিয়া গেল।

শিবু ডাকিল, 'কালু!'

ছাগশিশুটী কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া শিবু তাহাকে কালু, কালুয়া, কেলো প্রভৃতি নামে অভিহিত করিত। তাহার সাদর আহ্বানে কালু আর একটু সরিয়া আসিল, এবং নিজের মুখটা উঁচু করিয়া শিবুর মুখের উপর স্থাপন করিতে উদ্যত হইল। শিবু 'আঃ' বলিয়া বিরক্তভাবে তাহার মুখটা ঠেলিয়া দিল। কালু যেন এ বিরক্তিটুকু বুঝিতে পারিয়া একটু পিছাইয়া আসিল, এবং একবার তাহার পৃষ্ঠে ও জানুদেশে মাথা ঘষিয়া পাশে শুইয়া পড়িল। শিবু তামাক খাইতে খাইতে তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার গলাটা টিপিয়া টিপিয়া স্থূলতা ও কোমলতার পরীক্ষা করিতে লাগিল। নাঃ, নিতান্তই কোমল, হাড় নাই বলিলেই হয়; এখনও খড়্গাঘাতের আদৌ উপযুক্ত হয় নাই; হাড়ীকাটে ফেলিয়া একটা টান দিলেই ছিঁড়িয়া যাইবে। অন্ততঃ এক বৎসরের না হইলে ইহাকে কাটিয়া সুখ নাই।

ঘাড়ের লোমগুলিকে সুবিন্যস্ত করিতে করিতে শিবু ডাকিল, 'কালু!'

কালু মুখ তুলিয়া চাহিল। শিবু বলিল, 'তুই যখন বড় হবি, আর আমি তোকে কাটতে যাব, তখন কি হবে বল্ দেখি?'

কালু উত্তর করিল, 'প্যাঁ—এঁ্যা।'

সহাস্যে শিবু বলিল, 'হবে আর কি, তোর পশুজন্ম উদ্ধার হ'য়ে যাবে। কিন্তু তুই মনে করবি, বামুনটা কি নিষ্ঠুর!'

কালু উত্তর দিল, 'প্যাঁ—এঁ্যা—এঁ্যা।'

শিবু হাসিয়া উঠিল; বলিল, 'দূর বেটা, ভয় পেলি নাকি? না না, আমি তোকে কাটবো না। কেমন?'

কালু স্বীয় সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের মধ্যে মাথাটা গুঁজিয়া দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। পিসীমা আসিয়া বলিলেন, 'হাঁরে শিবে, এখনো ব'সে বসে গল্প করবি, এর পর নাইবি, পূজো করবি কখন্?'

বলিয়াই তিনি ইতস্ততঃ চাহিয়া অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন, 'ওমা, কার সঙ্গে গল্প কচ্ছিস্? এই ছাগলছানার সঙ্গে?'

শিবু বলিল, 'কেন পিসীমা, ছাগলছানাটা কি মানুষ নয়?'

ঈষৎ হাসিয়া পিসীমা বলিলেন, 'হাঁ, মস্ত মানুষ। তা এখন উঠবি না কি? তোর আবার আজ কাল পূজোর ঘটা এত বেড়েছে যে, দুপুর গড়িয়ে গেলেও পূজো সাঙ্গ হয় না।'

শিবু বলিল, 'কি করি বল পিসীমা, মন্ত্র তন্ত্র তো কিছুই জানি না, তাই মায়ের কাছে দু'দণ্ড ব'সে মাকে বুঝিয়ে বলি, মাগো, বামুনের ছেলে, গলায় শুধু পৈতেগাছটা আছে মাত্র, মন্ত্রহীন, তন্ত্রহীন, ভক্তিহীন, নিজের পূজা নিজে নাও মা।'

পিসীমা যেন একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, 'তা বাছা, একটু সকাল সকাল গিয়ে তো মাকে বুঝিয়ে বললে পারিস্।'

পিসীমা গজ্‌গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। শিবুও স্নানে যাইবার জন্য উঠিতে উদ্যত হইল। এমন সময় নিতাই মণ্ডল আসিয়া বলিল, 'হ্যাদে বাবাঠাকুর, একটু সকাল সকাল মায়ের থানে চলো, আমাকে আজ মানসিক শোধ কত্তে হবে।'

একটু উল্লাসের সহিত শিবু বলিয়া উঠিল, 'তোর সেই খয়রা বড় পাঁঠাটা দিবি নাকি?'

নিতাই ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শিবু জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ হঠাৎ যে?'

নিতাই বলিল, 'কি করি বল, দায়ে প'ড়ে। ছোট ছেলেটার ভাত, পাঁচ

কুটুম্‌কে নেমন্তন্ন করা হ'য়েছে; কিন্তু তিনটে বাজার চুঁড়ে দু' সের মাছ মিললো না। এখন পাঁচ জনের পাতে কি দিই? তাই ভাবলাম, মানসিকটা শোধ ক'রে দিই, পাঁঠাটা বড় আছে, পঞ্চাশ জনের খুব হবে।'

শিবু বলিল, 'তা হবে।'

নিতাই বলিল, 'একটু তৎপর এসো তা হ'লে বাবাঠাকুর। এর পর আবার তৈরী কর্‌তে, সিদ্ধ হ'তে বেলা থাকবে না।'

নিতাই চলিয়া গেল। শিবু আপন-মনে হাসিয়া বলিল, 'চমৎকার মানসিক-শোধ!'

মানসিক-শোধ যেমনই হউক, নিতাই মণ্ডলের পাঁঠাটা খুব বড় ছিল। সুতরাং শিবু উৎসাহের সহিত স্নান করিতে ছুটিল।

৩

সেই দিন সন্ধ্যার সময় শিবুর বাহিরের ঘরে বেশ একটা মজলিস বসিয়াছিল। নিতাই মণ্ডলের মানসিকী পাঁঠাটার মাথা অন্ততঃ তিন সেরের কম হইবে না। সুতরাং তাহার সদ্ব্যবহারার্থ শিবু তিন চারি জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ঘরের ভিতর পাঁঠার মাংস পাক হইতেছিল। শিবু এক একবার আসিয়া তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া দিতেছিল, তার পর বাহিরে গিয়া, এত বড় পাঁঠাটা সে কেমন কৌশলের সহিত কাটিয়াছে, অনেকেই তাহাকে দাঁড়াইয়া কোপ করিতে বলিয়াছিল, কিন্তু সে বসিয়াই কত সহজে কলাগাছের মত নামাইয়া দিয়াছে, তাহাই গল্প করিয়া বন্ধুগণকে শুনাইতেছিল।

অমূল্য ঘোষ এক পাশে বসিয়া গাঁজা টিপিতেছিল। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা খুড়োঠাকুর!'

শিবু উত্তর দিল, 'কি রে?'

অমূল্য বলিল, 'তুমি যে এই পাঁঠাগুলো কাট্‌চো, এর পর এরাও তো তোমাকে কাট্‌বে?'

শিবু হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'হাঁ, আমাকে কাট্‌বে! কে বল্‌লে?'

অমূল্য বলিল, 'শাস্তরে বলচে; কেন শাস্তর দেখ নি?'

শিবু ঈষৎ রাগিয়া বলিল, 'না, আমি শাস্তর দেখি নি, আর তুই বেটা গয়লার ছেলে, বাঁক বইতে বইতে বড় শাস্তর দেখেছিস।'

অমূল্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'তা আমি শাস্তর না দেখি, শুনেছি তো। এই যে সে দিন মনসাতলায় যাত্রা হ'লো সুরথ রাজার দুর্গোৎসব। তাতে কি হ'লো?'

'কি হ'লো?'

'সুরথ রাজা লক্ষ বলি দিয়েছিল, সেই এক লক্ষ পাঁঠা এক লক্ষ খাঁড়া নিয়ে তাকে কাটতে এলো। তার পর রাজার ভগবতী সহায় ছিল, তাই না হয় বেঁচে গেল।'

তাচ্ছীল্যের সহিত শিবু বলিল, 'ও সব রচা কথা! যাত্রায় অমন বলে।'

অমূল্য বলিল, 'শুধু শুধুই কি বলতে পারে? বেদ পুরাণে না থাকলে বলবে কোথা থেকে?'

তর্কে হারিয়া শিবু বলিল, 'আচ্ছা, আমি পাঁঠা কাটি, আমাকে না হয় তারা কাটবে। কিন্তু যারা খায়, তাদের কি হবে?'

অমূল্য কলিকায় গাঁজা সাজাইতে সাজাইতে বলিল, 'কাটায় আর খাওয়ায় অনেক তফাৎ খুড়োঠাকুর, চোরাই মালের ভাগ লওয়া যায়, কিন্তু চুরী করা যায় না।'

সকলে হাসিয়া উঠিল। শিবু বলিল, 'ধরা পড়লে চোরের সঙ্গে মালের ভাগীদারকেও সাজা পেতে হবে, তা জানিস্?'

অমূল্য বলিল, 'তা হয়, কিন্তু চোরের চেয়ে কম সাজা হয়।'

পুনরায় একটা হাস্যরোল উত্থিত হইল। কলিকায় অগ্নিসংযোগ হইল; হাস্য হইতে বিরত হইয়া সকলে তাহার সৎকারে মনোনিবেশ করিল। অমূল্য গাহিল—

> "জগৎশুদ্ধ মায়ের ছেলে জেনেও তুমি তা জান না;
> কেমনে সন্তোষ করবে মাকে হত্যা ক'রে এক ছাগলছানা।
> মন তোমার কি ভ্রম ঘোচে না।"

গান ছাড়িয়া অমূল্য বলিল, 'আচ্ছা খুড়োঠাকুর, তোমার কি একটু দয়া মায়া হয় না? পাঁঠাগুলো ভ্যা ভ্যা ক'রে চেঁচাতে থাকে, তার উপর এক কোপ।'

সহাস্যে শিবু বলিল, 'তোদের খুব মায়া হয়, না?'

সাতকড়ি পাল বলিল, 'তা হয় দাঠাকুর, বড্ড মায়া হয়। আমি তো ছুটে পালিয়ে যাই।'

শিবু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'দুর পাগল, এতে কি মায়া করলে চলে? এ যে মায়ের বলি, ওদের পশুজন্ম উদ্ধার হ'য়ে যায়।'

অমূল্য বলিল, 'ডাকাতরাও না কি মানুষ মারবার সময় এই রকম কি একটা কথা বলে, "এস, তোমার দেহটা পাল্‌টে দিই"।'

শিবু তিরস্কার করিয়া বলিল, 'ডাকাতদের মানুষ মারার সঙ্গে আর বলি-দানের সঙ্গে বুঝি তুলনা? সে হ'লো খুন, আর এ হ'লো মায়ের ভোগ। পাঁঠাদের সৃষ্টি এই জন্যই। হয় নয়, বাচস্পতি মশায়কে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিস।'

কিন্তু তখন আর জিজ্ঞাসা করিতে যাইবার সময় ছিল না, মাংস প্রস্তুত হইয়াছিল; সুতরাং জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়টা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিয়া সকলে মাংসের সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল, এবং নির্ম্মমভাবে নিহত ছাগের মাংসটা যে সম্পূর্ণ মুখরোচক হইয়াছে, সকলে একবাক্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিতে লাগিল।

সে রাত্রে শিবু কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না, বিছানায় পড়িয়া অমূল্য ঘোষের কথাগুলা মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। মূর্খ অমূল্য বলে কি? দেবতার বলির জন্য পশুবধ নির্দ্দয়তা! যজ্ঞে বধ করিবার জন্যই ত পশুর সৃষ্টি। কলিতে যজ্ঞ নাই, দেবতার ভোগই সেই যজ্ঞ। যাহা দেবতা গ্রহণ করেন, তাহা কি অধর্ম্ম হইতে পারে? যাহাতে দেবতার তৃপ্তি, তাহার অনুষ্ঠান কি নিষ্ঠুরতা! কিন্তু সত্যই কি ছাগশোণিতে দেবতা তৃপ্ত হন? সত্যই কি তিনি ইহা গ্রহণ করেন? ভক্তির ভগবান্; ভক্তির সহিত দিলে বোধ হয় গ্রহণ করেন। কিন্তু কুটুম্বগণের ভোজনের উদ্দেশ্যে—তাহাদের জন্য পাতা পাতিয়া দেবতাকে পাঁঠা দিতে আসা, সে পাঁঠা কি দেবতা গ্রহণ করিতে পারেন? তাহাকে বধ করা কি অন্যায় বধ নয়? কে জানে, এখানে শাস্ত্র কি বলে? শিবু শাস্ত্র জানে না, কিন্তু তাহার মনটা যেন খুঁৎ-খুঁৎ করিতে লাগিল।

৪

বৎসরান্তে একবার করিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বারোয়ারী পূজা হয়। গ্রামের ইতর ভদ্র, ধনী নির্ধন, সকলের চাঁদায় পূজার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে; বিশ পঁচিশটা পাঁঠা পড়ে, চণ্ডীর গান হয়, গ্রামখানা যেন উৎসবে মাতিয়া উঠে। যাহার যাহা মানসিক থাকে, তাহা এই সময়েই দিবার জন্য সকলে প্রস্তুত

হয়। এই এক দিনের আয়ে শিবুর ছয় মাস সংসার চলে; পাঁঠা কাটিতে কাটিতে সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

এ বৎসরও বারোয়ারী পূজার আয়োজন চলিতেছিল। পূজার দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; ঘরে ঘরে চাঁদা আদায় হইতেছিল; গ্রামের মধ্যে উৎসবের সাড়া পড়িয়াছিল। চাঁদা আদায় ও পূজার অন্যান্য উদ্যোগের জন্য শিবুকেও খাটিতে হইতেছিল। এ জন্য সে দিন তাহার পূজা করিয়া ফিরিতে অনেকটা বেলা হইয়াছিল। সে গামছায় এক খুঁটে ভিজান চাল, অপর খুঁটে ফল-মূল বাঁধিয়া লইয়া বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং দীনুর মার ঘরের দিকে চাহিয়া ডাকিল, 'কালু!'

ডাকিয়া শিবু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিল, কিন্তু কালু আসিল না। তখন সে আরও একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'কেলো! আয়, আয়!'

কেলো আসিল না; শিবু ইহাতে যারপরনাই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কেলো যেখানেই থাকুক, তাহার পূজা করিয়া ফিরিবার সময় প্রত্যহ ঐ তেঁতুলতলায় শুইয়া সে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করে; তার পর তাহার প্রদত্ত এক মুঠা ভিজা চাল ও এক মুঠা ভিজা ছোলা, দুই চারিটা কলা মূলা খাইয়া তবে অন্য দিকে চরিতে যায়। কোনও দিনই ইহার ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু আজ সে গেল কোথায়? রৌদ্রতপ্ত পথের মাঝে দাঁড়াইয়া শিবু উচ্চকণ্ঠে বার বার 'কেলো আয়, কেলো আয়!' বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

তাহার ডাক শুনিয়া দীনুর মা বাহির হইয়া আসিল। শিবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ কেলো কোথায় গেল দীনুর মা?'

দীনুর মা বলিল, 'কেলো তো নাই বাবাঠাকুর।'

বিস্ময়জড়িতকণ্ঠে শিবু বলিয়া উঠিল, 'নাই!'

দীনুর মা বলিল, 'হাঁ বাবা, নাই। আজ তাকে বেচে ফেলেছি।'

গর্জ্জন করিয়া শিবু বলিল, 'বেচে ফেলেছিস্? কাকে বেচ্লি?'

দীনুর মা বলিল, 'বাস্পোত মশায় কিনে নিয়ে গেল। মায়ের কাছে তেনার ছেলের মানসিক আছে, তাই আড়াই টাকা দিয়ে নিয়ে গেল।'

শিবু স্তব্ধভাবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর একটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

শিবুর ইচ্ছা হইল, সে আড়াইটা টাকা ফেলিয়া দিয়া কেলোকে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু বাচস্পতি ফিরাইয়া দিবে কি? না হয় আড়াই টাকার স্থলে

তিন টাকা, চারি টাকা, পাঁচ টাকা লইবে। কিন্তু তাহাতেই বা কি হইবে? সে যখন ছাগ-জন্ম গ্রহণ করিয়াছে,তখন এক দিন না এক দিন এইরূপেই তাহার নিয়তি শেষ হইবে। ইহা ভিন্ন তাহার নিয়তিতে আর অন্য বিধান নাই। সুতরাং তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াই বা ফল কি? আর একটা পাঁঠার জন্য এতটা পাগলামী, লোকে শুনিলেই বা কি বলিবে? সে যে নিজের হাতে অসংখ্য পাঁঠাকে পশুজন্ম হইতে উদ্ধার করিয়া দিতেছে। তাহারা যে পদার্থ, কেলোও ত তাই। বিশেষ বাচস্পতি তাহাকে মায়ের নামে লইয়া গিয়াছেন। তাহাকে এখন ফিরাইয়া আনিতে গেলে কি দেবীর কোপে পড়িতে হইবে না? ছি ছি, সামান্য একটা পাঁঠার জন্য তাহার এ কি পাগলামী!

পাগলামী বলিয়া ভাবিলেও শিবুর মনটা কিন্তু সে দিন এমনই অপ্রসন্ন হইয়া রহিল যে, কিছুতেই তাহার মনে স্ফূর্ত্তি হইল না। সন্ধ্যার সময় সিদ্ধেশ্বরীর আরতি শেষ করিয়া আসিয়া সে যখন অন্ধকার চালাটীতে একাকী চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তখন অমূল্য ঘোষ আসিয়া প্রাতঃপ্রণাম করিয়া পাশে বসিল, এবং বারোয়ারীর আয়োজন সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'এবার শুনছি নাকি তিরিশ চল্লিশটা পাঁঠা আসবে?'

অন্যমনস্কভাবে শিবু উত্তর দিল, 'তা হবে।'

অমূল্য বলিল, 'কিন্তু এত পাঁঠা তুমি একা কাটতে পারবে খুড়োঠাকুর?'

অন্য দিন হইলে সে কত উৎসাহসহকারে এই প্রশ্নের উত্তর দিত, এবং সে যে একদমে এক শত ছাগের শিরশ্ছেদন করিতে পারে, সগর্ব্বে তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত। আজ কিন্তু নিতান্ত নিরুৎসাহভাবেই উত্তর করিল, 'কি জানি।'

অমূল্য বলিল, 'আচ্ছা খুড়োঠাকুর, যদি এক আধটা দু'কোপ হ'য়ে যায়?'

গভীর ঔদাস্যসহকারে শিবু বলিল, 'হয় হ'লো।'

অমূল্য বলিল, 'তা হ'লে ত তোমার দুর্নাম!'

বিরক্তির সহিত শিবু বলিল, 'তবে আর কি! নে, মাল তৈরী কর্।'

পাঁঠা কাটার গল্পে খুড়োঠাকুরের এই ঔদাস্য দেখিয়া অমূল্য অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত গঞ্জিকা-প্রস্তুত-করণে ব্যাপৃত হইল।

গাঁজার শেষ দম দিয়া অমূল্য উঠিয়া যাইবার সময় আপন-মনে মৃদুস্বরে গায়িতে গায়িতে গেল—

'জগৎগুদ্ধ মায়ের ছেলে জেনেও তুমি তা জান না;
কেমনে সন্তোষ করবে মাকে হত্যা করে এক ছাগলছানা।
মন তোমার কি ভ্রম ঘোচে না।'

শিবু চুপ করিয়া একা বসিয়া রহিল। অমূল্যর গানের প্রতিধ্বনিটা অন্ধকারের ভিতর দিয়া আসিয়া তাহার মনের উপর যেন আঘাত করিতে লাগিল—'জগৎশুদ্ধ মায়ের ছেলে'।

শিবুর এই মানসিক অবসাদটা কিন্তু স্থায়ী হইল না। সে যতই শুনিতে লাগিল, মিত্তিররা মোষের মত একটা পাঁঠা কিনে এনেছে, বারুইদের পাঁঠাটা ওজনে এক মনের কম হবে না, বাগেদের কালো পাঁঠাটার জন্য বোধ হয় একটা নূতন হাড়ীকাঠ তৈরী করতে হবে, ইত্যাদি, ততই একটা নবীন উৎসাহ আসিয়া শিবুর অবসাদ দূর করিয়া দিতে লাগিল, এবং এই সকল প্রকাণ্ডকায় ছাগকুল ছেদন করিয়া সে যে অখণ্ড গৌরব অর্জ্জন করিবে, তাহারই কাল্পনিক আনন্দে তাহার চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল।

৫

ধুমধামের সহিত দেবীর পূজা শেষ হইল। পূজক শিবু; সমারোহের পূজা। সুতরাং বাচস্পতি মহাশয় কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি বলিয়া দিতেছিলেন। পূজাশেষে বলিদানের পালা। পঁচিশটা পাঁঠা উপস্থিত হইয়াছে; তিনটা বারোয়ারীর পাঁঠা, অবশিষ্ট সব মানসিকী। প্রথমে বারোয়ারীর পাঁঠা তিনটা উৎসর্গ করা হইল। তার পর মানসিকী পাঁঠা উৎসর্গ। প্রথমেই বাচস্পতি মহাশয়ের মানসিকের পাঁঠা আসিল। তাহাকে দেখিয়াই শিবু শিহরিয়া উঠিল। তাহার মুখ হইতে অজ্ঞাতে উচ্চারিত হইল, 'কেলো!'

বাচস্পতি মহাশয় মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন, 'পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি—'

শিবু মন্ত্র পড়িবে কি, কেলো তখন আহ্লাদে কূর্দ্দন করিয়া তাহার বুকের ভিতর মাথাটা গুঁজিয়া দিয়াছে। শিবু হতবুদ্ধির ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বাচস্পতি মহাশয় পুনরায় মন্ত্রটা আবৃত্তি করিলেন। শিবু কিন্তু মন্ত্র পড়িল না; সে বাচস্পতির দিকে ফিরিয়া বলিল, 'বাচস্পতি মশায়, পাঁঠাটা বড্ড ছোট—'

বাধা দিয়া বাচস্পতি বলিলেন, 'হাঁ হাঁ ছোট, বড় কোথায় পাব, বল। বারোয়ারীর হিড়িকে দেশে কি আর পাঁঠা আছে?'

শিবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'কিন্তু বলির অযোগ্য —'

উগ্রস্বরে বাচস্পতি বলিলেন, 'ওহে বাপু, যোগ্য কি অযোগ্য, তোমার চেয়ে আমার বেশী জানা আছে। 'ন চ ত্রৈমাসিকান্ন্যূনং পশুং দত্ত্বাচ্ছিবাবলিং'— কাল এর বয়স তিন মাস উত্তীর্ণ হ'য়েছে। এখন মন্ত্র কটা ব'লে নাও।'

অগত্যা শিবু মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল। কিন্তু মন্ত্রগুলা ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না, তাহা জড়াইয়া যাইতে লাগিল।

তার পর মিত্তিরদের বড় পাঁঠাটা উৎসৃষ্ট হইবার জন্য আসিল। সেই প্রকাণ্ডকায় ছাগবীর আপনার বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গর্ব্বে শৃঙ্গ উন্নত করিয়া যখন শিবুর পাশে দাঁড়াইল, তখন শিবুর সুপ্ত জিঘাংসা আবার যেন জাগিয়া উঠিল। সে জোরে জোরে মন্ত্র পাঠ করিয়া, তাহাকে উৎসর্গ করিতে লাগিল।

বলির সকলই প্রস্তুত। উৎসৃষ্ট পাঁঠাগুলিকে পর পর আটচালার খুঁটীতে বাঁধা হইয়াছে; গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা বলিদান দেখিবার জন্য আটচালা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাদ্যকরগণ বাদ্যযন্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। শিবু সিন্দূরে ললাট চর্চ্চিত করিয়া, দেবীর চরণের বিল্বপত্র কানে গুঁজিয়া, খড়্গহস্তে যূপ-কাষ্ঠের নিকট আসিয়া বসিল। প্রথম পাঁঠাটিকে আনিয়া হাড়কাঠে ফেলা হইল। দুই তিন জনে পাঁঠাটাকে টানিয়া ধরিল। শিবু দৃঢ়মুষ্টিতে খড়্গ ধরিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল; ছাগশিশুর আর্ত্ত চীৎকারে, দর্শকমণ্ডলীর উল্লাসসূচক মা মা শব্দে দেবীমন্দির কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু ঘাতকের উদ্যত খড়্গ ছাগের স্কন্ধে পড়িল না; খাঁড়া তুলিয়া শিবু তীক্ষ্নদৃষ্টিতে মন্দিরমধ্যস্থা দেবীপ্রতিমার দিকে চাহিতেই রজ্জুবদ্ধ ভীতিকম্পিত কেলোর উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে খাঁড়াটা এক পাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ব্যস্তহস্তে যূপকাষ্ঠমধ্যস্থ পাঁঠার গলাটা মুক্ত করিয়া দিল। জনমণ্ডলী বিস্ময়ে নির্ব্বাক্!

বাচস্পতি রুদ্রগম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন, 'শিবু!'

শিবু রক্তদৃষ্টি উন্নমিত করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। বাচস্পতি বলিলেন, 'এ কি তোমার কাণ্ড!'

শিবু উচ্চকণ্ঠে বলিল, 'আমার কাণ্ড নয়, মায়ের কাণ্ড। ঐ দেখুন, ছেলেকে কাটতে দেখে মা কাঁদছে।'

জনমণ্ডলী শিহরিয়া উঠিল। বাচস্পতি উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'উন্মাদ! মা কাঁদেন কি? রুধিরপ্রিয়া মা রুধিরোৎসবের আয়োজন দেখে হাসছেন!'

শিবু একবার মন্দিরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়াই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'রাক্ষসী!'

পরক্ষণেই সে ভিড় ঠেলিয়া সে স্থান হইতে ছুটিয়া পলাইল। বাচস্পতি তাহাকে অর্বাচীন, উন্মাদ, পাষণ্ড প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়া কামারকে বলিদানের জন্য আদেশ দিলেন।

সন্ধ্যার পর অমূল্য আসিয়া বলিল, 'ও খুড়োঠাকুর, পাঁঠা কাটা ছেড়ে দিলে যে?'

শিবু বলিল, 'শুধু পাঁঠা কাটা নয়, যে ঠাকুর পাঁঠা খায়, তার পূজো পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলাম।'

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে অমূল্য বলিল, 'বল কি খুড়োঠাকুর, এত আয়—'

শিবু হাসিয়া বলিল, 'আয় হ'লে কি হবে অমূল্যচরণ, আয়ের চেয়ে যে ব্যয় অনেক বেশী। এখানেই যেন পাঁঠা বেচারীদের আইন আদালত নাই, কিন্তু ও পারে ত আছে। তখন কি হবে বাপ?'

অমূল্য বলিল, 'তখন শাস্তরের দোহাই দেবে।'

শিবু বলিল, 'ও সব শাস্তর টাস্তর বাচস্পতি বিদ্যানিধি মশায়দের জন্য, আমাদের মত গাঁজাখোরদের জন্য নয়।'

অমূল্য হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তুমি দেখছি সত্য সদ্য গোঁড়া বোষ্টমঠাকুর হ'য়ে পড়লে। এক দিনেই সব ছেড়ে দিলে?'

শিবু বলিল, 'সব ছাড়লেও গাঁজা ছাড়ছি না বাপু। এখন বড় ক'রে একটা ছিলিম তৈরী কর দেখি।'

অমূল্য স্ফূর্ত্তির সহিত ছিলিম তৈরী করিতে করিতে গলা ছাড়িয়া গান ধরিল—

'মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কি রে তোর বলিদানে,
জয়কালী জয়কালী ব'লে বলি দাও ছয় রিপুগণে।
মন তোর এত ভাবনা কেনে।'

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

# উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গত ১৭ই চৈত্র সায়াহ্নে 'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। উপেন্দ্রবাবুর সহিত 'সাহিত্যে'র সুনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ১২৯৬ সালে উপেন্দ্র বাবু ৩ নং বীডন স্কোয়ার হইতে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামক একখানি মাসিকপত্রের প্রচার করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র সম্পাদক ছিলেন। ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' প্রকাশিত হয়। শিবাপ্রসন্নবাবু চারি পাঁচ মাস 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। বোধ হয়, অগ্রহায়ণ মাসে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' আমার চোখে পড়ে, এবং আমি উপেনবাবুর সহিত পরিচিত হই। উপেন্দ্র-বাবুর অনুরোধে, এবং বর্ত্তমানে পাটনা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল, আমার অগ্রজতুল্য সুহৃৎ শ্রীযুত মথুরানাথ সিংহের প্রেরণায়, আমি 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র সম্পাদকের পদ গ্রহণ করি। আমার সহিত 'কল্পদ্রুমে'র কোনও আর্থিক সম্বন্ধ ছিল না। প্রথম বর্ষের 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নয় মাসে সমাপ্ত হয়। চৈত্র মাসে প্রথম খণ্ড শেষ করিয়া আমি বৈশাখ হইতে বর্ষ-গণনার ও নাম-পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করি, এবং 'কল্পদ্রুম' বর্জ্জন করিয়া 'সাহিত্য' নাম রাখি। কিন্তু ডাকঘরে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র নামে ষ্ট্যাম্পের টাকা জমা ছিল। এই জন্য প্রথম তিন মাস 'সাহিত্যে'র ললাটে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র নামও রাখিতে হইয়াছিল। ১২৯৭ সালেও উপেন্দ্র-বাবু 'সাহিত্যে'র স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ১২৯৭ সালের শেষভাগে উপেনবাবু 'সাহিত্যে'র স্বত্ব ও স্বামিত্ব ত্যাগ করেন। আমি ১২৯৮ সাল হইতে 'সাহিত্যে'র স্বত্বাধিকারী হই। আমাকে 'সাহিত্য' দিবার পর, বোধ হয়, ১২৯৮ সালে, উপেন্দ্রবাবু আবার 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র প্রচার করিয়াছিলেন। সে পর্য্যায়ে সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ব্যোমকেশ মুস্তোফী 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র সম্পাদক হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরে উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' বন্ধ করিয়া দেন।

উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্যে'র প্রথম প্রবর্ত্তক, এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহার ও তাহার সম্পাদকের হিতৈষী ও অনুরাগী ছিলেন। উপেন্দ্রবাবুর সূত্রে জড়াইয়া নিয়তি আমাকে 'সাহিত্যে'র সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল। ত্রিশ বৎসরের সম্বন্ধ মহাকালের ইঙ্গিতে কোথায় উড়িয়া গেল। উপেন্দ্রবাবু সেই ত্রিশ বৎসরের সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন করিয়া পর-পারে চলিয়া গেলেন। গত বৎসর কাগজের অভাবে 'সাহিত্য' বন্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। শত কার্য্যে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিয়াও উপেন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে'র জন্য কাগজের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। 'সাহিত্য' ও তাহার সম্পাদক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

উপেন্দ্রনাথের জীবন বৈচিত্র্যময়। তাহাতে যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা বাঙ্গালীর প্রণিধান-যোগ্য। আশা করি, তাঁহার জীবন-কাহিনী বাঙ্গালীর অগোচর থাকিবে না।

১৭ই চৈত্রের 'দৈনিক বসুমতী'তে সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ উপেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

'উপেন্দ্রনাথের জীবন বৈশিষ্ট্যময়। দারিদ্র্যের বিদ্যালয়ে উপেন্দ্রনাথ সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন—জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে তিনি উৎসাহে ও উদ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন—কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি সাফল্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় একক জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার ক্ষমতায় বাঙ্গালা দেশে আপনার যশ কালজয়ী করিয়া গিয়াছেন। বয়স ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদসন্ধানে একক ভারতবর্ষ-পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, এবং সে প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার সহায় ছিল—আত্মশক্তিতে প্রত্যয়, সম্বল ছিল—আপনার অসাধারণ উৎসাহ। সেই সহায়সম্পদ লইয়া তিনি পদে পদে সাফল্যলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর যেন আপনার নিয়তিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া—বাঙ্গালার সাহিত্য-প্রচারে ও সংবাদপত্রে নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়া তিনি পূর্ণব্রত অবস্থায় অপরিণত বয়সেই মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

'তিনি যখন সাহিত্য-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালার এত পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। তখন মধুসূদন "মহীর পদে মহানিদ্রাগত"—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাতপন মধ্যগগনে জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে—হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বঙ্গদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কেবল অরুণবিকাশসূচনা। তখনও "বটতলা" বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্যের দ্বারপাল; পরিষদের কল্পনা তখনও বিকশিত হয় নাই। সেই সময় উপেন্দ্রনাথ সাহিত্য-প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। তাহার পরিণতি 'বসুমতী'-সাহিত্য-মন্দিরে। সেই সাহিত্য-মন্দির হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থগুলি নামমাত্র মূল্যে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিরাজিত হইয়াছে; সেই মন্দির হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের গ্রন্থসমূহ, সঞ্জীবচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রভৃতি প্রচারিত হইয়াছে। এই সাহিত্য-প্রচারই বোধ হয় তাঁহার নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল। যে ভাব বাঙ্গালার নবীন সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমগ্র বঙ্গে ব্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল—সেই ভাব-মন্দাকিনী ধনবানেরই অধিগম্য ছিল। কিন্তু তাহাতে জাতির উদ্ধারসাধনের উপায় হইতেছিল না। উপেন্দ্রনাথ ভগীরথের মত সাধনা করিয়া সেই ভাব-মন্দাকিনী বঙ্গদেশে প্রবাহিত করিয়া বাঙ্গালীর উদ্ধারসাধন করিয়াছেন—বাঙ্গালার শ্মশানস্তূপে জীবনসঞ্চারের উপায় করিয়াছেন।

'পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্যদিগের মধ্যে এক এক জন—এক এক দিকে দিক্‌পাল; এক এক জন এক এক বিভাগে কাজ করিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের মত উপেন্দ্রনাথও এক বিভাগে কার্য্যের ভার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথকে অবলম্বন করিয়াই রামকৃষ্ণের দেবত্বের নিদর্শন শেষবার বিকশিত হইয়াছিল। বিবেকানন্দ গুরুর দেবত্বে সন্দেহ করিলে গুরুদেব বলিয়াছিলেন—"এখনও তোর মনে সন্দেহ!" আর যে দিন তিনি দেহরক্ষা করেন, সে দিন উপেন্দ্রনাথ যেরূপে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, সে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বটে। গুরু দেহত্যাগ করিয়াছেন—শিষ্যবর্গ তাঁহার শব জাহ্নবীপুলিনে শ্মশানে

আনিয়াছেন—পথে উপেন্দ্রনাথ বিষধর-দশন-দষ্ট হইলেন। তিনি নীলবর্ণ হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। সে অবস্থায় কেহ জীবনলাভ করে না। কিন্তু এরূপ বিনা চিকিৎসাতেই উপেন্দ্রনাথ জীবনলাভ করিলেন। সে জীবনের কাজ তখন কেবল আরম্ভ হইয়াছে—সে কাজ সম্পন্ন না করিলে তিনি ত যাইতে পারেন না! তাহার পর সে কাজ শেষ হইয়াছে—বাঙ্গালায় নব ভাবের প্রচার হইয়াছে। তাই বুঝি—আজ তাঁহার অতর্কিত তিরোভাব। ইহাতে শোকের কারণ যতই কেন থাকুক না, সান্ত্বনারও প্রচুর অবসর আছে।

'সেই ভাববিকাশের অন্যতম উপায়—"বসুমতী"। বিবেকানন্দ যখন তাঁহার "গুরুভাই" উপেন্দ্রনাথকে পুনঃ পুনঃ সংবাদপত্র-প্রচারে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, তখন উপেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"সাহস হয় না।" তিনি তখন সে কাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধনা করিতেছিলেন। তদবধি তিনি একাধিক পত্র প্রচার করেন—নানা কারণে সে সকলের স্থায়িত্ব সম্ভব হয় নাই। তাহার পর 'বসুমতী'র প্রচার। "বসুমতী" ২০ বৎসরকাল একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একই সাধনা করিয়া আসিয়াছে। সে ভাব—জাতীয় ভাব—দেশাত্মবোধের ভাব; সে সাধনা—মার সাধনা।

'যে "সাহিত্য" আজ সমাজপতির সম্পাদকত্বে সর্ব্বত্র সমাদৃত, উপেন্দ্রনাথ তাহার প্রবর্ত্তক। তখন বাঙ্গালায় উৎকৃষ্ট মাসিকপত্রের অভাব ছিল—বিশেষ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাহেতু তখনকার মাসিকপত্রগুলি সম্প্রদায়-বিশেষেরই রচনায় সমৃদ্ধ হইত—নূতন লেখকদিগের প্রতিভা সাহিত্যে প্রযুক্ত হইবার অবসর পাইত না। সেই অভাব দূর করিবার জন্য 'সাহিত্যে'র প্রচার,—উপেন্দ্রনাথ তাহার প্রবর্ত্তক, সমাজপতি তাহার সম্পাদক।

'সামাজিক জীবনে উপেন্দ্রনাথ বিনয়ী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয় হইলেই লোক তাঁহার অমায়িকতায় মুগ্ধ হইত, তাঁহার বিনয়ে আকৃষ্ট হইত। তিনি বহু লোকের উপকার করিয়াছিলেন, বহুলোক-প্রতিপালক ছিলেন। এক সময় "বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্র, 'হিতবাদী'র কাব্যবিশারদ ও "বসুমতী'র উপেন্দ্রনাথ বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রত্রয়ের পরিচালক ছিলেন, উপেন্দ্রনাথ তাঁহাদের শেষ। কাজেই তাঁহার আনন্দ ছিল, তিনি কখনও কাজ ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। মৃত্যুব্যাধিতে পক্ষকাল শয্যাগত থাকিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি কখনও এত দিন কাজ ছাড়িয়া থাকেন নাই।'

১৮ই চৈত্রের 'দৈনিক বসুমতী'তে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, উপেনের উদ্দেশে তাহাই আমার সামান্য পুষ্পাঞ্জলি। তাহাও উদ্ধৃত করিলাম :—

'বাঙ্গালায় বিখ্যাত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিতের ও "বসুমতী"র "উপেন মুখুয্যে"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত ও তদীয় ভক্তমণ্ডলীর চিরপ্রিয় উপেন ধরার পান্থশালায় 'বাসাংসি জীর্ণানি' পরিহার করিয়া আনন্দধামে চলিয়া গেলেন। কর্ম্মপ্রিয়, কর্ম্মসর্ব্বস্ব, কর্ম্মবীর উপেন্দ্রনাথ চিরজীবনব্যাপী কর্ম্মযজ্ঞে মানব-জীবনের সমগ্র উদ্যম উৎসাহ অধ্যবসায় আহুতি দিয়া কর্ম্মশেষে কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, রামকৃষ্ণ-চরণকমলের মধুমত্ত ভৃঙ্গ উপেন অন্তিমে তাঁহারই নামকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে সেই চিরবাঞ্ছিত পদারবিন্দে শান্তি ও নিবৃতি লাভ করিলেন।

'অনেক দিনের সম্বন্ধ, বহু দিনের বন্ধন, বহু কালের সুখ-দুঃখের স্মৃতি শ্মশানে ভস্ম হইয়া গেল। নৈমিত্তিক অপ্রীতির কালো মেঘের ছায়া আর কখনও নিত্য প্রীতির উজ্জ্বল আলোক আচ্ছন্ন—ম্লান করিতে পারিবে না। চিতার আলোকে অতীতের পটে উপেন্দ্রনাথের কর্ম্ম-জীবন আজ যে বর্ণে যে রেখায় ফুটিয়া উঠিল, তাহাই ত উপেন্দ্রনাথের প্রকৃত স্বরূপ!

'সেই শৈশবে সহায়হীন, নিঃস্ব, নিরুপায় ব্রাহ্মণ-বটু—সংসার-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত, তথাপি ধরণীর চিরন্তন জীবন-দ্বন্দ্বে নবোত্তমে সদা অগ্রসর ব্রাহ্মণকিশোর, আর এই বহু জনের আশ্রয়, বহুজনের অন্নদাতা, বিশাল অনুষ্ঠানের কর্ণধার, "বসুমতী"র উপেন্দ্রনাথ—বিবিধ বিচিত্র অধ্যায়ে সুসম্পূর্ণ জীবন-উপন্যাসের নায়ক উপেন্দ্রনাথ বাঙ্গালার কর্ম্মক্ষেত্রে "সাধিলেই সিদ্ধি"র আদর্শ রাখিয়া গেলেন।

'কৈশোরে উপেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রয়ে ধন্য হইয়াছিলেন। জ্ঞানে ও অজ্ঞানে সেই দেবতার পূজাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। 'তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনম্' যদি 'তদুপাসনম্' হয়, তাহা হইলে ভক্ত গৃহী উপেন্দ্রনাথ চিরজীবন তাঁহারই উপাসনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালীকে যে মুক্তিমন্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন, ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন রূপে তাহা সপ্রকাশ। উপেন্দ্রনাথের ঐহিক কর্ম্মেও সেই দেবতার আশীর্ব্বাদ পরিস্ফুট হইয়াছিল। ধর্ম্মজীবনের উপযোগী কর্ম্মজীবন গঠন করিবার জন্য স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ গৌড়ভূমির উর্ব্বরক্ষেত্রে যে লোকশিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ ললাটের স্বেদে সেই বীজে জলসেক করিয়াছেন। ইহাই ত "তদুপাসনম্"।

'উপেন্দ্রনাথের কর্ম্মসূচনা ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র; সাংসারিক প্রয়োজনে তাহার সৃষ্টি; ঐহিক ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার পুষ্টি; আপাতদৃষ্টিতে তাহা সংসারীর খেলাঘর বটে। কিন্তু এই ঐহিক কর্ম্মের সিকতা-বিস্তারের অন্তস্তলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যে প্রবাহিনী বহিয়া গিয়াছে, তাহা সেই রামকৃষ্ণ-ভক্তির মন্দাকিনী; বাঙ্গালা দেশে তাহা জ্ঞানের—ভাবের অমৃত বিতরণ করিয়াছে।

'উপেন্দ্রনাথ 'সঙ্কল্প' করিয়া, লক্ষ্য নির্ণয় করিয়া, নবভাবের নূতন উচ্ছ্বাস বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে বিতরণ করিবার জন্য বটতলার সেই 'ছোট' কেতাবের দোকানখানির পত্তন করিয়াছিলেন, তাহার পর সেই ক্ষুদ্র সূচনা 'বসুমতী'র বর্ত্তমান সাফল্যে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল, প্রতিষ্ঠাতার গুরুমন্ত্রপ্রচারে সহায় হইয়াছিল,—জীবনচরিতের পক্ষে এমন নির্দ্দেশ লোভনীয় হইতে পারে। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের জীবনে তদপেক্ষা শতগুণে বরেণ্য মহাসত্যের পরিচয় আছে। সে সত্য এই যে, উপেন্দ্রনাথ যে এক বিন্দু গুরুকৃপা লাভ করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যে তাঁহার ঐহিক অনুষ্ঠানেও জ্ঞানে অজ্ঞানে রামকৃষ্ণ-মন্ত্রের উপাসনা, রামকৃষ্ণ-পন্থীদিগের কর্ম্মব্রতে সাহচর্য্য সম্ভব হইয়াছিল। "কয়লাকী ময়লা তব্ ছোড়ে, যব্ আগ্ করে পরবেশ"। আজ চিতাগ্নির জ্বালাময়ী লেখায় ভক্তের এই মহাবাণীই দেদীপ্যমান দেখিতেছি। উপেন্দ্রনাথের ব্যবসায়, বাণিজ্য, বেসাতীর কয়লা সেই পুণ্য পাবকের স্পর্শে নির্ম্মল—ভক্তাববিস্তারের যন্ত্র হইয়াছিল।

'"বসুমতী"র এক জন প্রিন্টার ৺রাধিকাপ্রসাদ এক দিন বলিয়াছিল,—"এটা বসুমতী আফিস নয়, রামকৃষ্ণের সদাব্রত।" ইহা সত্য। উপেন্দ্রনাথ এই সদাব্রতের ভাণ্ডারী ছিলেন। এই সদাব্রত হইতে ভাঁড়ারী উপেন্দ্রনাথ লক্ষ লক্ষ পুঁথি প্রচার করিয়া বাঙ্গালীকে মনের খোরাক যোগাইয়াছেন; অনেক কাঙ্গালীকে ক্ষুধার অন্নও দান করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথ "ভোগী"র দুর্ভাগ্য ভোগ করিবার দুষ্কৃতি লইয়া আসেন নাই। তিনি রামকৃষ্ণমণ্ডলীর একটা 'হাত-বাক্স', লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়াছেন; আর পাত্রসাৎ করিয়াছেন! সদাব্রত নয়?

'"বসুমতী"র প্রবর্ত্তক হইতে নিম্ন পর্য্যায়ের সেবক পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই রামকৃষ্ণ ভক্ত। এ সমবায় আপনি গাড়িয়া উঠিয়াছে। উপেন্দ্রনাথ বাছিয়া বাছিয়া এই ভক্ত-মণ্ডলীর গঠন করেন নাই। তিনি গুরুর কৃপায় যাহার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাই রামকৃষ্ণ-পরিবারে পরিণত হইয়াছিল। উপেন্দ্রনাথ এই পরিবারের কেন্দ্র-শক্তি ছিলেন। তিনি গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লইলেন। নিশ্চয়ই তাঁহার গুরুর আশীর্ব্বাদে তাঁহার শক্তি তাঁহার পরিবারে অন্য আধার আশ্রয় করিবে। সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি ও কামনা করি,—তাঁহার শক্তি, তাঁহার ভাব, তাঁহার গুরুর আশীর্ব্বাদ তাঁহার প্রতিচ্ছবি পুত্রে ফুটিয়া উঠিবে;—উপেন্দ্র-কল্পিত এই রামকৃষ্ণ-পরিবারকে আরও সংহত করিবে; এক সূত্রে গাঁথিয়া এক-লক্ষ্যে ধরিয়া রাখিবে; এই আরম্ভ চরম পরিণতি লাভ করিবে।'

# মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। চৈত্র।—'চিত্রকর শ্রীমুহম্মদ আবদর রহমান চঘতাই মহাশয়ে'র 'প্রদীপ ও চন্দ্র' নামক ছবিখানির মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে প্রদীপও আছে, চন্দ্রও আছে। সে হিসাবে ইহা সার্থক। বাঙ্গালা সাহিত্যের 'কাব্যি'র মত 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'তেও মধ্যে মধ্যে এইরূপ অবোধ্য ও উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি দেখিতে পাই। ইহাও বিশেষত্ব বটে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিত্রকূটের যে টীকা লিখিয়াছেন, তাহার সূচনায় প্রকাশ,—'ছবির নাম "প্রদীপ ও চন্দ্র" হইতে বোঝা যায় না, চিত্রকর এই ছবির দ্বারা কি প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন।' কিন্তু দেখা যাইতেছে, বোঝা না গেলেও বোঝান যায়। চারু নিজে বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু জলের মত বুঝাইয়া দিয়াছেন। যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা চিত্রের অপেক্ষাও দুর্ব্বোধ। অতএব, ছবিখানি 'মিষ্টিক'। বাঙ্গালীর বুদ্ধির উপর এমন 'জুলুম' ও 'আর্টে'র এত অপমান ও লাঞ্ছনা বাঙ্গালা দেশেও অল্পই দেখিয়াছি। চারুর মতে, এই চিত্রের প্রতি-পাদ্য—'আমার জীবনের ধারা অনন্ত বহমান।' যে বাবাজী 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য'র ব্যাখ্যায় বলিয়াছিলেন,—'অজ্ঞান তিন মণ দশ সের', তাঁহাকে মনে পড়ে। 'জনৈক বিবেকানন্দ-ভক্ত হিন্দু'র 'স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদ' উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় 'শ্রী, শ্রীমতী' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—'ভারতভূমির কোথাও কেহ নিজের নামের আগে 'শ্রী' যোগ করে না, বলাতে না, লেখাতে না; কেবল আমরা করি। ওড়িশাতে কিছু কিছু আছে। কিন্তু

বঙ্গদেশে কুত্রাপি নাই, সেখানে গুরুজন ব্যতীত অন্যত্র নাই। কিন্তু বঙ্গের কি উৎকলের গ্রামে, বিশেষতঃ বিদ্যাহীন জনে 'শ্রী' বলে না। 'শ্রী' কি লেখাপড়া জানার চিহ্ন? আজি-কালি আমরা সবাই 'শ্রীযুক্ত', সবাই 'বাবু', তুমি আমি রাম শ্যাম যদু। দেশীয় রাজা থাকিলে হয় ত এই ধৃষ্টতার দণ্ডবিধান হইত। কারণ, রাজা শিষ্টাচারেরও রাজা। কবে হইতে শ্রীহীন বাঙ্গালা শ্রীযুক্ত হইয়াছে, কেহ গবেষণা করিলে সময় কাটিতে পারে। বোধ হয়, শত বৎসরের সেদিকে খুঁজিতে হইবে না।' শ্রীমতী শান্তা দেবীর 'ময়ূরপুচ্ছ' চলন-সই গল্প—মাসিকপত্রের পাদপূরণে সার্থক হইয়াছে। 'বিষ্ণুপুরী'র 'বিষ্ণুপুর' মনোজ্ঞ প্রবন্ধ। শ্রীমতী হেমলতা দেবী 'স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসে' অত্যন্ত সংক্ষেপে এই নারী-রত্নের মৃত্যুসংবাদ দিয়াছেন। শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী নামক এক জন নূতন কবি 'কী জানি কোন্ ভুলে' নামক একটী হেঁয়ালির গোড়ায় লিখিয়াছেন,—

'পক্ষীরাজ ঘোড়া আমি—কি জানি কোন্ ভুলে,
মায়ামরি! নেমে এলাম্ তোমার মায়া-কূলে।'

চাণক্য বলিয়াছেন,—'শতহস্তেন বাজিনম্।' অতএব, দূর হইতে নমস্কার করি। কিন্তু যে সাহিত্যে কবিরা জাতিস্মর, এবং ঘোড়ারাও মন্দুরা হইতে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়া কবিতা লিখিতেছে, সে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই সমুজ্জ্বল। ইটালিয়ান সার্কাসের যে পণী ঘোড়াটা ক্ষুর দিয়া অঙ্ক কষিত, উইলসনের সার্কাসের যে আরবী ঘোড়াটা ঢাকা বাক্স হইতে মুখ দিয়া হুকুমমত লাল বা নীল রুমাল বাহির করিয়া দিত, এই 'পক্ষীরাজ ঘোড়া' তাহাদিগকেও পরাজিত করিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? পক্ষীরাজ ঘোড়া যে গাঁজা খায়, কোনও ঠাকুরমাও এত দিন উপকথাগ্রাসী শিশুপালকে এ কথা বলেন নাই। 'প্রবাসী'র ললাটে বিধাতা সে রহস্য-নিবেদনের সৌভাগ্য লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাই তাহা আমাদের কর্ণগোচর হইল। পক্ষীরাজ ঘোড়াটি বলিতেছে,—'কী জানি কোন্ ঘুমের কলে লুটিয়ে পলেম ফুলে!' ফুলের উপর হইতে পক্ষীরাজ 'কোন পাখী হয়ে' 'কী কাঁদে যে কাহারি' 'পড়ে গেছেন', বাঙ্গালীকে চিহির ভাষায় তাহা প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু রূপচাঁদ পক্ষী নাই; ইঁট আছে, তাহার সে গৌরব নাই; বাগবাজার আছে, কিন্তু গাঁজার সে সৌরভ নাই। কে এই বিষম প্রশ্নের উত্তর দিবে? কল্পনার দৌড় 'পক্ষীরাজ'কেও হারাইয়া দিয়াছে, সম্পাদকের ভাবুকতার দৌড় এরো-প্লেনের অপেক্ষাও অধিক, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্যের 'সংস্কৃতশিক্ষা' প্রবন্ধে একটা সাংঘাতিক সার-সত্য দেখিলাম,—'ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে যে, সমস্ত ভাষাতেই অভিজ্ঞ পণ্ডিত না হইলে হয় না, তাহা নহে; ব্যাকরণ ও অভিধান বুঝিয়া লইতে পারিলেই কাজ চলে। সকলেই যে-কোনো ভাষারই সাহায্যে হউক, এইরূপেই কাজ করিয়া থাকেন।' বলা বাহুল্য, আমরা তাহা জানিতাম না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার অত্যন্ত নব্য। যাঁহারা ঝিকে আজাই বলিতেন, কদাচিৎ বৃক্ষে নামিতেন, ইনি তাঁহাদের কলঙ্কভঞ্জন করিয়াছেন। শ্রীসতীশচন্দ্র রায় 'চঞ্চল' নামক কবিতায় অনেক 'আবোল-তাবোল' বকিয়াছেন। বাঙ্গালার হাস্য-রস দুর্লভ; মাসিকের কবিতাগুলিতে আমরা দুধের সাধ ঘোলে মিটাই। আমরা হাসি বটে, কিন্তু আমাদিগকে হাসাইবার জন্য কবিরা কাঁদিয়া

ককাইয়া কত কষ্ট পান, তাহা কল্পনা করিলে, 'অপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্!' ই'হারা আখের মত নিজেরা কষ্টকল্পনার পিষ্ট ও ক্লিষ্ট হন, কিন্তু আমাদিগকে হাস্যরসের স্বাদ দেন! শ্রীকালীচন্দ্র ঘোষালের 'ভয়ার মেয়ে' বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক আর এক জন সংস্কারক কবি বৌ-কথা কও পাখীর 'হাঁক' শুনিয়া বঙ্গ-নারীকে কথা কহিতে বলিয়াছেন। দেড় চরণে চারিবার 'কথা কও' আছে। সুতরাং 'অনুরোধ'টা যে নিতান্ত 'উপরোধ' নহে, আন্তরিক, তাহা বুঝাইয়া বলিবার দরকার নাই। ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু—

> 'অয়ি মাতা, অয়ি কন্যা, ভগ্নী স্নেহময়ী,
> কথা কও, কথা কও; দীর্ণ ছিন্ন করি'
> দাসীত্বের অভিজ্ঞান ফেল দূর করি'
> অবগুণ্ঠ শির হ'তে;'

অমার্জ্জনীয়। মিথ্যা কথা। বাঙ্গালীর মা, বাঙ্গালীর মেয়ে, বাঙ্গালীর বোন দাসী নহেন। 'অবগুণ্ঠ' দাসীত্বের প্রমাণ নহে—বরং দাসত্বের নিদর্শন হইতে পারে। রচনায় প্রসাদগুণ আছে। পড়িয়া অর্থ বুঝিবার জন্য দৈবজ্ঞের বাড়ী ছুটিবার দরকার হয় না। তথাপি ইহা সত্যেন্দ্র-চষা কাব্যি-নন্দন 'প্রবাসী'তে স্থান পাইয়াছে। তাহার কারণ বোধ করি এই সংস্কারের ধূয়া। শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের 'নাবালকের চাপক' চারি চরণে সম্পূর্ণ শ্লোক। বক্তব্য বেশ; কিন্তু ভাষা চোখা নহে, 'এপিগ্রামাটিক্' নহে।

ভারতী। চৈত্র।—শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর অঙ্কিত 'মা' নামক ছবিখানিতে পরিপ্রেক্ষিত নাই বলিলেও চলে, কিন্তু বিষয়-গুণে মনোজ্ঞ। খোকার পরিকল্পনা সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। স্বভাবকে পদদলিত না করিয়াও 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি' তাহার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, এবং বিজয়ী হইতে পারে, তাহার অন্যতম প্রমাণ। শ্রীকালীপদ মিত্রের 'মধ্য-এসিয়ার বৌদ্ধ শিল্প-কলা' উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মাতৃগুপ্ত' সুখপাঠ্য সংক্ষিপ্ত রচনা। শ্রীসুনীলকুমার দের 'অলঙ্কারশাস্ত্র ও কাব্যের ধারণা' চৈত্রের 'ভারতী'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় কি কবিতার 'পাজি' হইয়া উঠিলেন? নিমে দত্ত কবিতার দুইটা গুণের আবিষ্কার করিয়াছিল,—মানে ও মজা। করুণানিধানের কবিতার 'মানে' নাই,—উচ্চশ্রেণীর 'কাব্যি'তে তাহার আশাও অবশ্য করা যায় না—কিন্তু 'মজা' আছে। সে 'মজা' এই 'কাব্যি'র আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত খণ্ডে ও অখণ্ডে পরিব্যাপ্ত। শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায় 'সুসময়' নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে ভ্যাংচাইয়া সুখী হইয়া থাকিবেন, কিন্তু আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অনুকরণ'-স্মরণে বাধ্য হইয়াছি। শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবীর 'বরণে' বৈচিত্র্য আছে।

ভাণ্ডার। ফাল্গুন।—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'কৃষকের দুঃখে' গ্রাম্য জীবনের ছবি বেশ ফুটিয়াছে। 'নানা কথা' বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। 'সমবায়-ক্রয় ও বিক্রয়' সুলেখিত ও

উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। 'অনুতাপ' নামক গল্পটি এবার 'ভাণ্ডারে'র অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা উদ্দেশ্যমূলক গল্প,—টলষ্টয়ের গল্প অবলম্বনে লিখিত। 'ভাণ্ডার' স্বীয় লক্ষ্যের অনুযায়ী গল্প প্রকাশ করিলে, 'কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে' সার্থক হইতে পারে। ক্ষুদ্র 'ভাণ্ডারে' অনুবাদের স্থান কোথায়?

প্রতিভা। ফাল্গুন—শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের 'মূর্খের কথা' উল্লেখযোগ্য। প্রসাধনে প্রবন্ধটি আরও উৎকর্ষলাভ করিত। লেখক ইচ্ছা করিলে, এবং গুছাইয়া বলিলে, সংক্ষিপ্ত হইতে পারিত। অনাবশ্যক বিস্তৃতি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'দোল' পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। ইহা কি কবিতা? জীবেন্দ্র ত অনেক চাপিয়াছেন, এই কান', খোঁড়া, কুঁজো কবিতাটিকে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, ছাপিয়া দিলেন? 'পিচকারী মোর নয়ন দুটি, হৃদয় আবীর আন্‌লো লুটি' কি মাইকেল, হেম, নবীন, রবির দেশে শোভা পায়, না সহ্য হয়? শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থের 'সুবর্ণগ্রামে' কবিত্বও নাই; 'কাব্যি'ও নাই। তাঁহার কবিত্বের অনুসরণে কবিত্ব-প্রকাশ যদি অমার্জ্জনীয় না হয়, তাহা হইলে বলা যায়, কবি একবারে কাঁচা কষো কবিতা হৃদয়-গাছ হইতে পাড়িয়া দিয়াছেন। তাহাও খাঁড়ার ফলের মত—মানুষের অভক্ষ্য। শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'নব-পরমাণুবাদ' সুলিখিত ও সারগর্ভ নিবন্ধ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 'উমাপরিণয়' নামক একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 'অভাব' নামক কবিতায় আরম্ভ করিয়াছেন,—'প্রাণে আজ বুঝিতেছি দারুণ অভাব!' আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিয়া সবিনয়ে বলি, এই অভাবটা যদি তাঁহার প্রাণের পরিবর্ত্তে মস্তকে বর্ত্তিত! তাহা হইলে 'প্রতিভা'র দুই পৃষ্ঠা কাপীর অভাব হইত বটে, কিন্তু আর কোনও ক্ষতি হইত না। কবিও 'দারুণ অভাবে'র তাড়নায় কবিতা লিখিতেন না, এবং সে কবিতা কবিত্বের 'অভাবে' এতটা ক্লিষ্ট হইত না। দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক নব্য কবি জগতের সকল অভাব অনুভব করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজের যে একটা অত্যন্ত অপরিহার্য্য জিনিসের অভাব আছে, তাহা আদৌ অনুভব করেন না। যেদিন তাঁহারা এই অভাবটি অনুভব করিতে পারিবেন, সে শুভ-দিন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্নের 'বেদবিদ্যা' পাণ্ডিত্য-পূর্ণ রচনা।

---

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

---

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব উদ্দীপিত করিবার জন্য উপনয়ন-সংস্কারের পর ব্রাহ্মণ-সন্তানকে স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান করিবার জন্য—

পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্লাবিত—পাশ্চাত্য-মোহে মুগ্ধ হিন্দুকে—স্বধর্ম্মে আস্থাবান—স্বধর্ম্মসাধনে নিয়োজিত করিবার জন্য—বিশুদ্ধ নির্ভুল পকেট সংস্করণ—

# ব্রাহ্মণ

সামবেদীয়-ঋগ্বেদীয়—যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাবিধি—গায়ত্রীর শাপোদ্ধার—নিত্য-পূজা—পঞ্চ-দেব দেবীর নিত্যপূজাবিধি—সন্ধ্যার স্থূলমর্ম্ম।

—নির্ভুল বেদ-মন্ত্রের—

নিম্নে অন্বয়—তৎপরে টিপ্পনীযুক্ত সরল প্রাঞ্জল বাঙ্গালা অনুবাদ—সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি। সন্ধ্যা-রহস্য—সন্ধ্যা-মর্ম্ম—ত্রিবেদীয় সন্ধ্যার স্থূল ব্যাখ্যা-বিবৃতি! ইহার উপর—দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ—ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের চমৎকার নির্ভুল সফল ধ্যানে গঠিত মূর্ত্তি—প্রত্যক্ষ দেখুন:—

## ব্রাহ্মণী-বৈষ্ণবী-রুদ্রাণীর চিত্র

### ত্রিসন্ধ্যার ত্রিমূর্ত্তি, ধ্যানের ছবি !!

ত্রিবর্ণরঞ্জিত—ভক্তি মাধুরীমণ্ডিত—ভক্তের আরাধ্য মূর্ত্তি। মোটা কাগজে নির্ভুল ছাপা—সচিত্র পকেট সাইজ, বাঁধাই সুন্দর সংস্করণ, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-কুমারের হস্তে দিবার জন্য—মূল্য মাত্র ৷৹ আট আনা।

---

প্রথিতনামা ঔপন্যাসিক শক্তিশালী সুলেখক

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

## নাগপাশ।

নাগপাশ—নূতন চরিত্র-চিত্রে নূতন ধরণের সামাজিক উপন্যাস। পুরাতন বিষয়ের—পুরাতন বঙ্গসমাজের সহিত নব্য-সমাজের সংঘর্ষণ দেখানই এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। পল্লীচিত্র ও সহর-চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া পল্লীবধূ ও সহরে সহবৎ-প্রাপ্ত রমণীর বৈচিত্র্য কি? তাহার নিখুঁত ফটো নাগপাশে দেখিবেন।—সামাজিক ও সাংসারিক নাগপাশে আমরা চিরবদ্ধ, আবার তাহার উপর উপসর্গ প্রথম যৌবনে—প্রেমের নাগপাশ।

এ্যান্টিকে ছাপা সুন্দর বাঁধা মূল্য ১৷৹ টাকা।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির,—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

---

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

"বাঙ্গালা ভাষার অভিধান"কার

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবুর তিনখানি পুস্তক—

যে গ্রন্থে বাঙ্গালী আত্মশক্তির পরিচয় পাইবেন, যাহা পাঠ করিলে বাঙ্গালীর আত্মসম্ভ্রম জাগিবে, এবং যাহা বাঙ্গালীর প্রতি জগদ্বাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে, সেই সর্ব্বজন-সমাদৃত ও সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত, বহু হাফটোন চিত্র সংবলিত সুশোভন বৃহৎ গ্রন্থ

১। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—মূল্য ৩৲ টাকা।

বালক-বালিকাদের সুদৃশ্য উপহার পুস্তক। একাধারে আনন্দ ও জ্ঞানলাভের অপূর্ব্ব সুযোগ। ছেলেরা পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠিতে চাহিবে না।

২। জন্তুদের বন্ধু নন্তুবাবু ও

শ্বেত পরীর গল্প—মূল্য ॥০ আনা

( ১২ খানি মজার মজার ছবি, ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে ছাপা, শোভন মলাট )

৩। বাঘ ভালুকের গল্প—মূল্য ৵০ আনা

( ৮ খানি লাইন ব্লক ছবি )

প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫০ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট ও ১১ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

# আগামী বৎসর 'সাহিত্যে'

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক

শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ,

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক

শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,

বসুমতী-সম্পাদক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক

শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

রচিত

উপন্যাস,

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর বড় গল্প,

ছোট গল্পে সিদ্ধহস্ত

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার,

শ্রীযুত দীনেন্দ্রকুমার রায়,

শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ,

শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ও

শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতির

ছোট গল্প

প্রকাশিত হইবে।

নব বর্ষের নূতন আয়োজন!

---

## [illegible] রবীন্দ্রনাথ

## 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"তখন বঙ্গ সাহিত্যের যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত, আমাদের সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।

"পূর্ব্বে কি ছিল, এবং পরে কি পাইলাম, তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলান কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! 'বঙ্গদর্শন' যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ'। এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।"—রবীন্দ্রনাথ।

### 'বঙ্গদর্শনে'র প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় আছে!

"এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কি যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।"

### সেই অনুমানের একমাত্র উপায়—'বঙ্গদর্শন'।

"বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহার পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চ নীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরমালা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষার-কিরীট চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে! বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে, একবার সেইটী নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।"—রবীন্দ্রনাথ।

### 'বঙ্গদর্শন'ই বঙ্গসাহিত্যের সেই তুষারকিরীট!

"রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।"—রবীন্দ্রনাথ।

### 'বঙ্গদর্শনে'ই নব-বঙ্গসাহিত্য-গঠনের সূচনা ও বিকাশ!

---

২।১, রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

৩।এ, রাধাপ্রসাদ লেন, (সুকীয়া ষ্ট্রীট) কলিকাতা, মণিকা প্রেসে

শ্রীহরিচরণ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# আঙ্গুলগুলি

১

৫ একটী বোতল কুন্তলীন এ উভয়েই যখন আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্বে আছে তখন আপনার বিবর্ণ ও খর্ব্ব কেশরাশি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ও আগুলফ-লম্বিত না হইবার কারণ দেখা যায় না। আপনি কিছুদিন নিয়মিতরূপে কেশে কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া দর্পণে আপনার কেশ কলাপের প্রতিবিম্ব দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, আপনার পূর্ব্বেকার সেই পাতলা শ্রীহীন কেশগুলি, দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর নব-বর্ষার ধারা-পাতে পরিপুষ্ট তৃণদলের ন্যায়, নবজীবনের হিল্লোলে বর্দ্ধিত, সম্পদশ্রী ও প্রাচুর্য্যলাভ করিয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। তখন আপনার মনে এই আক্ষেপ হইবে যে মনোহর সৌরভপূর্ণ ও কেশবর্দ্ধক যে

# কুন্তলীন

সৌখীন ও শিক্ষিত সমাজে এত অধিক সমাদর লাভ করিয়াছে, বহুদিন পূর্ব্ব হইতে তাহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন নাই কেন? আপনি একটীবার মাত্র কুন্তলীন ব্যবহার করিলে, অন্য কোনও তৈলই আর আপনার মনে ধরিবে না।

সুবাসিত—১৵০, পদ্মগন্ধ—২৲, গোলাপগন্ধ—২॥০, জুঁইগন্ধ—২॥০,
লোটাসগন্ধ ২॥০, ভায়োলেটগন্ধ—৩৲ বোকেগন্ধ—৩

## উপহারের উপযোগী অন্যান্য সুগন্ধি-দ্রব্য।

### মিল্ক অফ্ রোজ

এই গোলাপগন্ধযুক্ত দ্রব্য ব্যবহারে, মুখের সকল প্রকার কর্কশ চিহ্ন, ব্রণ, ক্ষত ইত্যাদির দাগ মিলাইয়া গিয়া মুখের বর্ণ শুভ্র, পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইয়া মুখের লাবণ্য ও কান্তি শতগুণে বৃদ্ধি করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা।

### টয়লেট পাউডার

এই টয়লেট পাউডার, অতীব সূক্ষ্ম ও কোমল এবং শিশুদিগের কোমল ত্বকেও অসঙ্কোচে ব্যবহার করা যায়। সৌরভে অতুলনীয়, এবং ব্যবহারে মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য ও কোমলতা শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। মূল্য প্রতি কৌটা ।৵০ আনা।

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্,  ৬২।১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট,

টেলিফোন—১০৮১। টেলিগ্রাম—দেলখোস।

---

---

# হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আশ্চর্য্য ফলে জগৎ মুগ্ধ, কিন্তু সেই হোমিও প্যাথিক চিকিৎসায় অকৃতকার্য্য হইয়া চিকিৎসককে চিকিৎসা ব্যবসায় ত্যাগ করিতে হইয়াছে ও অনর্থক রোগীকে কষ্ট পাইতে, এমন কি, অকালমৃত্যু ঘটিতেও দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ অবিশুদ্ধ ও কৃত্রিম সস্তার ঔষধ। পীড়া কঠিন অবস্থায় ঔষধের পরীক্ষা, সেই পরীক্ষায় আমাদিগের ঔষধ চিরকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, এবং ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা পাইয়া আসিতেছে। আমরা অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করি। আমাদিগের ঔষধের মূল্যের সাধারণ হারঃ—

মাদার টিংচার বা মূল আরক—১ ড্রাম ।৵০ দুই ড্রাম ॥৵০; ক্রুড্ বা মূল চূর্ণ—১ ড্রাম ৸০, দুই ড্রাম ১।০; ১ হইতে ১২ ক্রম বা ডাইলিউসন—১ ড্রাম ।০, ২ ড্রাম ।৵০; তদূর্দ্ধ ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥০; তদূর্দ্ধ ১০০ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ॥০, ২ ড্রাম ৸০; তদূর্দ্ধ ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০; তদূর্দ্ধ ৫০০ ক্রম অর্দ্ধ ড্রাম ॥৵০, ১ ড্রাম ১।০, দুই ড্রাম ২৲; তদূর্দ্ধ ১০০০ অর্দ্ধ ড্রাম ১।০, ১ ড্রাম ২॥০; ২ ড্রাম ৪৲; C. M. অর্দ্ধ ড্রাম ২৲; ১ ড্রাম ৪৲; ২ ড্রাম ৬৲। ১× হইতে ৬× বিচূর্ণ ১ ড্রাম ॥০; দুই ড্রাম ৸০; ১২× পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ৸০; ২ ড্রাম ১।০। ইহা ভিন্ন অনেক মূল্যবান ঔষধ আছে, তাহার মূল্য ও নিম্নক্রমের মূল্য পৃথক্ হারে লওয়া হয়। এককালীন নগদ ১০৲ টাকার ঔষধ লইলে শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। ঔষধ-ব্যবসায়ীরা, যাঁহারা অধিক টাকার ঔষধ লইবেন, তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে কমিশন দেওয়া হয়। এসিডাদির জন্য কাঁচের ছিপিযুক্ত বা গাটা-পার্চা শিশি আবশ্যক হইলে তাহার পৃথক্ মূল্য লওয়া হয়। হোমিওপ্যাথিক পুস্তক, শিশি, কর্ক, সুগার অব মিল্ক, গ্লবিউল, পিলিউল, ছুরী, কাঁচি ইত্যাদি যন্ত্র, ষ্টেথোসকোপ, থার্ম্মমিটার, হাইপোডার্ম্মিক সিরিঞ্জ, চশমা—সকল দ্রব্য যথামূল্যে বিক্রয় হয়।

পত্র পাইলে বিনামূল্যে মূল্যনিরূপণ পুস্তক পাঠান হয়।

## লাহিড়ী এণ্ড কোং।

**প্রধান ঔষধালয়ঃ—৩৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।**

---

**বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।**

# নূতন পুরাতন মাসিকপত্র

সকল প্রকার মাসিক পত্রিকা, বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক ও নাটক নভেল ইত্যাদি এইখানে পাওয়া যায়; ভি, পি, ডাকে অর্ডার পাঠাইয়া থাকি। চামড়ার হাফ-বাইণ্ডিং "ভারতবর্ষ" প্রথম বর্ষ হইতে সপ্তম বর্ষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ —প্রত্যেক বর্ষ দশ টাকা, "সাহিত্য", দ্বিতীয় বর্ষ, ১২৯৮ হইতে ২৯শ বর্ষ ১৩২৬ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ—প্রত্যেক বর্ষ ৩৲ তিন টাকা।

**খলিল আহম্মদ এণ্ড সন্স,**

বুকসেলার্স এণ্ড পবলিশার্স।

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

---

# গুপ্ত-উপন্যাস।

[ শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ-সঙ্কলিত ]

নূতন প্রকাশিত। অতি সুন্দর! বুঝি এমনটী এই প্রথম! কিংবদন্তী এই—দিল্লীর দেওয়ানী-খাসে বসিয়া এক জন বাদশাহ এক সময় এক উপন্যাস-বক্তার মুখে কতিপয় গল্প শুনিয়া অনাবিল আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন। সেই সকল গল্পই ইহাতে গ্রথিত। মিঠা গল্প; মিঠা ভাষা। ইহা পাঠে চির নীরস হৃদয়ও সরস হইয়া উঠে, চিরকঠোর চিরগম্ভীর মুখেও হাসির রেখা ফোটে। গ্রন্থ প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠা; ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অতি সুন্দর। মূল্য—২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা, ৫নং রামধন মিত্রের লেন, গ্রন্থকারের নিকট।

---

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

---

২।১, রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
৩।এ, রাধাপ্রসাদ লেন, (হুকীয়া ষ্ট্রীট) কলিকাতা, মণিকা প্রেসে
শ্রীহরিচরণ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# সুগন্ধ দ্রব্য।

## মৃগনাভী ল্যাভেণ্ডার।

বহুমূল্য মৃগনাভির সংযোগে প্রস্তুত এই ল্যাভেণ্ডার সাধারণ ল্যাভেণ্ডার হইতে অনেক অধিক পরিমাণে মিষ্ট ও আশ্চর্য্যজনক দীর্ঘকাল স্থায়ী। মূল্য —২৲ টাকা। এম্বার ল্যাভেণ্ডার—২৲

## ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার।

এই ল্যাভেণ্ডার সুমধুর সৌরভে বহুমূল্য বিদেশী ল্যাভেণ্ডারের সমকক্ষ। একবার পরীক্ষা করুন। মূল্য—প্রতি বোতল ৸৹ ও ১৷৹।

## অ-ডি-কলোন।

বিখ্যাত জার্ম্মাণ অ-ডি-কলোন প্রস্তুতকারকের প্রণালী অনুসারে এই অ-ডি-কলোন প্রস্তুত। এই অ-ডি-কলোনের গন্ধ অতি মিষ্ট এবং মনোহর। মূল্য—৸৹ ৷৹ ও ৸৹ আনা।

## আতরিন।

ইহা স্পিরিট-বর্জ্জিত খাঁটি ফুলের আতর। এক শিশি মাত্র আতরিনে ত্রিশ চল্লিশ শিশি এসেন্সের কাজ করে।

সুদৃশ্য পিতলের কেশে, গোলাপ, জুই, লিলি, ভায়োলেট, অপরাজিতা ও কুন্দকুসুম—প্রতি শিশি ১৷৹। আতরিন খেলথোস মূল্য—১৷৹।

সুদৃশ্য কার্ড-বোর্ড বাক্সে,—পার্শিয়ানরোজ, বেলা, লিলি, বকুল, খস্ ও হেনা। প্রতি শিশি ৸৴৹ আনা।

ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার, **এইচ বস** ৬৪ নং বৌবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন—১০৮১। টেলিগ্রাম—

---

---

---

# নবপ্রকাশিত উপন্যাস-কোহিনুররাজি !!!

## প্রিয়জনরঞ্জন চমৎকার বাঁধাই—শোভন সংস্করণ !!

বসুমতী-সম্পাদক হেমেন্দ্র বাবুর

## নাগপাশ।

নূতন চরিত্রচিত্রে নূতন ধরণের সামাজিক চিত্র! পল্লীচিত্র সহরচিত্রের পাশাপাশি চিত্র! পল্লীবধূ ও সহরে সহবৎপ্রাপ্ত শিক্ষিত রমণীর বিচিত্রতার নিখুঁত ফটো। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

উপন্যাস-সম্রাট দামোদর বাবুর

## শম্ভুরাম।

রাজনৈতিক ডাকাত সর্দ্দার—শম্ভুরাম। প্রবলের অত্যাচার, রমণীর সতীত্ব, দুর্ব্বলের সেবা, আশ্রিতের রক্ষণ, অধর্ম্মের উচ্ছেদ, ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য ডাকাত সর্দ্দার হইয়াও দেবতা। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

জার্ম্মাণীর সেই দুর্দ্ধর্ষ—কাইসার-রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিতসম

## ক্রাউন প্রিন্স।

সেই ক্রাউন প্রিন্স—যিনি যে দিকে গিয়াছেন—যে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সঞ্চালন করিয়াছেন—তাহাই মহাশ্মশানের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। সেই কলির সাক্ষাৎ রণদেবতা—এণ্টোয়ার্প-নামুর-বিধ্বংসী—ক্রাউন প্রিন্সের জীবনচরিত—উপন্যাসের মত মনোহর। মূল্য ৸০ বার আনা।

জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য স্থাপয়িতা—

## বিসমার্ক।

যে মনীষীর অত্যদ্ভুত বুদ্ধি ও চাতুর্য্য প্রভাবে—পলিসি ও পলিটিক্স চাল-নৈপুণ্যে আজ জার্ম্মাণী সর্ব্ব বিষয়ে অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়া ক্ষাত্রশক্তির স্পর্দ্ধায় আত্মনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেই বিসমার্কের জীবনী ও জার্ম্মাণীর উন্নতির ইতিহাস। মূল্য ৸০ বার আনা।

য়ুরোপ-সমাদৃত হেমেন্দ্র বাবুর

## হৃদয়-শ্মশান।

সামান্য ভুলের প্রভাবে সন্দেহের দংশনে প্রেম-প্রস্রবণ হৃদয় কিরূপে শ্মশানে পরিণত হয়—আত্মত্যাগের মাহাত্ম্যে সেই শ্মশানে কিরূপে দেশ-মাতৃকার মন্দির গড়িয়া উঠে, দেখুন। মূল্য ॥০ আট আনা।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির,—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

# সুদাস।

৩

৭।১৮ সূক্তের ৭ম, ১৩শ ও ১৫শ ঋকে তৃৎসু নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) সায়নাচার্য্য ৭ম ও ১৫শ ঋকের ব্যাখ্যায় তৃৎসুদিগকে হিংসক, দুষ্টমিত্র বলিয়াছেন। কিন্তু ১৩শ ঋকে সেরূপ অর্থ হইতেই পারে না। কারণ, তথায় আছে,—'ইন্দ্র ইহাদের দৃঢ় সপ্তপুরী বিদারণ করিয়াছিলেন। অনুর পুত্রের

(১) ৭।১৮ সূক্তের আবশ্যক ঋক্‌গুলি উদ্ধার করা গিয়াছে। পাঠকগণ নিম্নে এই ঋকগুলি দেখিতে পাইবেন।

পুরোড়া। ইৎ। তুর্বশঃ। যক্ষুঃ। আসীৎ। রায়ে। মৎস্যাসঃ। নিশিতাঃ। অপীব।

শ্রুষ্টিং। চক্রুঃ। ভৃগবঃ। দ্রুহ্যবঃ। চ। সখা। সখায়ং। অতরৎ। বিষূচোঃ॥—৭।১৮।৬

যজ্ঞকুশল তুর্বশ ধনলাভের নিমিত্ত (জলে) দলবদ্ধ মৎস্য সকলের (গমনের) মত অগ্রগামী হইয়াছিল। ভৃগু ও দ্রুহ্যুগণ শীঘ্র পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল। সখা (ইন্দ্র) সখা (সুদাসকে) নানা দিকের (আক্রমণ হইতে) রক্ষা করিয়াছিলেন।

আ। পক্‌থাসঃ। ভলানসঃ। ভনন্ত। আ। অলিনাসঃ। বিষাণিনঃ। শিবাসঃ।

আ। যঃ। অনয়ৎ। সধমাঃ। আর্য্যস্য। গব্যা। তৃৎসুভ্যঃ। অজগন্। যুধা। নৄন্॥—৭।১৮।৭

সুন্দর নাসিকা (বা ভদ্র-মুখ-যুক্ত) পক্‌থগণ, অলিনগণ, বিষাণযুক্তগণ ও শিবগণ শব্দ করিতে করিতে আসিয়াছিল। যে (ইন্দ্র) সোমপানে মত্ত হইয়া আর্য্য (সুদাসের) গো সকল আনিয়াছেন; যুদ্ধ দ্বারা তিনি নরদিগকে (অর্থাৎ আর্য্যশত্রুদিগকে) তৃৎসুদিগের নিমিত্ত জয় করিয়াছিলেন।

[এই ঋকে সায়ন তৃৎসুভ্যো হিংসকেভ্যঃ (হিংসকদিগের হইতে) অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু বসিষ্ঠ ঋষি তৃৎসুদিগের পুরোহিত ছিলেন। তাহারা সুদাসের লোক, পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে। অতএব সায়নের অর্থ গ্রহণ করা যায় না। তৃৎসুভ্যঃ অর্থে তৃৎসুদিগের নিমিত্ত।]

দুঃ আধ্যঃ। অদিতিং। সেবয়ন্তঃ। অচেতসঃ। বি। জগৃভ্রে। পরুষ্ণীম্।

মহ্না। অবিব্যক্। পৃথিবীম্। পত্যমানঃ। পশুঃ। কবিঃ। অশয়ৎ। চায়মানঃ॥—৭।১৮।৮

দুষ্টমতি, অজ্ঞানগণ অদিতি পরুষ্ণীর (কূলভেদ করিয়া) জল ছাড়িয়া দিয়াছিল। (নদী) মহিমা দ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। পলায়মান চয়মানের পুত্র কবি পশুর মত শয়ন করিয়াছিল।

[সায়ন পত্যমানঃ অর্থে পাল্যমানঃ পশুঃ যাগে সংজ্ঞপ্ত পশুরিব করেন।]

ঈয়ুঃ। অর্থং। ন। ন্যর্থং। পরুষ্ণীম্। আশুঃ। চন। ইৎ। অভিপিত্বম্। জগাম।

সুদাসে। ইন্দ্রঃ। সুতুকান্। অমিত্রান্। অরন্ধয়ৎ। মানুষে। বধ্রিবাচঃ॥—৭।১৮।৯

গৃহ তৃৎসুকে ভাগ করিয়া দিলেন।' তৃৎসুগণ যদি দুষ্টমিত্র হইবে, তবে অসুর পুরী জয় করিয়া ইন্দ্র কেন তৃৎসুকে ভাগ করিয়া দিবেন? আমরা মনে করি, সায়নাচার্য্য এই স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

অর্থসদৃশ পরুষ্ণীকে (শত্রুগণ) অনর্থে (অর্থাৎ নিম্নদেশে) লইয়া গিয়াছিল। সেও (অর্থাৎ পরুষ্ণীও) আশুগামী (অশ্ব) সদৃশ সেই দেশের অভিমুখে গিয়াছিল। ইন্দ্র সুন্দর অপত্য-যুক্ত, জল্পক, অমিত্রদিগকে মানুষ সুদাসের বশে আনিয়াছিলেন।

একং। চ। য়ঃ। বিংশতিং। চ। শ্রবস্যা। বৈকর্ণয়োঃ। জনান্। রাজা। নি। অস্তঃ॥

—৭।১৮।১১

বৈকর্ণ জনপদদ্বয়ের ২১ জনকে রাজা (সুদাস) যশ ইচ্ছা করিয়া সংহার করেন।

অধ। শ্রুতং। কবষং। বৃদ্ধং। অপ্‌সু। অনু। দ্রুহ্যং। নি। বৃণক্। বজ্রবাহুঃ।

বৃণানাঃ। অত্র। সখ্যায়। সখ্যম্। ত্বা। যন্তঃ। যে। অমদন্। অনু। ত্বা॥—৭।১৮।১২

অনন্তর বজ্রবাহু (ইন্দ্র), শ্রুত (অর্থাৎ বেদজ্ঞ) কবষকে (ও) বৃদ্ধ দ্রুহ্যকে জলসকলের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া বধ করিয়াছেন। এইখানে সখার জন্য, সখ্যবরণকারী তোমাগত (প্রাণ) যাহারা, তোমার সম্মুখে মত্ত হইয়াছিল।

বি। সদ্যঃ। বিশ্বা। দৃংহিতানি। এষাং। ইন্দ্রঃ। পুরঃ। সহসা। সপ্ত। দর্দঃ।

বি। আনবস্য। তৃৎসবে। গয়ং। ভাক্। জেষ্ম। পুরুম্। বিদথে। মৃধ্রবাচম্॥—৭।১৮।১৩

ইন্দ্র বল দ্বারা ইহাদিগের দৃঢ় সপ্তপুরী সদ্যঃ বিদারণ করিয়াছিলেন। অসুর পুত্রের গৃহ তৃৎসুকে ভাগ করিয়া দিলেন। যজ্ঞে মিথ্যা-বাক্য-উচ্চারণকারী পুরুকে (আমি ইন্দ্র) জয় করিব।

নি। গব্যবঃ। অনবঃ। দ্রুহ্যবঃ। চ। ষষ্টিঃ। শতাঃ। সুসুপুঃ। ষট্। সহস্রা।

ষষ্টিঃ। বীরাসঃ। অধি। ষট্। দুবঃ যু। বিশ্বা। ইৎ। ইন্দ্রস্য। বীর্য্যা। কৃতানি॥

—৭।১৮।১৪

গো লাভ করিতে ইচ্ছুক অনু ও দ্রুহ্যগণ ৬ হাজার, ৬ হাজার চির নিদ্রা গিয়াছিল। ৬৬ জন বীর (সুদাসের) পরিচর্য্যা করিয়াছিল। ইন্দ্রের বীর্য্য দ্বারা এই সকল সাধিত হইয়াছিল।

ইন্দ্রেণ। এতে। তৃৎসবঃ। বেবিষাণাঃ। আপঃ। ন। সৃষ্টাঃ। অধবন্ত। নীচীঃ।

দুর্মিত্রাসঃ। প্রকলবিৎ। মিমানাঃ। জহুঃ। বিশ্বানি। ভোজনা। সুদাসে॥—৭।১৮।১৫

যুদ্ধার্থে মিলিত এই তৃৎসুগণ ইন্দ্র দ্বারা আনীত নিম্নদেশগামী জলের মত ধাবিত হইয়াছিল। অজ্ঞান, দুষ্ট মিত্রগণ নষ্ট হইয়া সুদাসকে সকল ভোগ্য বস্তু ত্যাগ করিয়াছিল।

[সায়ন মনে করেন, তৃৎসুগণই দুষ্ট মিত্র। তাহারা এক সময়ে ইন্দ্রকে বাধা দিতে যায়; এবং নিম্নাভিমুখী জলের মত পলায়ন করে। আমরা কিন্তু এই অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে করি না। কারণ, এই ঋকে ইন্দ্রকে বাধা দিবার কোনও রূপ উল্লেখ নাই। যে উপমা

পরুষ্ণী নদীর যুদ্ধের বিষয় বসিষ্ঠ ঋষি একটী সূক্তে (৭।১৮) বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা সংক্ষেপে আমরা প্রদান করিতেছি।

জলমধ্যে মৎস্যগণ যেমন দলবদ্ধ হইয়া গমন করে, এবং তাহাদের অগ্রভাগে বৃহৎ মৎস্য নেতার মত যাইতে থাকে, সেইরূপ যজ্ঞকুশল তুর্বশ দুষ্টমিত্র আর্য্যদিগের পুরোভাগে আসিতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ ভৃগু ও দ্রুহ্যগণ শীঘ্র আগমন করিয়াছিল। পক্থগণ, অলিনাগণ, বিষাণবুক্তগণ ও শিবগণ শব্দ করিতে করিতে আসিয়াছিল। দুষ্টবুদ্ধিগণ আসিয়া পরুষ্ণীর কূল ভেদ করিয়া পৃথিবী জলময় করিয়া দিল। চয়মানের পুত্র কবি পলায়ন করিতে গিয়া হত হইল। বৈকর্ণ নামক জনপদদ্বয়ের ২১ জনকে সুদাস একাকী বধ করেন। বেদবিৎ কবষ ও বৃদ্ধ দ্রুহ্যকে ইন্দ্র জলমধ্যে নিমজ্জিত করিয়া সংহার করেন। পরে সুদাস অনুর পুত্রের পুর আক্রমণ করিয়া জয় করেন। তৃৎসুগণ উহা লাভ করে।

অনুগণ ও দ্রুহ্যগণ সুদাসের গোধন কামনা করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু উহাদের প্রত্যেকের ছয় সহস্র করিয়া লোক হত হয়। পরে ৬৬ জন বীরপুরুষ সুদাসের পরিচর্য্যা করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, বোধ হয়, অবশিষ্ট রক্ষা পায়। সুদাস রাজা এই যুদ্ধে তৃৎসুদিগের বীরত্ব দ্বারা জয় লাভ করেন। ঋষি অতি সুন্দর তুলনা দ্বারা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। পার্ব্বতীয়া নদীতে যখন জল নামিতে থাকে, তখন তাহার বেগ প্রচণ্ড; সম্মুখে যাহা পড়ে, তাহা কোথায় ভাসিয়া যায়। তৃৎসুগণ যখন পার্ব্বতীয় নদীর স্রোতের ন্যায় দুষ্টমিত্রদিগের উপর আসিয়া পড়িল, তখন তাহারা উহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সমস্ত ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সায়ন এই সুন্দর ঋকের অর্থ একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই।

পরুষ্ণী নদীর কূলভেদকারী দুষ্টমিত্রগণের মধ্যে আমরা তুর্বশ, চয়মানপুত্র কবি, ভৃগু, দ্রুহ্য, অনু, শ্রুতকবষ প্রভৃতির নাম প্রাপ্ত হই। ভরদ্বাজ ঋষি চয়মানের আর এক পুত্রের নিকট দান-প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়া ঋক্ রচনা করিয়া গিয়াছেন। (১) ইহাঁর নাম অভ্যাবর্ত্তী; ইনি মঘবান্ ও সম্রাট

---

রহিয়াছে, তাহাতে তৃৎসুদিগের পলায়ন বুঝায় না; ইন্দ্রের দ্বারা আনীত প্রচণ্ড জলস্রোতের মুখে যেমন সকল ভাসিয়া যায়, সেইরূপ যুদ্ধার্থে সংগত তৃৎসুগণ যখন ধাবিত হইয়াছিল, দুষ্ট মিত্রগণ সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া নষ্ট হইয়াছিল।]

(১) দ্বয়ান্। অগ্নে। রথিনঃ। বিংশতিং। গাঃ। বধূমতঃ। মঘবা। মহ্যং। সম্রাট্। অভ্যাবর্ত্তী। চায়মানঃ। দদাতি। দূণাশা। ইয়ং। দক্ষিণা। পার্থবানাম্।—৬।২৭।৮

ছিলেন। ইহাঁরা পৃথবা বা পৃথু-বংশীয়। অনুমান করি, এই চয়মানেরই কবি নামক পুত্র পরুষ্ণী নদীর বাঁধ ভাঙ্গিতে গমন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। অভ্যাবর্ত্তীর এই যুদ্ধে স্বার্থ ছিল। তিনি সম্রাট ছিলেন। সুদাস যমুনা-তীরে ভেদের যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। ইহাতে তিনি সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়েন। মনে হয়, পরুষ্ণী নদীর কূল-ভেদ-যুদ্ধের ইহাই প্রকৃত কারণ। অভ্যাবর্ত্তী সম্রাট ছিলেন বলিয়া অপরাপর রাজগণ তাঁহার সহিত এই যুদ্ধে যোগ দান করিয়াছিল।

যদু, তুর্বশ, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু, এই পাঁচ বংশ ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ ছিল। (১) ভৃগুগণ ঋষি-বংশীয় ছিলেন। তাঁহারা আয়ু নামক রাজার পুরোহিত-বংশ। (২) আয়ু নহুষের পিতা; নহুষ-বংশ সরস্বতীতীরে রাজত্ব করিত, বসিষ্ঠ-ঋষি-বিরচিত একটী ঋকে দেখিতে পাই। (৩) তাহা হইলে ভৃগুগণ সরস্বতী অর্থাৎ সিন্ধু নদীর তীরবাসী ছিলেন, প্রমাণিত হইতেছে। ক্ষিতিগণ সুদাসের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় উরুলোক বা সমগ্র ক্ষিতিদেশ সুদাসের অধীন হইয়াছিল। ইহা বসিষ্ঠ ঋষি একটী ঋকে প্রকাশ করিয়াছেন। (৪)

হে অগ্নে! মঘবান্, সম্রাট, চয়মান-পুত্র অভ্যাবর্ত্তী রথ সহিত, বধূযুক্ত দুই কুড়ি গাভী আমাকে দান করিতেছেন। পৃথবা-বংশীয়দিগের এই দক্ষিণা কেহ নষ্ট করিতে পারে না।

(১) যৎ। ইন্দ্রাগ্নী। যদুষু। তুর্বশেষু। যৎ। দ্রুহ্যুষু। অনুষু। পুরুষু। স্থঃ।
অতঃ। পরি। বৃষণৌ। আ। হি। যাতম্। অথ। সোমস্য। পিবতম্। সুতস্য॥
—১।১০৮।৮

হে ইন্দ্রাগ্নি! যদ্যপি যদু, তুর্বশ, দ্রুহ্য, অনু (বা) পুরুদিগের মধ্যে থাক, এই সকল স্থান হইতে হে বৃষদ্বয়! এখানে আইস, অনন্তর সুতসোম পান কর। (আঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।)

(২) ইমম্। বিধন্তঃ। অপাম্। সধস্থে। দ্বিতা। অদধুঃ। ভৃগবঃ। বিক্ষু। আয়োঃ॥—২।৪।২
ভৃগুগণ আয়ুর বিশদিগের মধ্যে ইঁহাকে (অগ্নিকে) দুই ভাগ করিয়াছিলেন, এবং জল সকলের নিকট পূজা করিয়াছিলেন।

(৩) একা। অচেতৎ। সরস্বতী। নদীনাম্। শুচিঃ। যতী। গিরিভ্যঃ। আ। সমুদ্রাৎ।
রায়ঃ। চেতন্তী। ভুবনস্য। ভূরেঃ। ঘৃতং। পয়ঃ। দুদুহে। নাহুষায়॥—৭।৯৫।২
নদী সকলের মধ্যে শুদ্ধা, গমনশীলা সরস্বতী একাই গিরি সকল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছেন। বহু ভূতজাতের ধনপ্রদানকারিণী (সরস্বতী) নাহুষের নিমিত্ত ঘৃত ও দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।

(৪) উৎ। দ্যাম্ইব। ইৎ। তৃষ্ণজঃ। নাথিতাসঃ। অদীধয়ুঃ। দাশরাজ্ঞে। বৃতাসঃ।
বসিষ্ঠস্য। স্তুবতঃ। ইন্দ্রঃ। অশ্রোৎ। উরুম্। তৃৎসুভ্যঃ। অকৃণোৎ। উঁ। লোকম্॥
—৭।৩৩।৫

বসিষ্ঠ ঋষি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, অনু, দ্রুহ্যু, তুর্বশ প্রভৃতিকে পরাজয় করা সুদাসের পক্ষে 'ছাগ দ্বারা সিংহ-বধের সদৃশ ও সূচিকা দ্বারা যূপকাষ্ঠ কর্ত্তনের সদৃশ' হইয়াছিল। (১) ঋষি মনে করিতেন, এই অসম্ভব সাধন শুধু ইন্দ্রের কৃপায় সিদ্ধ হইয়াছে।

সুদাস রাজা সিন্ধুদিগের তীরে শিম্যু নামক দস্যুদিগেরও শাসন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে উচথের স্তব শিম্যুদিগের অকল্যাণ সাধন করে। (২) অর্ধ নামে এক ইন্দ্র অবিশ্বাসী সুদাসের রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু ইন্দ্রের কৃপায় তিনি তাহাকেও তাড়াইয়া দেন। (৩)

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

---

জাততৃষ্ণ, বৃষ্টিপ্রার্থনাকারী, ( যজ্ঞে ) বৃতগণ ( অর্থাৎ ঋত্বিকগণ ) দাশ রাজাকে দিব্যলোকের মত উন্নত স্থান দান করিয়াছিলেন। স্তোত্রকারী বসিষ্ঠের ( স্তব ) ইন্দ্র শ্রবণ করিয়াছিলেন; তৃৎসুদিগকে উরুলোক প্রদান করিয়াছিলেন।

(১) আধ্রেণ। চিৎ। তৎ। উঁ। একং। চকার। সিংহ্যং। চিৎ। পেত্বেন। জঘান।
অব। স্রক্তীঃ। বেশ্যা। অবৃশ্চৎ। ইন্দ্রঃ। প্র। অযচ্ছৎ। বিশ্বা। ভোজনা। সুদাসে॥
—৭।১৮।১৭

ইন্দ্র দরিদ্রের দ্বারা সেই অদ্বিতীয় দান কর্ম্ম করিয়াছেন, ছাগের দ্বারা সিংহ বধ করিয়াছেন, সূচির দ্বারা যূপকাষ্ঠ কর্ত্তন করিয়াছেন। সকল ভোগ্য সুদাসকে দান করিয়াছেন।

(২) অর্ণাংসি। চিৎ। পপ্রথানা। সুদাসে। ইন্দ্রঃ। গাধানি। অকৃণোৎ। সুপারা।
শর্ধন্তম্। শিম্যুং। উচথস্য। নব্যঃ। শাপম্। সিন্ধূনাম্। অকৃণোৎ। অশস্তীঃ॥—৭।১৮।৫

ইন্দ্র সুদাসের নিমিত্ত জল সকল প্রথিত করেন; ( উহাদিগকে ) অগভীর ও সুখে পার হইবার উপযুক্ত করিয়াছিলেন। উচথের স্তব সিন্ধুদিগের শাপ ( রূপ ) প্রবল শিম্যুকে অকল্যাণযুক্ত করিয়াছে।

[ শিম্যুগণ যে দস্যুদিগের মত জাতি, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ঋকে দেখা যায়—
দস্যূন্। শিম্যূন্। চ। পুরুহূতঃ। এবৈঃ। হত্বা। পৃথিব্যাং। শর্বা। নি। বর্হীৎ॥—১।১০০।১৮
বহুলোকের দ্বারা আহূত ( ইন্দ্র ) গমনশীল ( মরুৎগণের ) দ্বারা দস্যু ও শিম্যুদিগকে বজ্র দ্বারা হনন করিয়া পৃথিবীতে ( আর্য্যদিগকে ) স্থাপন করিয়াছেন। ]

(৩) অর্ধন্। বীরস্য। শৃতপাং। অনিন্দ্রম্। পরা। শর্ধন্তম্। নুনুদে। অভি। ক্ষাম্।
ইন্দ্রঃ। মন্যুম্। মন্যুভ্যঃ। মিমায়। ভেজে। পথঃ। বর্তনিম্। পত্যমানঃ॥—৭।১৮।১৬

ইন্দ্র অবিশ্বাসী হবিঃপানকারী অর্ধকে, বীর ( সুদাসের ) ভূমির অভিমুখে স্পর্দ্ধাকারীকে ( ইন্দ্র ) দূর করিয়া দিয়াছেন। ইন্দ্র ক্রুদ্ধদিগকে ক্রোধ ( দিয়া ) বাধা দিয়াছেন; পলায়নপর পলায়ন পথ ভাগ করিয়াছিল।

[ অর্ধ ও নেম পণিবংশীয়, তাহা অন্য প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে। ]

# দরিদ্রের অন্ন-বস্ত্র।

১

দরিদ্রের অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট কিসে দূর হইতে পারে, তাহার সদুপায়-নির্দ্ধারণই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে দরিদ্রের অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া এই কষ্ট। মাসিক পত্রের ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। তথাপি কতকগুলি কথা সংক্ষেপে বলিলে, সহৃদয় ও চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে এই বিষয়ের আলোচনা সহজ হইতে পারে।

১। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই খাদ্যাভাব উপস্থিত। ভারতবর্ষের খাদ্য সচরাচর তিন প্রকার। প্রধানতঃ—

১। খাদ্য শস্য, এবং দুগ্ধ।

২। বনজাত ফল মূল। ইহার অধিক ভাগ ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা ও অন্যান্য বন্য ও পার্ব্বতীয় প্রদেশের অধিবাসিগণ আহার করে। বনের পশু পক্ষীও তাহাদিগের আহার্য্য।

৩। নদীর মৎস্য ও গৃহপালিত পশু পক্ষী।

খাদ্যাভাবের তিনটি কারণ প্রধান।

১। প্রাকৃতিক কারণ—যেমন অনাবৃষ্টি, কীট-পতঙ্গের দৌরাত্ম্য। জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস।

২। শ্রমের অপব্যয় ও শ্রমহীনতা, কিংবা আলস্য। যুক্ত পরিশ্রমই শ্রেষ্ঠ পরিশ্রম। রোগ শোকে ব্যক্তিগত শ্রমের হ্রাস হইয়া পড়ে। অন্ন উৎপন্ন করিবার চেষ্টা না করিয়া, অপদার্থ দ্রব্যের সৃষ্টি করিলে, শ্রমের অপব্যয় করা হয়।

৩। খাদ্য-সঞ্চয়ের অভাব।

সুতরাং খাদ্যসংগ্রহ করিবার তিনটিমাত্র উপায়।—

১। প্রাকৃতিক কিংবা দৈব বিড়ম্বনার প্রতিবিধান। যেমন, বন-সংরক্ষণ, মৎস্য ও পশু পক্ষীর পালন, কূপ ও জলাশয়ের অনুষ্ঠান, গোজাতির সংরক্ষণ। ইহাতে যুক্ত পরিশ্রম আবশ্যক। পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বত্বের দিকে দৃষ্টি পড়িলে, যুক্ত পরিশ্রমের চেষ্টা থাকে না। আর একটা কথা। খনিজ

পদার্থ, জলাশয়, বন উপবন, গোচারণের মাঠ প্রভৃতির উপর সাধারণের স্বত্ব থাকা প্রয়োজনীয়। নচেৎ কায়িক কিংবা বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারাই হউক, ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা কারবার অনুষ্ঠিত হইলে, দরিদ্রের কোনও সুবিধা হয় না।

২। কাল্পনিক অভাব হইতে নিবৃত্তি। অভাব বাড়িয়া গেলে ক্রমশঃই দারিদ্র্যের ভাব মনে আসে। ব্যক্তিগত অবস্থার তুলনা করিয়া পরস্পরের মধ্যে আক্রোশের ও দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। প্রীতি, সখ্য ও ঈশ্বরভক্তি না হইলে কাল্পনিক অভাবের হ্রাস হয় না, নতুবা যুক্ত কর্ম্ম অসম্ভব হইয়া পড়ে। ভক্তি ও যুক্ত কর্ম্ম, পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক। বাসনা, মানবকে ক্রমে অত্যন্ত প্রবৃত্তির পথে লইয়া যায়, কিন্তু আদর্শ পথ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যগামী। ধর্ম্ম সেই পথে বিকাশ পাইয়া, যুক্তপরিশ্রমকেই মূলধন-রূপে পরিণত করে, এবং তাহা হইতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়।

৩। সঞ্চয়শীলতা।

অন্ন সঞ্চয় করিয়া রাখাই প্রধান উপায়। অন্ন বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলে, সে টাকার অপব্যয় অত্যন্ত সম্ভব। যাহাদের নিকট আমরা শস্য বিক্রয় করি, তাহারাও অনেক কারণে দর বাড়াইয়া দেয়, কিংবা লাভের আশায় হস্তান্তর করে। সুতরাং, অবশেষে হয় ত টাকা দিলেও অন্ন পাওয়া যায় না, কিংবা আবার ক্রয় করিতে অনেক টাকার দরকার হয়।

কাল্পনিক অভাব বাড়িয়া গেলে দারিদ্র্যের কষ্ট গুরুতর হইয়া পড়ে। দারিদ্র্যের সীমা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। পূর্ব্ব কালে, সামান্য বাসস্থান ও মোটা অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান থাকিলেই আমরা আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতাম। পাশ্চাত্য জাতির সংঘর্ষে আমাদিগের কাল্পনিক অভাব বাড়িয়া গিয়াছে, এখন আমরা পরস্পরের 'সমৃদ্ধি'র তুলনা করি। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, সকল দেশের অন্নবস্ত্রের ও গৃহের আদর্শ এক প্রকার হয় না। শীতপ্রধান দেশে যাহা দরকার, আমাদের তাহা নয়। আবার, সহরের পত্তন, রেল ও কলকারখানার আড়ম্বর, বিলাস-দ্রব্যের স্তূপ, এমারত ও প্রাসাদ, বেশভূষার ছটা ও বারনারীর সংখ্যা-বৃদ্ধি ও মাদক-দ্রব্য-সেবন, ইহাই যে বাস্তবিক 'সমৃদ্ধি'র চিহ্ন, তাহা নহে। আমেরিকা, চীন, ইংলণ্ড ও অনেক প্রদেশই এই সকল আদর্শ অবলম্বন করিয়া নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ঘোরতর দারিদ্র্যের সূত্রপাত করিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কি স্বাধীন, কি পরাধীন, সকল দেশেই এই ব্যাপার। সুতরাং অন্য দেশের

সমৃদ্ধির তুলনায় ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের নির্দ্ধারণ করিতে বসিলে আমরা ভ্রমে পতিত হইব।

দেশের উপযোগী অন্ন-বস্ত্রের উদ্ভব মানবের যুক্তপরিশ্রম দ্বারা যত দূর সম্ভব, তাহারই অভাব মনীষিগণের মতে দারিদ্র্য বলিয়া অভিহিত। তাহার অধিক অভাবের সৃষ্টি করিলেই নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ সুনিশ্চিত। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশই যে উর্ব্বর, তাহা নহে। এক প্রদেশের অধিবাসিগণের অভাব তাহারা অন্য প্রদেশের অন্ন দ্বারা নানা উপায়ে মিটাইয়া লয়। তাহার প্রণালী কি, তাহা বিশেষরূপে না বুঝিয়া আমরা বলিয়া থাকি যে, এক প্রদেশ অন্য প্রদেশকে অযথা 'শোষণ' করিতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা বিদেশী বাণিজ্য-প্রথারও দোষ দিয়া থাকি। কিন্তু দারিদ্র্যের যথার্থ কারণ কি, তাহা সদ্বিচারসাপেক্ষ।

২

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা কত, অধিবাসিগণের শ্রেণীবিভাগ ও তাহাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় কি, এবং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে জৈবনিক সম্বন্ধ কি প্রকার, তাহা সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে বুঝান যাইতে পারে। পরে আমরা উপজাত দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ২৩ কোটী। তাহার মধ্যে—

১। শতকরা ৭৫ ভাগ অর্থাৎ ১৭ কোটী, চাষী ও তাহাদিগের মজুর। চাষীদিগের মধ্যে দুই শ্রেণী। (ক) যাহারা দরিদ্র, অর্থাৎ নিজেই পরিশ্রম করিয়া চাষ করে। সাধারণতঃ এই শ্রেণী বাৎসরিক দশ টাকার কম খাজনা দেয়। ইহাদের সংখ্যাই অধিক। ইহারা সুবৎসরে খাইতে পায়, দুর্বৎসরে ঋণগ্রস্ত হয়, মরিয়া যায়, কিংবা চা-বাগান প্রভৃতিতে গিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করে। (খ) যাহাদের অবস্থা ভাল, এবং যাহারা মজুর খাটায়।

২। শতকরা ১ ভাগ, অর্থাৎ ৪০ লক্ষ, ভূস্বামী ও তাহাদিগের অনুচর ও কর্ম্মচারিবর্গ।

৩। শতকরা ২ ভাগ, অর্থাৎ ৮০ লক্ষ গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারী, সৈন্য ও পুলিস, এবং তাহাদিগের অনুচরবর্গ।

৪। শতকরা ২০ ভাগ, অর্থাৎ ৫ কোটী ব্যবসাদার, দোকানদার, শিল্পী, কলকারখানা ও খনির লোক, এবং তাহাদিগের অনুচরবর্গ ও মজুর।

৫। শতকরা ২ ভাগ, অর্থাৎ ৮০ লক্ষ ডাক্তার, উকীল ও অন্যান্য স্বাধীন বৃত্তি যাহাদিগের অবলম্বন, এবং তাহাদিগের অনুচরবর্গ।

এই বিপুল লোকসংখ্যা কেবল ভারতবর্ষজাত শস্য ও অন্যান্য দ্রব্য আহার করিয়া জীবনধারণ করে। পূর্ব্বসঞ্চিত কোনও ধন সম্পত্তি থাকিলেও, কিংবা স্বদেশজাত কোনও খনিজ কিংবা অন্যান্য দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করিলেও, এখন আর অন্য দেশে খাদ্যশস্য মিলিবে না; কারণ, সর্ব্ব স্থানেই খাদ্যের অভাব। সুতরাং এই খাদ্যশস্য চাষীদিগকে চাষ করিয়াই সকলের জন্য যোগাইতে হইবে। সাধারণতঃ দেখিতে গেলে ১৭ কোটী চাষীর পক্ষে ২৩ কোটী লোকের খাদ্যের সংস্থান করা কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ১৭ কোটীর মধ্যে ৫ কোটী চাষী খুব সামান্য পরিশ্রমই করে। কিংবা খাদ্য-শস্যের চাষ না করিয়া অন্যান্য ভূমিজাত দ্রব্য—যেমন পাট, তূলা, চা, তামাক প্রভৃতির চাষ করে। বাকি ১২ কোটীর মধ্যে ৮ কোটী স্ত্রীলোক ও বালক। ফলে, ৪ কোটী শ্রমজীবী পুরুষ চাষীই ২৩ কোটী লোকের খাদ্যশস্য চাষ করে। ভারতবর্ষে এখন রোগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, এবং গ্রামে বাস করা যেরূপ কষ্টকর, তাহাতে তাহাদের পক্ষে এ পরিশ্রম দুঃসাধ্য। সুতরাং ব্যবসাদার ও কল-কারখানার মজুরের সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে, এবং খাদ্যশস্যের অনাটন হইতেছে। পাঁচ কোটী ব্যবসাদার ও মজুরের মধ্যে যদি এক কোটী পুরুষও আবার কৃষিকর্ম্মে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলেও অনেকটা রক্ষা হয়।

উপরোক্ত ১৭ কোটী চাষী, তাহাদিগের পরিশ্রমজাত শস্য কিংবা ভূমিজাত দ্রব্যের এক অংশ খায়, এবং বীজশস্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। এক অংশ ব্যবসাদারের নিকট বেচিয়া তাহারা বস্ত্র ও জীবনের উপযোগী দ্রব্য ক্রয় করে। আর এক অংশ বেচিয়া তাহারা ভূস্বামীকে নগদ টাকায় খাজনা দেয়।

ভূস্বামী যে টাকা খাজনা স্বরূপ পায়, এবং যে টাকা তাহাদিগের আয়ত্তাধীন খনিজ পদার্থ ও জঙ্গল প্রভৃতি ব্যবসাদারকে বিক্রয় করিয়া পায়, তাহার এক অংশ রাজস্ব-স্বরূপ রাজাকে প্রদান করে। বাকি টাকা দিয়া ব্যবসাদারের নিকট খাদ্যশস্য, বস্ত্র ও বিলাসের দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে, এবং স্বীয় অনুচরবর্গ ও কর্ম্মচারিগণের ভরণপোষণ করে।

রাজস্ব ও অন্যান্য কতিপয় করের টাকা দ্বারা সরকারী কর্ম্মচারিগণ প্রতি-পালিত হয়। রাজ্য-রক্ষা, স্বত্ব-রক্ষা ও পাপের দমন তাহাদিগের কর্ম্মের উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্য ও স্বত্বের রক্ষার্থ ডাক্তার ও উকীল প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়িগণ সর্ব্বশ্রেণীর নিকটেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজের ও অনুচরবর্গের ভরণপোষণ করেন, এবং বিলাসের দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকেন।

এই কারবারের মধ্যে ব্যবসাদারের স্থান অত্যন্ত জটিল। বাস্তবিক পক্ষে দরিদ্র চাষী ও সরকারী কর্ম্মচারী ছাড়া সকল শ্রেণীর লোকই এক প্রকার ব্যবসাদার। তাহারা বহু উপায় ও কৌশল অবলম্বন করিয়া পরস্পরের সহিত আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয়ে, ঋণ-দানে ও ঋণ-গ্রহণে, এবং বিদেশের ও স্বদেশের বাণিজ্যে লাভ করিয়া মূলধন নামক অলীক পদার্থের সৃষ্টি করে। খাদ্যশস্যের অভাব হইলে, তাহার ফলে, সকল জিনিসই দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়ে।

আপাততঃ কয়েকটা কথা মনে রাখিলেই চলিবে।

(১) ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার বেশী বৃদ্ধি হয় নাই, কিন্তু তাহার অনুপাতে খাদ্যের অনাটন হইয়াছে।

(২) রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী, কিন্তু সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ সহজ ও সস্তা উপায় এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। খাদ্যাভাব প্রযুক্ত দরিদ্রের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

(৩) ব্যবসার ও কলকারখানার ক্রমাগত বৃদ্ধি হইয়া সমাজবন্ধন শিথিল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

(৪) ব্যক্তিগত স্বত্ব ও তাহার পৃষ্ঠপোষক আইন কানুন ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়া যুক্ত পরিশ্রম, সখ্যতা ও প্রীতির উত্তরোত্তর হ্রাস হইতেছে।

(৫) দরিদ্র চাষীর জীবন এত কষ্টকর হইয়াছে যে, তাহারা তাহাদিগের পরিশ্রমের মূল্য অতিশয় কম মনে করে। কিন্তু তাহা বাড়াইলে, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ও বস্ত্র প্রভৃতির মূল্য আরও বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং যাহাতে প্রচুর অন্ন উৎপন্ন হয়, এবং সমাজের সর্ব্বসাধারণের হিতের উপযোগী পরিশ্রমগুলির মূল্য যথাসম্ভব নির্দ্ধারিত হয়, তাহারই উপায়-নিরূপণ করা কর্ত্তব্য।

এখন গোটাকতক অঙ্কপাতপূর্ব্বক এই কথাগুলি বুঝাইলে হয়।

৩

ভারতবর্ষের উপজাত দ্রব্যের পরিমাণ ও তাহার মূল্য, আমদানী ও রপ্তানীর মূল্য, এবং প্রত্যেক শ্রেণীর আয়-ব্যয়ের হিসাব বুঝাইয়া দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। দশ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা গোপালকৃষ্ণ গোখেল ও ইদানীং মনস্বী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যে সকল হিসাব দিয়াছেন, তাহাই ও অন্যান্য বাৎসরিক রিপোর্টগুলি ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নিম্নের অঙ্কপাত। মনে রাখা উচিত যে, মূল্যের হার ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং চাষীরা যে মূল্যে বিক্রয় করে, সে মূল্যের সহিত বাজারের দরের কোনও সম্বন্ধ নাই। অঙ্কগুলি বহু বৎসরের গড়পড়তায় খুব স্থূলভাবে দেখান হইয়াছে।

লোকসংখ্যা ২৩ কোটী।

| | দ্রব্য | কোটী বিঘা | মণ (কোটী) | মূল্য কোটী টাকা | রপ্তানী (কোটী মণ) | রপ্তানীর মূল্য কোটী টাকা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খাদ্য শস্য | চাউল | ১৮ | ৮০ | ৪০০ | ১½ | ৭ | গত কয়েক বৎসর যুদ্ধের বিভ্রাটে ইহার অনেক ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। |
| | গোধূম | ৬ | ২৫ | ২০০ | ৪ | ৩২ | |
| | ভুট্টা | ১ | ৬ | ৩০ } | ৩ | ১২ | |
| | বজরা, জোয়ার, ছোলা প্রভৃতি | ২৪ | ৯৩ | ৩০০ } | | | |
| তৈল ও বস্ত্রোপযোগী | তৈলোপযোগী | ৩ | ৬ | ৩৬ | ১ | ৬ | গত কয়েক বৎসর প্রায় ইহার অধিক ভাগই রপ্তানী হইতেছে। |
| | কার্পাস | ৩½ | ১½ | ২৬ | ½ | ১০ | |
| | পাট | ১¼ | ৪ | ৩০ | ৩¾ | ২৫ | |
| অন্যান্য | চা | ১/২০ | ¼ | ১০ | × | ৮ | ভাল শস্য হইলে কার্পাস প্রায় ৩ কোটী মণ উৎপন্ন হয়। |
| | অন্যান্য ভূমিজাত ও অরণ্য | ১২ | × | ২০ | × | ১৬ | কাষ্ঠ, চর্ম্ম ইত্যাদি। |
| | কয়লা ও খনিজ | × | ৩২৪ | ১০০ | × | ২০ | |
| | | | | | | ১৩৬ | |

প্রত্যেক প্রদেশে চাষ কত, তাহার বিবরণ যদি কেহ দেখিতে চাহেন, তবে তাঁহাদিগের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য সর্ব্বশেষে আর একটি তালিকা প্রদত্ত হইবে।

এখন দেখিতে হইবে—

খাদ্যশস্যের চাষ প্রায় ৫০ কোটী বিঘা, উপজাত শস্য ২০৪ কোটী মণ। তাহার মধ্যে প্রায় ৯ কোটী মণ রপ্তানী বাদ দিলে ১৯৫ কোটী মণ থাকে। ইহাই ২৩ কোটী লোকের আহার। অর্থাৎ, প্রত্যেক লোকের গড়ে প্রায় ৯ মণ বৎসরে, কিংবা দৈনিক ১ সের। কিন্তু ইহার মধ্যে বীজধান্য রাখিতে হয়, এবং কতকগুলি সৌখীন পশু পক্ষী, যেমন ঘোড়া, হাতী, উষ্ট্র প্রভৃতি অংশীদার। সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক লোকের ½ সেরের বেশী জুটিয়া উঠে না। সুবৎসরে চলিয়া যায়, কিন্তু দুর্বৎসরে দরিদ্র চাষী ও মজুর মারা পড়ে। দেশে যদি প্রচুর খাদ্য না থাকে, তবে টাকা দিয়াও তাহাদিগের জীবনরক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ বৎসর আমরা তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। যাহা কিছু ব্যবসাদারের হাতে থাকে, তাহার এত দর বাড়িয়া যায় যে, দরিদ্রের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব, এবং তাহাতে টানাটানি পড়িলে ধনী ও ব্যবসাদারের পক্ষে সঙ্কট। অন্য দেশ হইতেও পাওয়া যায় না। সুতরাং যে খাদ্যশস্য রপ্তানী হয়, তাহাতে ব্যবসাদারের যতই টাকা লাভ হউক না কেন, সেই রপ্তানীটুকু না করিলে অন্ততঃ কিছু অন্ন ঘরে থাকে। কিন্তু খাদ্যশস্য প্রচুরভাবে উৎপন্ন ও সঞ্চয় না করিলে ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের জীবনরক্ষা দুষ্কর।

কার্পাস ও পাট যাহা রপ্তানী হয়, তাহার মূল্য ৩৫ কোটী টাকা। ইহার লাভ ব্যবসাদারগণই পায়, এবং রপ্তানীর পরিবর্ত্তে বিদেশ-নির্ম্মিত বস্ত্র আসে। ঘরে থাকিলে কৃষকদিগের মোটা বস্ত্রের অভাব হইতে পারে না। তাহারা গবর্মেণ্টের সাহায্যে এখানেই তাঁতীর দ্বারা বস্ত্র বুনিবার বন্দোবস্ত করিতে পারে।

অন্যান্য ভূমিজাত দ্রব্যের উপর কৃষকের স্বত্ব নাই। তাহা বিক্রয় করিয়া ভূস্বামিগণ অট্টালিকা, রেলভ্রমণ এবং রেশমী ও পশমী বস্ত্র, জুতা ও বিলাস-দ্রব্যের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতেছেন।

আমদানীর সহিত রপ্তানীর সম্বন্ধ নিম্নলিখিত ভাবে দেখান যাইতে পারে—
( যুদ্ধের পূর্ব্বে কতিপয় বৎসরের গড়ে )

| রপ্তানী ( যে মূল্য পাওয়া যায় ) | | আমদানী টাকা ( যে মূল্য দিতে হয় ) | |
|---|---|---|---|
| খাদ্যশস্য | ৫০ কোটী টাকা | চিনি | ১০ কোটী টাকা |
| তৈলোপযোগী শস্য, কার্পাস ও পাট | ৪১ " " | কেরোসিন | ৬ |
| | | কাপড় | ৩৮ |
| ভূমিজাত অন্যান্য ও আরণ্য এবং খনিজ | ৪৪ " " | রেশমের ঐ | ১½ |
| | | পশমের ঐ | ২½ |
| | ১৩৫ | খণ্ডবস্ত্র অন্য প্রকারের | ২½ |
| | | জুতা | ½ |
| | | তাম্রের বাসন প্রভৃতি | ১½ |
| | | দেশলাই | ১ |
| | | সাবান | ½ |
| | | সুপারী | ১ |
| | | লৌহের কল | ৩ |
| | | ও অন্যান্য বিলাসের দ্রব্য | ৪২ |
| | | | ১১০ |

আমদানী ও রপ্তানী সম্বন্ধে ইহা বলিয়া রাখা উচিত যে, ইহার লাভ লোক্‌সান ঠিক বুঝা যায় না। প্রথমতঃ, অনেক হাত দিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে চাষীর লাভ বড় কম। শস্যের দর বাড়াইয়া দিয়া তাহারা যাহা পায়, তাহা দ্বারা উচ্চশ্রেণীর চাষী কেবল কতকগুলি সখের দ্রব্য ও ধাতুময় বাসন ও গহনা সংগ্রহ করে।

চাষীদিগের একটা মোটামুটী হিসাব দেওয়া গেল।—

| জমা— | | খরচ— | টাকা ( শস্য বেচিয়া ) |
|---|---|---|---|
| খাদ্যশস্য | ৯৩০ কোটী টাকা | | |
| কার্পাস, পাট, প্রভৃতি | ৯২ | খাজনা | ১৩৮ কোটী |
| | ১০২২ | লবণ | ৪ |
| | | | ১৪২ |

জের জমা—১০২২ কোটী টাকা
বাদ খরচ— ৩৮৩
৬৩৯ ”

[ চাষীর সংখ্যা ১৭ কোটী ; অর্থাৎ, প্রত্যেক চাষীর গড়পড়তা বৎসরে ৩৭৲ টাকা খাদ্যের জন্য থাকে। ৩৭৲ টাকায় বাৎসরিক ৬ মণ কিংবা দৈনিক প্রায় অর্দ্ধ সেরের কিছু উপর। ]

জের খরচ—১৪২ কোটী

| | |
|---|---|
| ষ্ট্যাম্প | ৬ |
| উকীল ও মোক্তার | ৫ |
| আবকারি | ৫ |
| চৌকিদারি ও অন্যান্য কর | ২ |
| পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ | ½ |
| রেলওয়ে-ভ্রমণ | ½ |
| চিনি (বিদেশীয়) | ৬ |
| কেরোসিন তৈল | ৪ |
| বস্ত্র | ৩০ |
| তাম্র ও লৌহদ্রব্য | ৪ |
| সুপারী | ১ |
| (বীজধান্য প্রভৃতি) | ১৭০ (ঘরের শস্য) |
| স্বাস্থ্যরক্ষা ও ডাক্তার | ৫ |
| শিক্ষা | ১ |
| অন্যান্য ব্যয় | ১ |
| | ৩৮৩ |

ক্রমশঃ।

---

# বাঙ্গালী সৈনিকের দৈনিকলিপি।

দুই তিন মিনিট ধরিয়া জার্ম্মাণ ও ফরাসী উড়ো জাহাজ ধীরে ধীরে একটী চক্র দিল। ইহারা যে পলাইতে চেষ্টা করিতেছে, এরূপ মনে হইল না। একটী অপরটীকে আক্রমণ করিবে, প্রতি মুহূর্ত্তে যখন এই আশঙ্কা হইতেছে, হঠাৎ তখন একটী উড়ো কল নীচের দিকে মুখ করিয়া দ্রুতবেগে নামিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়টী ইহার অনুসরণ করিল। তাহার পশ্চাতে তৃতীয়টী আসিল। এ সব ঘটিতে এক সেকেণ্ডের বেশী লাগিল না। জার্ম্মণ কল প্রথমে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়। আকাশে যেখানে তাহারা যুদ্ধ করিতেছিল, সেই line of attack তিন সেকেণ্ড ধরিয়া Machine gunএর গোলাগুলি ছোড়ায়, ধূম্রাকৃতি ধারণ

করিল। ক্রমে তাহারা এক লাইনে এত কাছাকাছি আসিল যে, মনে হইল, তাহারা পরস্পর পরস্পরের উপর পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। ইহার পর এক সেকেণ্ডের মধ্যে কি একটা ফাটার শব্দ শোনা গেল; সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীর যে কলটী প্রথমে অনুসরণ করে, তাহা জ্বলিয়া উঠিয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে নামিতে লাগিল, আর দুটী কল আহত অবস্থায় ফরাসী উড়ো কলটীর মরণের সাথী হইতে চলিল। মোট কথা, যুদ্ধে কেহ কাহাকেও প্রাণ লইয়া ফিরিতে দিল না। এক জন নাবিক তাহার আগুনধরা উড়ো জাহাজ হইতে শূন্যে লাফাইয়া পড়িতেছে, দেখা গেল। পদাতি সৈন্যের খাতে পড়ায় তাহার দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

১৮ই জুলাই।—সকাল হওয়া সত্ত্বেও আমাদের উঠিতে বেলা হইল। কিছু দূরের কামানের গর্জ্জন সহজে আমাদের জাগাইতে পারে না; অভ্যাস এমন হইয়াছে যে, কান এ সব শব্দ শুনিতে পায় না, এবং মন এ সব শব্দ গ্রাহ্য করে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই—কাজ করি, কিংবা বসিয়া থাকি, জার্ম্মাণ কামানের ধ্বনি দিনের যে কোনও সময়ে বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। জার্ম্মাণ উড়ো জাহাজের গোঁ গোঁ শব্দ অস্ফুট হইলেও কানে আসিয়া পঁহুছায়, কিন্তু নিজেদের উড়ো জাহাজ মাথার উপর দিয়া আকাশ তোলপাড় করিয়া গেলেও আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আজ একটী সুড়ঙ্গে কাজ করিতে হইয়াছিল; ইহা ব্যাটারীর কামান হইতে গোলাগুলি প্রভৃতির মালগুদামে যাইবার জন্য মাটীর নীচে নির্ম্মিত একটী আবৃত পথ। সুড়ঙ্গটী ৭ গজ মাটীর নীচে; ইহার দেওয়ালে খাট, বিছানা ঝুলাইয়া রাখা যায়। দিনের পর দিন যখন গোলাগুলি বর্ষিত হইতে থাকে, তখন ইহার ভিতর এই খাটে ঘুমাইতে হয়। চারি জন লোক দুই বৎসর Mine করিলে এইরূপ একটী সুড়ঙ্গ তৈয়ারী করিতে পারে। ভিতরের হাওয়া এমন যে, নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হয়। এ বাতাসে Carbon oxide, phosphoratted hydrogen, Dynamite ও Millenite হইতে উদ্ভূত গ্যাস; acetyline ল্যাম্পের গন্ধে ভিতরের হাওয়া দূষিত; কাজেই এখানে তিন ঘণ্টা কাজ করিয়া বাহিরে আসিলে বড় গরম বোধ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ মাথা ধরিল।

সন্ধ্যার সময় Meuse নদীর তটে ভীষণ আক্রমণের সূচনা হইল। শব্দের পর শব্দ তরঙ্গায়িত হইয়া অনন্ত কোটী বজ্রধ্বনির সৃষ্টি করিল। সেখানে কিছু একটা হইতেছে বুঝিতে পারিয়া আমরা সজাগ হইয়া ঘুমাইতে লাগিলাম।

শয্যায় শুইয়া আছি, দুই ঘণ্টাও হইবে না, এমন সময়ে ঘণ্টা শোনা গেল; তাড়াতাড়ি উঠিতে হইল—বুটের ভিতর পা ভরিয়া দিলাম, এবং কোনও মতে নীল Pant পরিয়া এক হাতে Mask ও আর এক হাতে Helmet লইয়া Dugout হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। পর মুহূর্ত্তে সবুজ জাল সরাইয়া কামানগুলির উপর যন্ত্রাদি বসাইয়া যুদ্ধে ব্যবহারের উপযোগী করা হইল। চাতালে (Platformএ) Shell, fuse, detonater ইত্যাদি জড় করা হইল। 'থ' চিহ্নিত স্থানে আমাদিগকে আক্রমণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যন্ত্রপাতি Chart দেখিয়া mark করা হইল; নির্দ্দেশমত shellএ বিশিষ্ট ফিউজ দিলাম। ২।৩ মিনিটের মধ্যে একটা ৭৫ মিঃ-মিঃ কামানের কড় কড় ধ্বনিতে গভীর নীরবতা ভঙ্গ হইল,—পর মুহূর্ত্তে সহস্র কামান—শত্রুর পরিখা ও ব্যাটারীর উপর ভীষণ অগ্নি বর্ষণ করিল; গোলার পর গোলা ছুটিল; Torpedo ফাটিল; এবং Fuseএর নানা রঙ্গে আকাশ রঙ্গিয়া উঠিল। এক ঘণ্টা পরে আমরা আক্রমণ বন্ধ করিবার আদেশ পাইলাম,—শব্দগুলি তখন একটার পর আর একটা করিয়া যেন আকাশে মিশিয়া গেল। যে আসল জায়গায় শত্রু আমাদের প্রতিরোধ করিতেছিল, সে স্থান হইতে শত্রুর দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত করিবার জন্য অন্য জায়গায় এমনতর আক্রমণ করা হয়।

২০শে জুলাই।—আমাদের প্রত্যেককে এখন পাঁচ দিনের জন্য ৬০০ গ্র্যাম তামাক, দুই সপ্তাহের জন্য একটা বাতি নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। দুই ঘণ্টা মাত্র কাজ করিয়াছি, এমন সময় মাথার উপর দুম্ ও হিস্ শব্দ শোনা গেল। একটা খাত তৈয়ারী হইতেছিল, তার দেওয়ালে ঠেসান দিয়া সতর্কিতভাবে উৎকর্ণ হইলাম—একটা গোলা (Shell) মাথার উপর দিয়া ২০০ গজ পিছনে মাটীতে পড়িল—আমাদের দিকেই ইহা ছোড়া হইয়াছিল, কিন্তু পড়িল কিছু দূরে। আধ সেকেণ্ড পরে আবার দম্ শব্দ—গোলা ঠিক কোন্ স্থানে পড়ে দেখিবার জন্য মাথায় Helmet পরিয়া হাতে Mask লইয়া তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলাম। প্রত্যেক বার আমাদের লক্ষ্য করিয়া এ সব ছোড়া হইতেছিল। গোলা ফাটিয়া গর্ত্ত করিয়া চারি দিকে মাটী ছড়াইবামাত্র আমি বলিলাম, 'সুড়ঙ্গে চল', এবং কামানটার দিকে ছুটিলাম। ঠিক সেই সময়ে একটা গোলা আমাদের উপর দিয়া গিয়া উঁচু তাগাড়ের কিছু দূরে ফাটিল। আর গোটাকয়েক গোলাগুলি ছোড়ার পর এ গোলাবৃষ্টি থামিল। কাজ করিতে পুনরায় বাহিরে আসিতে হইল। খুব সতর্ক রহিলাম; কারণ, জানিতাম,

তখনও আক্রমণ শেষ হয় নাই; হিস্ শব্দ শুনিবামাত্র সুড়ঙ্গের ভিতর আশ্রয় লইতে হইবে। গাঁতিটী রাখিয়া দুই এক মিনিট বিশ্রাম করিতে বসিয়াছি, এমন সময় আকাশে একটী গোলার গগনভেদী গর্জ্জন,—যেখানে খাটিতে-ছিলাম, সেখান হইতে দশ হাত দূরে পড়িয়া গোলাটী ফাটিল; এরূপ দ্বিতীয় গোলা ফাটিবার পূর্ব্বে আমরা সুড়ঙ্গে উপস্থিত। একে একে প্রায় কুড়িটী গোলা এইরূপে ছোড়া হইল। ইহাদের উদ্দেশ্য, কেমন করিয়া কামান ছুড়িলে ঠিক জায়গায় লাগে, তাহাই দেখা। গোলা ছোড়ার ভাবগতিক হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম, শত্রু আমাদের ব্যাটারী দেখিতে পাইয়াছে।

২১শে জুলাই।—দুই দিন ধরিয়া আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। জর্ম্মণ ও ফরাসী উড়ো কল সদলে চারি ধারের জমীর ফটো লইতেছিল। Anti-aviation gun তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অগ্নিময় শেল বৃষ্টি করিতে লাগিল। নাবিকেরা উড়ো কল লইয়া মেঘের আড়ালে আড়ালে ঘুরিতেছিল, এবং একটী মেঘখণ্ড হইতে আর একটীতে যাইবার সময় নিজেদের কাজ সারিতেছিল। আমে-রিকান কল একটু বিচিত্র—সামনে একটী নল নীচু দিকে মুখ করিয়া আছে, ঠিক মশার হুলের মত; বোমা ফেলিবার সুবিধা হইবে বলিয়া এরূপে নির্ম্মিত। ফরাসীদের পিছনে আপনাদের কল লইয়া উড়িয়া আমেরিকানরা এক এক স্থানের দৃশ্যগুলি কিরূপ, এবং সাঙ্কেতিক চিহ্ন কি কি, এই সকল বিষয়ে ফরাসীদের অনুকরণ করিয়া আপনাদিগকে অভ্যস্ত করিতেছিল—মুরগীর পিছনে যেন সব ছানা ছুটিতেছে!

রাত্রে সাত গাড়ী গোলাগুলি আমাদের ব্যাটারীর নিকট উপস্থিত। মাল খালাস করিতে গেলাম; এমন সময় শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য ঘণ্টার শব্দ করিয়া আমাদিগকে ডাকা হইল। গাড়ীর প্রহরীরা অগ্নিবৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য গাড়ীগুলি লইয়া দূরে সরিয়া গেল। আকাশ আলোকিত করিয়া জার্ম্মাণের দ্বিতীয় লাইনে বেশ করিয়া গোলাগুলি ছোড়া হইল। ক্রমে শেষ বোমাটীর শব্দ আকাশে মিশিয়া গেল। এমন হঠাৎ আক্রমণের উদ্দেশ্য, শত্রু কতখানি সতর্ক, তাহা দেখা। পুনরায় কাজে ফিরিয়া গাড়ী হইতে গোলাগুলি নামাইয়া লইলাম। তার পরেই নিদ্রা।

৩রা অগষ্ট।—আমাদের জরীপ করা জায়গার মধ্যে থাকিয়া বিপদের সময় যাহাতে রাত্রে গোলাগুলি ছোড়া যায়, সে জন্য আজ সব কামান নূতন করিয়া যথাযোগ্য স্থানে রাখা হইল। আগে যে স্থানে কামান থাকিত, তাহা

লক্ষ্য করিয়া এই সব নূতন chart করা হইল ; কারণ, আক্রমণের সময় কিছু ভাবিবার বা চাহিবার উপায় নাই। আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জরীপ করিয়াছিলাম—প্রায় বারো কিলোমিটার পরিমিত বিস্তৃত স্থান। এ জায়গার কোন্‌খানে কত angle করিয়া কোন্ দিকে ছুড়িলে লক্ষ্য অব্যর্থ, তাহা উড়ো জাহাজের নাবিকের সাহায্যে যুদ্ধের পূর্ব্বে ঠিক করা ছিল ; কাজেই যে স্থানে আক্রমণ করিতে হইবে, তাহা চিহ্নিত করিয়া দিলেই ব্যাটারীর অধ্যক্ষের কাজের শেষ। সারা খাতটা A হইতে X পর্য্যন্ত অক্ষরে চিহ্নিত, এবং কোন্ চিহ্নিত স্থানে আক্রমণ করিতে কোন্ দিকে কত angle করিয়া কিরূপ Shell ব্যবহৃত হইবে, কোন্ রকম Fuse কতখানি ফলপ্রদ, এমন কি, কি ওজনের গুলি বারুদ ইত্যাদির প্রয়োজন, তাহা সমস্তই Chartএ লিখিত। শত্রুর কামান ছোড়া বন্ধ করিবার জন্য কেমন ভাবে, কত কত, কি কি ছুড়িতে হইবে, কিংবা শত্রুর ভীষণ আক্রমণ কি ভাবে উল্টা আক্রমণ করিলে ব্যর্থ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে কাগজে কলমে সব বলিয়া দেওয়া আছে ; কারণ, শত্রুর ব্যাটারী ধ্বংস করিতে হইলে যাহা Batteryকে রক্ষা করে, তাহার উপর নজর দিতে হয়, এবং আক্রমণসময়ে শত্রু যাহাতে উল্টা আক্রমণ করিতে না পারে, সে জন্য Shropnell কিংবা লাল রঙ্গের Instantaneous Fuse লাগান D. Shell ছোড়া হয়।

১৪ই অগষ্ট।—গত কল্য মধ্যরাত্র হইতে ভার্দ্দুনের সামনে ভীষণ আক্রমণের সূচনা হইয়াছে। প্রভাত হইতে না হইতে এই প্রসিদ্ধ নগর হইতে আরম্ভ করিয়া আরগন ( Argon ) পর্য্যন্ত সব স্থান ব্যাপিয়া যুদ্ধ বাধিল। 2nd. Armyতে আর পাঁচটা Army corps যোগ করিয়া দেওয়া হইল। সারা দিন ধরিয়া গোলাগুলি বর্ষণ—যেটুকু ক্ষণ বন্ধ না রাখিলেই নয়, ঠিক ততটুকু ক্ষণ বন্ধ রাখা হইল ; এবং নিজেদের দারুণ ক্লান্তি দূর করিবার জন্য মাঝে মাঝে আঙ্গুরের লাল রস পান করিতে লাগিলাম। খাত হইতে বাহির হইবার সময় একটা হিস্ শব্দ শুনিয়া থম্‌কিয়া গেলাম ; প্রথমে ঠিক করিতে পারি নাই, ইহা কি ; উপরে চাহিয়া দেখি,এক শত গজ দূরে কাল মেঘের মত কি একটা অস্পষ্ট জিনিস। যেমন দেখা, অমনই খাতের ভিতর লাফাইয়া প্রবেশ! ঠিক সেই সময় ভীষণ কড় কড় শব্দ হইল, গোলা ফাটিয়া কুচি লাগিয়া জামায় ছেঁদা হইয়া গেল। এরূপ ছুড়িবার অভিপ্রায়, আমাদিগকে বিধ্বস্ত করা—যাহাতে আমরা আর গোলা ছুড়িতে না পারি। আমাদের

ব্যাটারীর উপর শত্রুর আক্রমণ থামিল না—গোলা গুলি রাখিবার স্থান, গ্রাম ও নগরের হাট বাজার, কিছুই বাদ গেল না। দূরে দূরে নগর-আক্রমণেও শত্রুর বিরতি নাই। তাহাদের কামানের প্রত্যুত্তরে আমাদের গোলা-বর্ষণে বিশেষ কোনও লাভ হইল না। সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া Marine guns আনিয়া শত্রু পদাতি সৈন্যের লাইনে বসাইয়া ছিল; এ সব কামান বহু দূরের লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে; ইহার অব্যর্থ সন্ধান চারি দিকে মৃত্যুবাণ ছড়াইতে লাগিল। আমাদের অনুমান যে সত্য, উড়ো জাহাজের নাবিকেরা নির্ব্বিঘ্নে যে সব ফটো লইয়াছিল, তাহা হইতে জানা গেল। যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে যে সব নগরে আমাদের বিশ্রামের দিনগুলি সুখে কাটিয়াছিল, সে স্থানের শিশুর সরল মুখ ও রমণীর সুন্দর কান্তি স্মরণ করিয়া আমরা আজিকার কাজে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিলাম না।

১৫ই অগষ্ট।—একটী ব্যাটারীর আশপাশ কেমন ভাবে তৈয়ার হইলে যুদ্ধের উপযোগী হইতে পারে, এক জন লেফ্‌টেনেণ্ট তাহা বুঝাইতেছিলেন ;—

যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে কিছুদিন ধরিয়া এগোন পিছান হয় নাই, সেখানে একটী ব্যাটারী চৌষট্টি গজ বিস্তৃত ; তাহাতে সাধারণতঃ চারিটী কামান থাকে, তাহা যদি ঠিক মত প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে চারিটী কামানের ত্রিশ জন লোকের জন্য চারিটী মাটীর নীচের ঘরের (Dugout) প্রয়োজন ; এই চারিটী হইবে কামানের সামনে। আর পিছনে Sub-officerএর জন্য একটী, C. O.র জন্য একটী, এবং Telephone ও wirelessএর জন্য একটী। যন্ত্রপাতির জন্য দুইটী কামানের সামনে ও দুইটী পিছনে, আর বারুদের জন্য দুই পাশে দুইটী ঘর। ব্যাটারীর ১০০ মিঃ পিছনে আর একটী Dugout—গ্যাস-উৎপাদনকারী গোলা, বিস্ফোরক, এবং Mine করিবার যন্ত্র সকল একটু দূরে রাখিবার জন্য। প্রথম কামানের নিকট আট গজ নীচু একটী সুড়ঙ্গ, চতুর্থ কামানের কাছেও ওই রকম আর একটী খাত, এবং যে সব Dugoutএর কথা বলা হইল, সেগুলি এবং ২য় ও ৩য় কামান ১ম ও ৪র্থ কামানের সহিত খাত কাটিয়া যোগ করা—এই খাত গমনাগমনের পথ ; গাছের ডাল পালার উপর একটু আধটু মাটী রাখিয়া পরিখার উপরে আড়াল দেওয়া হয়। ছটকা টুকরার আঘাত হইতে রক্ষা করিতে ইহা যথেষ্ট। উঁচু মাটীর স্তূপ কিংবা আত্মরক্ষার অন্য কিছু উপায় করা হয় না। কামানের কাছে ছোট Magazine মাটীর নীচে থাকে ; তাহার উপর একটী concrete করা ছাদ করিয়া দেওয়া

হয়। ব্যাটারীর তুই ধারে তুইটী রান্না ঘর, এবং সামনে ও পিছনে তুইটী শৌচাগার।

১৭ই অগষ্ট।—আমরা যে স্থানে ছিলাম, সে জায়গায় রাত তিনটা হইতে আবার যুদ্ধ বাধিয়াছে। ২৪mএর বদলে এ স্থানের নাম এখন ১৩০। উড়ো জাহাজের সাহায্য পাইয়া শত্রু যেখানে যেখানে আগাইয়া আসিয়াছে, সেখানে কামান দাগিলাম; পদাতি সৈন্যের আক্রমণের সুবিধা করিয়া দিতে উড়ো জাহাজ সদলে যুদ্ধ বাধাইয়া দিল; নামিবার সময় এই সব Aeroplane মাটীর উর্দ্ধে দশ গজ পর্য্যন্ত আসিয়া পদাতি সৈন্যসঙ্ঘ বিধ্বস্ত করিয়া আবার আকাশে উঠিল। সন্ধ্যা তখন ছয়টা। আমাদের বলা হইল, ব্যাটারী লইয়া যাইতে হইবে; গন্তব্য স্থান কেহ জানিল না। প্রলয়ের সময় মহেশ্বর সব সংহরণ করেন। আমাদের জিনিসপত্র আমরাও সেই ভাবে এক জায়গায় করিলাম। তার পর রাত দশটা পর্য্যন্ত খালি খাটে ঘুম। Hill ৩০৪এ সৈন্য সংখ্যা বাড়াইতে C. O. আমাদিগকে সেখানে যাইতে বলিয়া গেলেন। আমাদের ঘরকন্না সব পিঠের উপর লইয়া C. O.র নিকট বিদায় লইলাম; বন জঙ্গল ও কাঁটার উপর দিয়া চলিলাম, যাহাতে সোজা পথ ধরিয়া গন্তব্য স্থানে পঁহুছাই। আধ ঘণ্টার মধ্যে একটী বাগানের কাছে উপস্থিত— একটী ছোট কুটীর,—সৈন্যদের মদের দোকান, দেখিতে বেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। একটী শান্ত বালিকা যুদ্ধের বর্ব্বরতা উপেক্ষা করিয়া, সুন্দর মুখের মধুর হাসি হাসিয়া সৈন্যদিগকে এক এক গেলাস লাল আঙ্গুর-রস দিবার জন্য দোকান খুলিয়াছিল। সৈন্যদের কাছে বালিকার নামেই দোকানটী পরিচিত।

অসংখ্য Fuse ও Projecterএর আলোকে আকাশ উজ্জ্বল—অন্ধকার নাশ করিয়া একটীর পর আর একটী হাউই ছুটিল—আলোকমালায় গিরিগাত্র বিভাসিত—কালীপূজার রাত্রির দীপালোক মনে পড়িল। চাকা ও শিকলের শব্দ শোনা গেল। প্রথমে দেখি, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আটটী ঘোড়া আসিতেছে। ইহার পিছনে আর কতকগুলি। এমনই অসংখ্য ঘোড়া দেখা গেল। কামান সব ছিল তুইটী সৈন্য-শ্রেণীর মধ্যে, এবং যুদ্ধের সরঞ্জামের জিনিসগুলি ছিল পিছনে পিছনে। Shell, বারুদ, Detonater ও রসদখানার অন্যান্য যন্ত্রে গাড়ীগুলি পূর্ণ। আমাদের অস্ত্র শস্ত্র, জিনিসপত্র, সামনে যে সব গাড়ী ছিল, তাহাতে দেওয়া হইল। প্রত্যেক ব্যাটারীতে চারিটী করিয়া বড় বড়

কামান, ১১০ মিঃ মিঃ ও ১৫৫ মিঃ মিঃ করিয়া কামানের গর্ত্ত, আটটী গাড়ী লইয়া দুইটী ট্রেণ—সর্ব্বসমেত দলটী ( Battery ) পাঁচ শত গজ লম্বা। রাত্রি অন্ধকার—বেশ কুয়াশা রহিয়াছে; দেশলাই জ্বালিতে কিংবা ধূমপান করিতে আমাদের বারণ করিয়া দেওয়া হয়। কোনরূপ আলো জ্বালাও সম্ভবপর নয়। কারণ, কোনও যুদ্ধের গাড়ীতে আলো থাকে না। ঘোড়ার পিঠে, গরুর গাড়ীতে, কিংবা কামানের গাড়ীতে সৈন্যরা সকলেই কোনও রকমে সুবিধা করিয়া লইয়াছে। পাহাড়ের গা দিয়া নামিবার সময় গাঢ় নিস্তব্ধতার মধ্যে চাকার শব্দ, চেনের শব্দ হইতেছে—আমরা অতীতের কথা ভাবিলাম; আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও সে যুগে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। স্নিগ্ধ রজনীতে অসংখ্য গাড়ী লইয়া, কামান টানিতে বলদ লাগাইয়া দিয়া কিরূপে তাঁহারা রণ-যাত্রা করিয়াছিলেন, একে একে তাহা মনে পড়িল—মাড়বারের কথা, শিবাজীর গৌরবের দিন, তার সঙ্গে প্রতাপাদিত্য, সিরাজ, মীর কাশেম, একে একে সব স্মরণ হইল। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, রায় ও শাস্ত্রী ভারতের সে গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়াছেন,—তার এক একটী জ্বলন্ত পৃষ্ঠা কে আমার চক্ষুর সামনে খুলিয়া ধরিল। ঐতিহাসিক বীরদিগের স্মৃতি, অতীত যুগের কত সুন্দর মুখ স্মরণ করাইয়া দিল; ইঁহাদের জীবনের কথা বিচিত্র হইলেও বাস্তব। আঁকা বাঁকা ঘোরান পথ দিয়া যাইতে যাইতে কল্পনায় গা ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা হইলেও আমাদের থামিবার স্থান আসিল—কারণ, তখন ঘুমাইবার সময়। আমরা বড় একটা কল্পনাপ্রিয় নহি; এমন গা-ঢালার ধার ধারি না। বড় ঠাণ্ডা, পা কন্ কন্ করিয়া উঠিতেছে। লাইনের কাছাকাছি থাকিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইলাম। পথের ডান দিকে নূতন করিয়া সবুজ জাল টাঙ্গান—শত্রু যাহাতে আমাদের সহজে দেখিতে না পায়। সারা রাত ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলাম—কেবল তিন ঘণ্টা অন্তর ঘোড়াগুলিকে একটু বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইতেছে। প্রাতে চক্ষু মেলিয়া দেখি, প্রায় সব সৈন্য শীতের ভয়ে দ্রুত হাঁটিয়াছে—আর এখানে বাদাম, ওখানে আপেল পাড়িতেছে। আমরা চক্ষু খুলিলাম না, কারণ আমরা একটী গভীর বনের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। সেখানে দেখিবার কিছুই নাই।

বেলা আটটার সময় 'নিগ্রো গাঁ' বলিয়া একটী গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামের ফটকে দুইটী কিম্ভূতাকার আমেরিকান নিগ্রোর কাল ছবি ঝুলান—তাহারা আমাদের প্রথম সম্ভাষণ করিল। কফি, এক টুকরা রুটী ও কিছু

সার্দিন মাছ খাইয়া কাজে গেলাম। আধ মিঃ চওড়া রেলওয়ে দ্বারা স্থানটী আচ্ছন্ন। একটী যন্ত্র ( Drelick ) দিয়া কামান সব নামাইয়া, এবং গাড়ীগুলি খালি করিয়া দিয়া, এ সব জিনিস ট্রলিতে তুলিয়া দেওয়া হইল—গড়ানে পথ পাইয়া ট্রলি অবাধে রাস্তা ধরিয়া চলিল।

কুড়ি মিনিটের মধ্যে, যেখানে ব্যাটারী স্থাপিত হইবে, সেখানে পঁহুছিলাম। একটি উঁচু পথের ধারে বনের নিকট কাঠ ও পাথর দিয়া চারিটী চৌকা চাতাল করা হইল। দুই চাতালের মধ্যে ষোল গজ পরিমিত স্থানের ব্যবধান। ইহার সামনে গাছের ডালপালা পুঁতিয়া আড়াল দেওয়া হইল। Installed position যেমন সুখদায়ক ও নিরাপদ, ইহা তেমন হইল না। আগাইবার বা পিছাইবার সময় যেমন ভাবে ব্যাটারী সাজাইবার ব্যবস্থা করা হয়, ইহাও তেমনিতর এক ব্যবস্থা। কামান সব নামাইয়া এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। এক দিকে খাওয়া, শোয়া, আগুন করা, রান্না করা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইল, অপর দিকে Magazineএ গোলা ভরা, বারুদ আনা, যন্ত্রপাতি রাখিবার কুলঙ্গি খোঁড়া, চাকায় Caterpillar লাগান, ব্রেক ফিট করা, গনোমিটার বসাইবার জন্য horizontal রুল বসান ও টেলিফোন ফিট করা হইল। সকাল দশটার সময় Regaling আরম্ভ হইল। হঠাৎ জর্ম্মণ উড়ো জাহাজ আসিয়া পড়ায় আমাদের থামিতে হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীহারাধন বক্সী।

---

# বাঁশের চাষ।

যাঁহারা বাঁশের চাষ করেন, তাঁহারা বাঁশের কলম ( Cutting ) হইতেই ঝাড় জন্মাইয়া থাকেন।

কলম বর্ষার প্রারম্ভেই করা উচিত। ইহাতে সুবিধা এই যে, সারা বর্ষায় প্রচুরপরিমাণে জল পাইয়া উহা ভালরূপে লাগিয়া যায়।

কলম হইতে ঝাড় জন্মাইতে হইলে, বর্ষার প্রারম্ভে একটী পূর্ণায়তন বাঁশের ( Old shoot ) গোড়ার দিক হইতে ৪।৫ ফুট কাটিয়া লইয়া তাহার মূল ও তৎসংলগ্ন একটী মোটা মূল ( Rhizome ) খুব সাবধানে তুলিয়া লইতে হয়। তৎপরে সেই কর্ত্তিত অংশ যথাস্থানে রোপণ করিতে হয়। বৃষ্টির

দিনে এইরূপে কলম কাটিয়া রোপণ করাই বিধেয়। যে কয়েক দিন উক্ত কলমটী ভালরূপে লাগিয়া না যায়, বৃষ্টি না থাকিলে, সে কয়েক দিন উহাতে জল দিতে পারিলে আরও ভাল হয়। কলম লাগিয়া গেলে সেই অঙ্কুরোন্মুখ মোটা মূল হইতে নূতন ডগা বাহির হইবে।

বাঁশ আরও এক প্রকারে কলম করা যাইতে পারে।

'A cutting containing at least three nodes is cut from the lower end of a two years old culm, and placed standing in the ground with two nodes covered.'

দুই বৎসরের একটী বাঁশের ডগার নিম্নের দিক হইতে অন্ততঃ তিন গাঁট পর্য্যন্ত কাটিয়া লইয়া সেই কর্ত্তিত অংশের দুই গাঁট পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় রোপণ করিতে হইবে।

ইহাও বর্ষার মধ্যে করা উচিত। উপযুক্তপরিমাণ জল পাইয়া উক্ত রোপিত ডগার নিম্নের গাঁট হইতে ক্রমে অঙ্কুরের উদ্গম হইবে, এবং উপরের গাঁট হইতে ধীরে ধীরে ডাল পাতা জন্মিতে থাকিবে। (১)

বাঁশের কেবলমাত্র মোটা মূল ( Rhizome.) হইতে কলম হইতে পারে।

'Bamboos can also be raised from rhizome. A piece of rhizome with its shoot ( which may if necessary, be slightly lopped to diminish transpiration ) is separated from a young clump and planted horizontally about three inches below the ground in the spot required. New shoots will be sent up from the rhizome.'

বাঁশের একটী নূতন ঝাড় হইতে মোটা ফুলের সহিত একটী নূতন ডগা সাবধানে কাটিয়া আনিয়া, ইঞ্চি তিনেক মাটীর নীচে, উক্ত মোটা মূলটি সমান্তরাল ভাবে রাখিয়া, উহা রোপণ করিতে হইবে। এই সময়ে বাঁশের ডগাটীর ডাল পাতাগুলি ছাঁটিয়া দেওয়া ভাল। এরূপ করিবার একটী বিশেষ কারণও আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গাছের পাতা বায়ু হইতে অঙ্গারজান লইয়া থাকে। কিন্তু উহা অঙ্গারজান লইলেও, উহার অগ্রভাগ দ্বারা বৃক্ষ হইতে জলীয় অংশ ( Moisture ) নির্গত করিয়া দেয়। (২) কোনও চারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নাড়িয়া বুনিলে উহার মূলগুলি সদ্যঃ সদ্যঃ মাটী হইতে রস টানিয়া লইতে পারে না। স্থানান্তরিত করিবার ধাক্কাটী সাম্‌লাইয়া লইয়া চারা যখন

(১) 'New shoots are thrown out from the dormant buds and a crown of adventitious roots springs from the node underground.'

(২) Transpiration.

প্রকৃতিস্থ হয়, তখনই উহা মূল দ্বারা রস টানিতে পারে। কাজেই চারা স্থানান্তরিত করিলে পর, যত দিন উহা প্রকৃতিস্থ না হয়, তত দিন যদি উহার পত্র দ্বারা জলীয় অংশ বাহির হইয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে উহা নিতান্ত দুর্ব্বল হইবে, এবং অবস্থা-বিপর্য্যয়ে হয়ত বা প্রকৃতিস্থ নাও হইতে পারে। চারা প্রকৃতিস্থ হইতে না পারিলে বাঁচিবে না।

পত্র না থাকিলে চারার জলীয় অংশ আর এরূপ ভাবে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে মোটা মূল সহ বাঁশের গাছটী ঝাড় হইতে উঠাইয়া যখন অন্যত্র বোনা হইবে, তখন উহার ডাল পালা ছাঁটিয়া দিয়া পত্রাদি না রাখাই কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে উহার জলীয় ভাগ আর বাহির হইয়া যাইতে পারিবে না, এবং স্থানান্তরিত করিবার চোট্ সাম্‌লাইয়া লইয়া প্রকৃতিস্থ হওয়া পর্য্যন্ত উহা সরস থাকিবে। তার পর সেই মোটা মূলের সঞ্চিত খাদ্যপ্রভাবে ক্রমে উহা বাড়িতে থাকিবে।

যে স্থানে জল দাঁড়াইতে পারে না ( well drained ), সেরূপ স্থানে বাঁশ ভালরূপে জন্মিয়া থাকে। বাঁশ-বনে দেখা যায় যে, উচ্চ-ভূমিতে, পাহাড়ের উপর, কিংবা পাহাড়ের ঢালুতে পর্য্যন্তপরিমাণে বাঁশ জন্মিয়া থাকে। সেরূপ স্থানে ছোট ছোট স্রোতস্বতীর দুই ধারেও খুব বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিম্নভূমি কিংবা স্রোতস্বতীর কূলে, যেখানে জল দাঁড়ায়, এমন স্থানে বাঁশ হয় না।

বাঁশ জন্মাইয়া তাহার ঝাড়টীকে ঠিক মত রাখা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে ঝাড়ের মধ্যে বাঁশ ঠাসাঠাসি হইয়া উহা বাঁকা, ছোট ও একটীর গায়ে আর একটী লাগিয়া গিয়া খারাপ হইয়া যায়।

বাঁশের ঝাড় ক্রমশঃ বাহিরের দিকে বাড়িতে থাকিলেও, উহার ভিতরেও কিছু কিছু বাঁশ জন্মিতে থাকে। যে জাতীয় বাঁশের মোটা মূলগুলি ( Rhizome ) ছোট হয়, সেই সমস্ত বাঁশই ঝাড়ের ভিতরের দিকে বেশী পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। যে জায়গায় বাঁশ বোনা যায়, সে জায়গার মাটী যদি খুব শুষ্ক ও সারহীন হয়, তাহা হইলে সে জায়গার বাঁশগুলির মোটা মূল সাধারণতঃ ছোট হইয়া থাকে। প্রচুর খাদ্যাভাবই ইহার একমাত্র কারণ। কাজেই সে জায়গার বাঁশগুলি কেবলই ভিতরের দিকে ঠাসাঠাসি হইতে থাকিবে, এবং ঝাড় বাহিরের দিকে তেমন ছড়াইয়া ভাল হইবে না।

এরূপ স্থলে বাহিরের দিকে কিছু কিছু বাঁশ জন্মিলেও, তাহা ক্রমশঃ হেলিয়া

পড়িয়া ভিতরের দিকে চলিয়া যায়, এবং অপর একটী বাঁশের উপর পড়িয়া উহাদের সমস্ত ডালপালা একত্র জড়াইয়া গিয়া ঝাড়টীকেই ক্রমে খারাপ করিয়া ফেলে। ( ১ )

ঝাড়ে বাঁশ ঠাসাঠাসি হইলে তাহাতে আর ভাল বাঁশ জন্মে না। তখন সেই ঝাড়ের পাকা, বাঁকা বাঁশগুলি কাটিয়া ফেলিয়া ঝাড়টীকে পাতলা করিয়া দিতে হয়। মাটী শুষ্ক ও সারহীন হইলে এইরূপ ভাবে বাঁশ কাটিয়া ঝাড় পাত্‌লা করার নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে খাদ্যাভাব প্রযুক্ত সেখানকার ঝাড় একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ঝাড় ছোট হইলে বাঁশ কাটার পর তাহাতে মাটী ফেলান যাইতে পারে। বাঁশের গোড়ায় উপযুক্ত-পরিমাণে মাটী দিতে পারিলে বাঁশ বেশ ভাল হয়। ঝাড়ের এক পাশ হইতে প্রণালীর মতন করিয়া মাটী কাটিয়া লইলে, বর্ষার জলও সেই পথে ভালরূপে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতে পারে। ইহাতে বাঁশের গোড়ায় মাটী ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার জল নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবার সুবন্দোবস্ত হইয়া যায়।

বাঁশের চাষ খুব লাভজনক। ইহাতে সেরূপ কোনও খরচ নাই বলিলেই চলে। কিছু বেশী পরিমাণ জমীর উপর বাঁশ জন্মাইয়া, সেই জমী ২।৩ অংশে বিভক্ত করিয়া, এক এক অংশ হইতে এক এক বৎসর বাঁশ কাটিলে, বেশ লাভের সম্ভাবনা আছে।

ভালরূপ বাঁশ জন্মিলে, এক একর জমীতে প্রায় ৫০০০ ডগা পাওয়া যায়। অবশ্য বাঁশের প্রকারভেদে ইহার কম বেশী হইয়া থাকে। ৫০০০ বাঁশের মধ্যে অন্ততঃ ২০০০ কাটা যাইতে পারে। আজ কাল বাঁশের যেরূপ দাম, তাহাতে ২০০০ বাঁশে মন্দ লাভ হইবার কথা নহে। তার পর একরূপ বিনা খরচেই এই লাভটা পাওয়া যায়।

বনবিজ্ঞানবিদেরা ( ২ ) বাঁশ কাটা সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়মাবলী স্থির করিয়াছেন, তদনুসারে বাঁশ কাটিলে ঝাড়ের কিছুমাত্র অপকার না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উহা বৃদ্ধি পাইবে।

---

( ১ ) 'Even when the shoots are produced along the outside of the clump, they often tend to grow inwards towards the middle, and to get there entangled among the older culms ; this is due to the rhizome bending upwards which causes the stem growing out of its turned-up end to slope backwards towards the centre of the clump.'

( ১ ) Sylviculturists.

তাঁহারা বলেন, এক বৎসর কিংবা দুই বৎসর অন্তর ঝাড় হইতে বাঁশ কাটা উচিত। সেই জন্য বাঁশের ঝাড়টীকে দুই কিংবা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া উচিত। দুই বৎসর অন্তর বাঁশ কাটিতে হইলে, নিম্নলিখিত রূপে ঝাড়-টীকে ভাগ করিয়া লইতে হইবে।

প্রথম বৎসর ক অংশ হইতে, দ্বিতীয় বৎসর খ অংশ হইতে, এবং তৃতীয় বর্ষে গ অংশ হইতে বাঁশ কাটিতে হইবে। চতুর্থ বৎসরে ক অংশ পুনরায় বাঁশ কাটার উপযুক্ত হইবে। এইরূপে ৫ম বৎসরে খ এবং ৬ষ্ঠ বৎসরে গ অংশ হইতে যথাক্রমে বাঁশ কাটা যাইতে পারিবে। এই নিয়মে প্রত্যেক অংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর কাটা চলিবে, এবং সেই সময়ে উহাতে প্রচুরপরিমাণে কর্ত্তনোপযোগী বাঁশ পাওয়া যাইবে।

যে ঝাড়ের বাঁশ পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয়, সেই ঝাড় হইতে কখনও বাঁশ কাটা যাইতে পারে না। যাহাতে অন্ততঃ তিন বৎসর হইতে পূর্ণ মাপের বাঁশ জন্মি-তেছে, সেই ঝাড় হইতে বাঁশ কাটা যাইতে পারে। তিন বৎসরের না হইলে বাঁশ কখনও প্রকৃতপক্ষে কার্য্যোপযোগী হয় না। সময়ে সময়ে দুই বৎসর ও তিন বৎসরের বাঁশ চেনা কঠিন হইয়া পড়ে। সেই স্থানে দুই বৎসরের বাঁশ কাটা যাইবার আশঙ্কা-নিবারণের জন্য এক উপায় আছে। ঝাড়ে যে কয়েকটী এক বৎসরের নূতন ডগা আছে, তাহা গুণিয়া লইয়া, তাহার দ্বিগুণসংখ্যক পুরা-তন বাঁশ রাখিয়া, অবশিষ্ট বাঁশ কাটিলে, আর সেরূপ কোনও আশঙ্কা থাকে না। ঝাড়ে যদি ১০০টা প্রথম বৎসরের নূতন ডগা পাওয়া যায়, তাহা হইলে ২০০টা পুরাতন বাঁশ সেই ঝাড়ে রাখিয়া, আর সমস্তই কাটিয়া ফেলা যাইতে পারে।

যে বাঁশ বাঁকা কিংবা অন্য কোনও প্রকারে খারাপ হইয়া যায়, তাহা যে বৎসরেরই হউক না কেন, কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তবে এই কারণে যে কয়েকটী এক বৎসর কিংবা দুই বৎসরের বাঁশ কাটা যাইবে, তাহার সমানসংখ্যক পুরাতন বাঁশ অতিরিক্ত রাখিতে হইবে। তাহা হইলে ঝাড়ের আর কোনও লোকসান হইবে না।

ঝাড়ের মধ্য হইতে বাঁশ কাটাই উচিত। তাহা হইলে ঝাড়ের মধ্যে বাঁশ

ঠাসাঠাসি হইতে পারে না, এবং ঝাড়টীও ধীরে ধীরে চারি দিকে বাড়িতে থাকে।

বাঁশের গোড়া খুব উঁচু রাখিয়া কাটা বিধেয় নহে। (১) প্রথম গাঁটের ঠিক উপরিভাগেই কাটা উচিত। এরূপভাবে কাটিতে হইবে, যেন তাহার উপরে বাঁশ না থাকে। গাঁটের উপরে খানিকটা বাঁশ থাকিলে, বর্ষার জল সেই কাটা বাঁশের মধ্যে জমিয়া গাঁটটীকে পচাইয়া, ক্রমে সেই বাঁশের মোটা মূলটীকেও নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। তাহা হইলে সেই কর্ত্তিত বাঁশের সন্নিহিত মোটা মূল হইতে আর নূতন বাঁশের উদ্গম হইবে না। বাঁশ কাটিবার সময় কলম-কাটার ন্যায় তের্ছা করিয়া কাটাই বিধেয়। তাহা হইলে উহাতে জল জমিবার আশঙ্কা আরও কমিয়া যায়।

আমাদের দেশে গৃহস্থেরা অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে বাঁশ কাটে না। উহা কেবল কুসংস্কার বলিয়াই বোধ হয়। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন, হয় ত বা সেই সময়ে বাঁশের ভিতরে বেশী পরিমাণে রস ( Sap ) উৎপন্ন হয়, এবং সেই হেতু উহা কাটিলে তেমন কার্য্যোপযোগী হয় না। বায়ুমণ্ডলের শৈত্যভাব বাঁশের উপর যেরূপ ক্রিয়া করে, তাহাতে এ অনুমান একেবারে মিথ্যা নাও হইতে পারে।

বাঁশের ভিতরে যে রস থাকে, তাহা বহির্গত করিয়া দিতে পারিলে, উহাতে ঘুণ ধরিবার আশঙ্কা থাকে না। বাঁশকে যে সব পোকায় ধরিলে তাহাকে ঘুণে ধরা বলে, সেই সব পোকা উক্ত রসের মিষ্ট স্বাদে আকৃষ্ট হইয়া বাহিরের দিক্ হইতে বাঁশ কাটিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। সেই জন্য ঘুণে-ধরা বাঁশের মধ্যে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখা যায়। বাঁশ হইতে নিঃশেষ করিয়া রস বাহির করিয়া দিতে পারিলে, ঐ পোকাগুলির উহাতে আকৃষ্ট হইবার আর কোনও কারণ থাকে না। এরূপ করিতে হইলে বাঁশ-গুলি কাটার অব্যবহিত পরেই উহাদিগকে জলে ফেলিতে হয়, এবং প্রায় এক পক্ষ কাল উহাদিগকে জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। ইহাতে বাঁশের সমস্ত রস মূলের সহিত মিশিয়া বাহির হইয়া যায়। তৎপরে বাঁশগুলিকে

(১) ইহাতে মতভেদ আছে।

'It is customary to cut the culms as low as possible in order to prevent conglation. Until further experiments are carried out, however, it is impossible to say if this will not be found to do more harm than good, in causing the drying up of the rhizomes.'

উঠাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইলেই উহাতে আর ঘুণ ধরিবার আশঙ্কা থাকিবে না। বাঁশকে প্রথমে জলে ডুবাইয়া না রাখিয়া শুষ্ক করিলে উহার রস বাহির হইয়া যাইতে পারে না। ইহাতে কেবলমাত্র রসের জলীয় অংশ-টুকুই বাহির হইয়া যাইবে।

বাঁশগুলিকে জল হইতে উঠাইয়া আনিয়া আগুনের ধূমের উপর রাখিয়া শুষ্ক করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। এইরূপ বাঁশ দ্বারা কাজ করিলে তাহা পাঁচ সাত বৎসর টিকিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সেন।

---

# রায় পরিবার।

৮

মা যত চেষ্টাই কেন করুন না, ছেলেকে দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে গৌরীকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, ছেলেকে দেখিয়া ফিরিবার পর আর সে দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেন না। ঘটনার কুজ্ঝটিকায় আমাদের দৃষ্ট পদার্থের রূপান্তর হয়—মারও তাহাই হইল। গৌরী তাঁহার পুত্রের দেশত্যাগী—গৃহত্যাগী হইবার কারণ। এ অবস্থায় গৌরীর প্রতি তাঁহার স্নেহ সহানুভূতিতে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু অবিকৃত থাকিতে পারে না। তিনি স্বভাবতঃ স্নেহশীলা ও মৃদু—বিশেষ সুশীল তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিল, যেন গৌরীর কোনরূপ অযত্ন না হয়—কাহারও কোনও ব্যবহারে তাহার প্রতি অবহেলা প্রকাশিত না হয়, সে যদি তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতে না পারিয়া থাকে, তবে তাহাতে তাহার প্রতি অপরের কর্ত্তব্য বিচলিত হইতে পারে না। কিন্তু মার ব্যবহারে কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব আত্মপ্রকাশ না করিলেও, সে ব্যবহারের পরিবর্ত্তন গৌরী সহজেই অনুভব করিতে পারিল। বিশেষ তাঁহার আক্ষেপোক্তি প্রভৃতি তাহাকে বিশেষ ব্যথিত করিতে লাগিল।

এই নূতন অবস্থায় সে তাহার মাতার কাছে বিশেষ সান্ত্বনা পাইল না। তিনি তখনও আপনার গর্ব্বের শিখরে সমাসীন থাকিয়া কেবলই সুশীলের দোষ দেখিতেছিলেন। কত বড় বেদনার তাড়নায় সে যে আপনার জীবন ব্যর্থ করিতে বসিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে চাহিলেন না—কাজেই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখে সুশীলের নিন্দাবাদ গৌরীর ভাল লাগিত না।

তাহার ভালবাসা—বিরহের ব্যবধানে ও হারাইবার আশঙ্কায় যে প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সে স্বামীর দোষও গুণ বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছিল। এ বিষয়ে বিধাত্রী দেবীর শিক্ষা বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। তিনি গৌরীকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সুশীলের যে ব্যবহার সে দোষ মনে করিয়াছিল—সে গুণেরই নামান্তর। গৌরী তাহা বুঝিয়াছিল। তাই মার মুখে স্বামীর নিন্দা তাহার ভাল লাগিত না—সেই আলোচনার ভয়ে সে বড় বাপের বাড়ী যাইতে চাহিত না। তাহার মাতা আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, মেয়েও তাঁহাকে পর ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সে যাহাই কেন ভাবুক না—'মাসী বল, পিসী বল—মায়ের বাড়া নয়।' এই কথার মধ্যে শাশুড়ীর প্রতি তাঁহার সঞ্চিত অসন্তোষের ইঙ্গিত বুঝিয়া গৌরী আরও ব্যথা পাইত। কেন না, এই অবস্থায় সে যে কিছু সান্ত্বনা পাইত, সে পিতামহীর কাছে—আর সুশীলের দিদির কাছে। পিতামহীর পত্রের ছত্রে ছত্রে সে তাহার জন্য তাঁহার বেদনার আর্ত্তনাদ বুঝিতে পারিত।

তবুও পিতামহী দূরে। দিদি নিকটে। বৈধব্যবেদনা দিদির হৃদয়ে সহানুভূতির মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল—হারাইয়া তিনি হারাইবার আশঙ্কায় কাতর হইতেন। কেহ কেহ বলেন যে, স্ত্রীলোকের ভালবাসার একটা পরিমাণ থাকে—তাই যখন সন্তানের প্রতি স্নেহে তাহার অধিকাংশ প্রযুক্ত হইয়া যায়, তখন স্বামীর জন্য আর অধিক অবশিষ্ট থাকে না—তখন স্বামী স্ত্রীর জীবনের কেন্দ্র হইতে ক্রমে পরিধিরেখায় স্থানান্তরিত হয়েন। দিদির কাছে কিন্তু স্বামী পুত্রকন্যার অধিক ছিলেন—তিনি ইহকাল—পরকাল—হৃদয়সর্ব্বস্ব—জীবনসর্ব্বস্ব ছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া দিদির পক্ষে জীবন কেবল কর্ত্তব্যের ভারমাত্র হইয়াছিল। তাই গৌরীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি ব্যথা পাইতেন—গৌরীর যৌবনলাবণ্যমধুর মুখে বিষাদের ছায়াপাত দেখিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেন। তাঁহার প্রবল সহানুভূতির আরও একটা কারণ ছিল। তিনি এই ব্যাপারের কারণ-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গৌরী তাঁহাকে সব কথা বলে নাই। তবুও তিনি বুঝিয়াছিলেন, অতি সামান্য কারণে এত বড় ব্যাপার ঘটিয়াছে—আর সুধীরকে বিলাতে পাঠান হইতেই ইহার সূত্রপাত। তাই তিনি আপনাকেও কেমন একটু অপরাধী মনে করিতেন।

দিদি অনেক ভাবিলেন, কিন্তু ভাবিয়া কোনও উপায় স্থির করিতে

পারিলেন না। শেষে এক দিন তিনি বলিলেন, 'গৌরী, স্বামীর কাছে স্ত্রীর ত পদে পদেই অপরাধ—স্বামী সব অপরাধ ভুলিয়া থাকেন বলিয়াই আমরা স্বামীর ভালবাসা পাই—সে স্বামীর গুণে। তুমি সুশীলকে পত্র লেখ—আপনার ভুল স্বীকার কর। সে রাগ করিয়া থাকিতে পারিবে না।' গৌরী সব শুনিল; ভুল স্বীকার করিতেও তাহার আগ্রহ, কিন্তু সে ত কখনও পত্র লিখে নাই! দিদি তাহার অবস্থা বুঝিলেন। তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন।

তবুও নিশীথে গৌরী পত্র লিখিতে বসিল—কত বার লিখিল, কোনও পত্রই মনের মত হইল না—কোনও পত্রেই তাহার মনের কথা ফুটিয়া উঠিল না। সে পত্র লিখিল, আর ছিঁড়িল। সকালে দিদি আসিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিতেই সে কাঁদিয়া ফেলিল। দিদি মেঝের উপর ছিন্ন পত্রের স্তূপ দেখিলেন—গৌরীর জাগরণচিহ্নাঙ্কিত নয়নে অশ্রুধারা দেখিলেন—আপনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না।

মা, দিদি, গৌরী—কেহই ভাবিয়া কোনও উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

বিধাত্রী দেবীরও ভাবনার অন্ত ছিল না। তিনি পূর্ব্বেই ভয় করিয়াছিলেন, সুশীলের স্থানান্তর-গমনের প্রকৃত কারণ তাহার মাতার অজ্ঞাত থাকিবে না। তখন কি হইবে, ভাবিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়াছিলেন। গৌরীর পত্রে তিনি যখন তাহার শ্বাশুড়ীর প্রত্যাবর্ত্তনের কথা জানিলেন, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ করিয়া সুশীলের কর্ম্মস্থলে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে সুশীলকে তাঁহার গমন-সংবাদ দিয়াছিলেন; যাইয়া দেখিলেন, সুশীল চলিয়া গিয়াছে—তাঁহার জন্য পত্র রাখিয়া গিয়াছে—'মা আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে কাঁদাইয়া ফিরাইয়াছি। সে আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাঁহার বেদনা দ্বিগুণ হইয়া আমার বুকে বাজিয়াছে। আজ আপনাকে ফিরাইতেছি। ইহাও আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু উপায়ান্তরবিহীনের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি স্নেহকে বড় ভয় করি—পাছে তাহার কাছে পরাভব স্বীকার করিতে হয়, সেই ভয়ে আমি পলায়ন করিলাম।'

বিধাত্রী দেবী প্রমাদ গণিলেন—এত দিন পরিবার হইতে দূরে নিঃসঙ্গ প্রবাসের অজস্র অসুবিধাও সুশীলের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল না! সে যখন ক্রমে এই জীবনে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে—যখন নূতন আদর্শই তাহাকে আকৃষ্ট করিতে থাকিবে, তখন তাহাকে ফিরাইবার যে আর কোনও উপায়ই

থাকিবে না! ভালবাসার প্রবাহ-বেগ একবার প্রতিহত করিতে পারিলে তাহাকে যে পথে ইচ্ছা লইয়া যাওয়া সম্ভব হয়।

এমনই ভাবে দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস কাটিতে লাগিল। দুইটী সংসারে দুর্ভাবনার নিবিড় ছায়া দিন দিন প্রগাঢ় হইতে লাগিল; সে ছায়া অপসৃত করিবার কোনও উপায় কেহ করিতে পারিলেন না।

এই সময়ের মধ্যে সুশীলের পরিবারে দুইটি ঘটনা পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগকে ব্যাপৃত রাখিল। প্রথম—সুশীলের জ্যেষ্ঠের প্রথম সন্তানের আবির্ভাব; দ্বিতীয়—তাহার তিন মাস পরে সাফল্য লাভ করিয়া সুধীরের প্রত্যাবর্তন। পরিবারে এই নূতন শিশুর আবির্ভাব মাকে ব্যস্ত রাখিল। সুশীল তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান—এত দিন পরে গৃহে নূতন শিশু আসিল। বিধবা হইয়া তিনি যে দুই পুত্রকে লইয়া সংসারী হইয়াছিলেন—তাহাদেরই এক জন নূতন সংসার পাতাইল। কিন্তু আর এক জন? মা অশ্রুমোচন করিলেন। দূরগত পুত্রের জন্য তাঁহার দারুণ বেদনা যেন আরও দারুণ হইয়া উঠিল। তিনি কন্যাকে বলিলেন, 'মা, সুশীলকে সংসারী করিতে পারিলাম না!' কন্যাও অশ্রুমোচন করিলেন—উত্তর দিবার কিছুই নাই। গৃহে আনন্দোৎসবের মধ্যে উভয়েরই হৃদয় সুশীলের জন্য বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। গৃহে আরও এক জন অহরহঃ বক্ষে বেদনা লইয়া দিনযাপন করিতে লাগিল—সে গৌরী। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার জীবনের ব্যর্থতা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল! তাহার অভাবের পরিমাণ ততই অধিক বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। তাহার ভালবাসা ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া স্বামীকে দেবতার আসনে বসাইয়া সার্থকতা-লাভের প্রয়াস পাইত বটে, কিন্তু তবু মানবের—যৌবনের ভালবাসার উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হইত, তখন সে যেন আর আপনাকে শান্ত করিতে পারিত না। ভালবাসা যে ভক্তিতে পরিণত হয়—সে ঘটনার বা সাধনার শৈত্যে। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক ব্যাকুল বাসনার—আশা-তৃষ্ণার উত্তাপে যখন সেই ভক্তি আবার বিগলিত হইয়া ভালবাসার খাতে প্রবাহিত হয়, তখন সে প্রবাহের বেগ কে রোধ করিতে পারে?

সুধীর ফিরিয়া আসিল। সে ফিরিবার পথে সুশীলের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল—কিন্তু সুশীলের গৃহত্যাগের কারণ অনুমান করিতে পারে নাই। সে ফিরিবার পর আর একটা বিষয়ে সকলের দৃষ্টি পড়িল—তাহার বিবাহ। সুধীরের পিতা বড় বন্ধুবৎসল ছিলেন। তিনি তাঁহার এক বন্ধুর কন্যার সঙ্গে

সুধীরের বিবাহ দিবেন, বলিয়া রাখিয়াছিলেন—মেয়েটিকে বরাবরই 'মা লক্ষ্মী' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কন্যার পিতা সে বিষয়ে সুধীরের মাতার মত জানিতে চাহিয়াছিলেন—মেয়ের বাপের পক্ষে পাকা কথা নহিলে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নহে। সুধীরের মাতা সে বিষয়ে আপনার মাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন। মা বলিয়াছিলেন, 'ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ—শেষে ছেলের মত চাহি, সে কথাও ভাবিয়া দেখ। আমাদের যে কপাল—শেষে যদি কথা দিয়া কথা রাখিতে না পারি?' মেয়ের কিন্তু সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না—স্বামী যে কথা দিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না; তবে ছেলেকে একবার জিজ্ঞাসা করা ভাল। তিনি সুধীরকে ডাকিয়া সব কথা বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। সব শুনিয়া সুধীর বলিয়াছিল, 'মা, আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? বাবা যে কথা দিয়া গিয়াছেন, সে কথা রাখা যদি তোমার কর্ত্তব্য হয়—তবে তাহা কি আমারই কর্ত্তব্য নহে? তাঁহারা আমাদের পরিবর্ত্তিত অবস্থা বিচার করিয়া দেখুন। দেখিয়া তাঁহারা যদি তাঁহাদের কথায় অবিচলিত থাকেন, আমরা বাবার কথার অন্যথা করিব না।' সুধীরের মাতা কন্যাপক্ষকে সেই কথাই বলিয়াছিলেন। পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা বিচার করিয়াও কন্যার পিতা সেই সম্বন্ধের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। কেন না, সুধীরের মত ছেলে পাওয়া সহজ নহে—বিশেষ সুধীরের মাতাকে তাঁহারা জানিতেন, মেয়ের তেমন শ্বাশুড়ী পাইবার প্রলোভনও সংবরণ করা তাঁহারা দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। সুধীর ফিরিলে তাঁহারা বিবাহের দিন স্থির করিতে বলিলেন।

বিবাহে সকলেরই মত ছিল। সুশীলের জ্যেষ্ঠ এখন বাড়ীর কর্ত্তা। তিনি বলিলেন, 'এ বিষয়ে আর কথা কি? মেয়ের পক্ষের ব্যস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। আমি সুশীলকে পত্র লিখি।' দাদার পত্র পাইয়াই সুশীল উত্তর দিল, 'মেয়ের পক্ষকে অকারণে আর বিলম্ব করিতে বলা ভাল দেখায় না! দিন স্থির করিয়া ফেলুন।'

বিবাহের উদ্যোগ—আয়োজন হইতে লাগিল। মার ও দিদির বিশ্বাস ছিল, সুধীরের বিবাহে সুশীল না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। তবুও দিদি তাহাকে পত্র লিখিলেন—'ভাই, তোমাকে আর কি লিখিব? তুমি আসিয়া না দাঁড়াইলে এ বিবাহে আমার কোনও আনন্দই হইবে না। আমার এই কথা মনে করিয়া—তোমার পিতৃহীন ভাগিনেয়ের কথা ভাবিয়া, তুমি আসিবে। আমাকে এ আশায় হতাশ করিও না।'

দিদির পত্র পাইয়া সুশীল বিচলিত হইল। এ আহ্বান সে কেমন করিয়া অবহেলা করিবে? কর্ত্তব্য যে তাহাকে যাইতেই বলিতেছে। সে না যাইলে দিদি চক্ষুর জল ফেলিবেন ভাবিয়া তাহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। যুক্তি তর্কের পাষাণ দিয়া স্নেহ ভালবাসার উৎস-মুখ রুদ্ধ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—বুঝি সে পরাভব মানিল। তাহার পর সে ভাবিল—জীবনের যে অধ্যায়ের শেষ হইয়াছে, তাহা আবার আরম্ভ করিব কেমন করিয়া? সে আপনার প্রতি করুণায় আপনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

সুশীল স্থির করিল বটে, সে সুধীরের বিবাহে যাইবে না, কিন্তু সে কথা দিদিকে লিখিতে সাহস করিল না।

বিবাহের দিন পর্য্যন্ত দিদির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সুশীল তাঁহার অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারিবে না। সে দিন তাঁহার সে আশা নির্ম্মূল হইল। তিনি দুঃখ সহ্য করিতে শিখিয়াছিলেন—সে কথা ব্যক্ত করিলেন না। কিন্তু যখন বর যাত্রা করিল, তখন তাঁহার সমস্ত বেদনার সঙ্গে এই বেদনাও তাঁহাকে বিচলিত করিল। এই উৎসবের মধ্যে তাঁহার স্বামি-বিয়োগ-বেদনা যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। বর যাত্রা করিবার পর তিনি মাকে বলিলেন, 'সুশীল আসিল না!' কন্যা কি বেদনা বক্ষে লইয়া কাজ করিতেছিল, মা তাহা অন্তরে বেদনায় অনুভব করিতেছিলেন। তাই আজ সুশীলের ব্যবহারে তাঁহার মনে একটু অভিমানের আবির্ভাব হইল। তিনি বলিলেন, 'আমরা তাহার কাছে কি অপরাধ করিয়াছি যে, সে তোর ব্যথাও বুঝিল না?' দিদির মনে কিন্তু অভিমানের স্থান ছিল না। তিনি বলিলেন, 'মা সে-ই কি ইহাতে ব্যথা পাইতেছে না?'

গৌরী তথায় ছিল। মাতা পুত্রীর এই বেদনা যেন বৃশ্চিক-দংশন-যাতনার মত তাহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। সব অপরাধ তাহার। সে কেমন করিয়া সংসার হইতে এ বেদনার চিহ্ন মুছিয়া দিবে? তাহার ব্যর্থ জীবন স্বামীর ভালবাসায় সার্থক করিবার আশা তাহার পক্ষে দিন দিন দুরাশা মনে হইতেছিল। কিন্তু দিদি ত সত্যই বলিয়াছেন—'সেও কি ব্যথা পাইতেছে না? সে-ই ত সে বেদনার কারণ। সে তাহার ব্যবহারে কেবল আপনার জীবনই ব্যর্থ করে নাই, স্বামীর জীবনও ব্যর্থ ও বেদনাময় করিয়াছে।' গৌরী কাঁদিয়া ফেলিল। দিদি তাহা লক্ষ্য করিলেন—তাহার জন্য তাঁহার হৃদয়ে সমবেদনা প্রবল হইয়া উঠিল।

ও দিকে দিদি যাহা মনে করিয়াছিলেন, সুশীলের তাহাই হইল। সুধীরের বিবাহের দিন সে কোনও কাজেই মন দিতে পারিল না। সে আদালতে গেল না —সমস্ত দিন আপনার বক্ষে বেদনা লইয়া যাপন করিল—অপরাহ্নে পাছে কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসেন বলিয়া, নদীর কূলে চলিয়া গেল—সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিল।

তাহার পর সে দাদার পত্র পাইল—বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু সে না আসায় মা ও দিদি বড় দুঃখিত হইয়াছেন। দিদির কোনও পত্র সে পাইল না। দিদি যদি তাহাকে তিরস্কার করিয়া পত্র লিখিতেন—তাহা হইলে ভাল হইত; কিন্তু তিনি যে তাহাকে কোনও পত্র লিখিলেন না—তাহাতে সে তাঁহার হতাশা বেদনার পরিমাণ বুঝিয়া কষ্ট পাইল। আপনার অবস্থায় আপনার উপর তাহার বিরক্তি ও করুণা জন্মিতে লাগিল। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল, স্নেহ ভালবাসার নির্দ্দিষ্ট সরল পথ ত্যাগ করিয়া —বুদ্ধি-বিবেচনা-দর্শিত বক্র পন্থা অবলম্বন করিয়া সে ভুল করে নাই ত? কে বলিবে?

সুশীল দাদাকে লিখিল, 'দিদির কথা না রাখিয়া অপরাধ করিয়াছি— তাঁহাকে আর পত্র লিখিতেও আমার সাহসে কুলাইতেছে না।' দাদা কেবল লিখিলেন—'দিদিকে তোমার কথা পড়িয়া শুনাইয়াছি।' কিন্তু দিদি শুনিয়া কিছু বলিয়াছেন কি না, সুশীল জানিতে পারিল না।

দুই মাস দিদির কথা যখন তখন সুশীলের মনে হইতে লাগিল। তাহার পর সে সুধীরের পত্র পাইল—সে আসিতেছে! সুধীরের আগমনের কোনও বিশেষ কারণ আছে কি না, সুশীল তাহার আলোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু আলোচনার বিশেষ সময় ছিল না—কারণ পর দিনই সুধীর আসিবে।

সুশীল ভাগিনেয়কে আনিবার জন্য ষ্টেশনে গেল। সুধীর মনে করিয়াছিল, মামা তাহার জন্য ষ্টেশনে আসিবেন—সে কামরার জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া ছিল—সুশীলকে দেখিতে পাইয়া ডাকিল—'ছোট মামা!' সুশীল যাইয়া কামরার দ্বার মুক্ত করিল—সুধীর নামিয়া আসিল। সুশীলের ভৃত্য সঙ্গে ছিল—সে জিনিস নামাইতে কামরায় উঠিল। জিনিসের মধ্যে একটা বড় বাক্স। সেটা নামান হইলে সুধীর হাসিয়া বলিল, 'আরও একটা জিনিস আছে।' সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায়?' 'এই যে' বলিয়া সুধীর কামরায় প্রবেশ করিল।

সুধীরের সঙ্গে নামিয়া আসিয়া এক কিশোরী সুশীলকে প্রণাম করিল। সুশীল বিস্মিতনেত্রে ভাগিনেয়ের দিকে চাহিলে সুধীর হাসিয়া বলিল, 'মা বলিলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—তোর বিবাহে সুশীল আসিবে। সে আমার সে বিশ্বাস চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। আমি আর তাহাকে কখনও কিছু বলিব না। তবে তোর কর্ত্তব্য—তুই তাহাকে বৌ দেখাইয়া আন।'

সুশীল সস্নেহে কিশোরীর মস্তকে করতল স্থাপিত করিল; বলিল, 'তাই ত মা, ছেলেকে দেখিতে আসিয়াছ! বড় দুষ্ট ছেলে—না? কিন্তু কথায় বলে—"কুপুত্র যদিও হয়—কুমাতা কখনও নয়।" সে কথা ঠিক।' তাহার পর সে সুধীরকে বলিল, 'আমাকে একটু লিখিতে হয়! মার যে বড় কষ্ট হইবে।' সুধীর বলিল, 'লিখিলে কি আপনি রাজী হইতেন?'

সুশীল সুধীরকে ও তাহার বধূকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বলিল, 'বাসায় যাও। আমি একটু ঘুরিয়া এখনই যাইতেছি।'

একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া সুশীল সহরে গেল, এবং একখানি মূল্যবান অলঙ্কার কিনিয়া লইয়া গৃহে ফিরিল। সে ভাগিনেয়-বধূকে ডাকিয়া অলঙ্কার দিল। সুধীর বলিল, 'এই জন্য বুঝি ঘুরিয়া আসিলেন?' সুশীল উত্তর দিল, 'তোর যেমন বুদ্ধি! শুধু হাতে কি বৌ দেখিতে আছে। দেড় বৎসর বিলাতে থাকিয়া তুই যে একেবারে মোচাকে "কলার ফুল" বলিতে শিখিয়াছিস!'

তাহার পর সুশীল বধূকে বলিল, 'মা, আমার এ তাম্বুতে বাস। মা একবার আসিয়াছিলেন—তাঁহাকে সব গুছাইয়া লইতে হইয়াছিল। তুমি আসিয়াছ—তোমাকেও তাহাই করিতে হইবে। তবে বিরক্ত হইতে পারিবে না—এ সব ছেলের উপর স্নেহের জন্য মার শাস্তি।' প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সে-ই সব গুছাইয়া দিল, এবং যত্নের আতিশয্যে বধূকে প্লাবিত করিয়া দিল।

সেই দিন অপরাহ্নেই সুধীর তাহার সঙ্গে আসল কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। এইবার দিদি তাঁহার গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহেন। সুধীর বলিল, 'এখন পশার করাই কঠিন; কেন না—গলিতে গলিতে ডাক্তার। কিন্তু পশার হইলে সে পাড়া ছাড়িয়া যাইলে ক্ষতি অনিবার্য্য। তাই আমি একেবারে বাড়ীতেই বসিতে চাহি।' উভয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। শেষে সুশীল বলিল, 'তুই যাহাই কেন বলিস না, আমি তোর কথায় রাজী হইতে পারিব না। দিদি চলিয়া গেলে মার বড় কষ্ট হইবে। সেই যখন

কেবল আমরা দুই ভাই আর মা বাড়ীতে ছিলাম, তেমনই হইবে। দাদার ছেলেকে লইয়া মা ব্যস্ত হইলেও না হয় হইত। দাদা লিখিয়াছেন—সে তাহার পিসীর কোল দখল করিয়াছে। এখন তোর যাওয়া হইবে না। এ যুক্তি নহে—তর্ক নহে, ইহাই আমার মনের কথা।'

তাহার পর সুশীল মার কথা—দিদির কথা—সংসারের কত কথা জিজ্ঞাসা করিল!

সুধীর দুই দিন পরে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিল। সুশীল বলিল, 'তাহাও কি কখন হয়! তোর কি—তুই সাত সমুদ্র পার হইয়াছিস, তোর সব সহ্য হয়। মার যে কষ্ট হইবে—আরও দুই দিন বিশ্রাম করিয়া পরে যাইবার কথা।' সে আপনি সঙ্গে যাইয়া ভাগিনেয়-বধূকে সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইল। আর বাড়ীর সকলের জন্য কত জিনিসই কিনিতে লাগিল! সুধীর বলিল, 'আপনি কি সহরের সব দোকান উজাড় করিবেন?'

দুই দিনের পর দুই দিন—তাহার পর আরও দুই দিন গেল। তখন সুশীল আর সুধীরকে রাখিতে পারিল না।

ভাগিনেয়কে ও ভাগিনেয়-বধূকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া সুশীল যখন 'সুখহীন ভবনে' ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মনে তাহার দূরস্থ পরিবারের চিত্র কি মনোরম বর্ণেই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল! সে কি কেবল দূরত্বের ব্যবধান-হেতু? না—তাহার তৃষ্ণা—তাহার বাসনা বিচিত্র বর্ণলেপে সে চিত্র চিত্তাকর্ষক করিতে লাগিল? কে বলিবে? কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল—গত দুই বৎসরের জীবন যদি সত্য সত্যই স্বপ্নমাত্র হইত! যদি সে জাগিয়া দেখিত, দুই বৎসর পূর্ব্বে সে যে স্থানে ছিল, এখনও সেই স্থানেই আছে! মার সেই স্নেহ—দিদির সেই ভালবাসা—ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীদিগের প্রতি সেই স্নেহ! আর—!

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

# আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।*

রামেন্দ্রবাবু যে সত্যসত্যই আমাদের ছাড়িয়া অন্য লোকে চলিয়া গিয়াছেন, ইহা এখনও বিশ্বাস হয় না। এই সে দিন রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও তিনি কত রকম বিষয়ের আলোচনা করিলেন! এখনও সর্ব্বদা মনে হয়, যেন সেই শান্ত সৌম্য মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া গভীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহের সরল ব্যাখ্যা শুনিতেছি। বাস্তবিক, কতকগুলি লোকের এমন একটা অমরতা, এমন একটা অবিনশ্বরতা থাকে যে, মৃত্যু যে তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে, ইহা কিছুতেই মনে হয় না। ত্রিবেদী মহাশয় এইরূপ লোক ছিলেন। অথচ তাঁহার দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। আমি ত তাঁহাকে গত এগার বৎসরের মধ্যে কখনও পূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে দেখি নাই। তাঁহার চোখের দীপ্তিতে ও হাসিতে এমন একটা অজর অমর ভাব ছিল, যাহা দেহের সহস্র দুর্ব্বলতা ভেদ করিয়া নিজকে প্রকাশ করিত। রামেন্দ্র-বাবুর সমস্তটাই দেহী ছিল, দেহের অংশটা দেহীর মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার দেহ শীঘ্রই কাজে ইস্তফা দিল।

তাঁহার হাসির কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। বাস্তবিক এরূপ হাসি আমার জীবনে আর কাহারও কখনও দেখি নাই। সকল প্রকার বৈষম্য, সকল প্রকার সন্দেহ, তাঁহার হাসির সাম্‌নে পলাইয়া যাইত। একবার মনে পড়ে, কতকগুলি নবীন সাহিত্যিক 'হিতবাদী' পত্রে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় ত্রিবেদী মহাশয়ের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করিয়াছিলেন। আমি ত্রিবেদী মহাশয়কে এ সমালোচনা দেখাইলে তিনি কেবলই হাসিতে লাগিলেন। সে হাসিতে যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, বাক্যের দ্বারা তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। সে হাসি সমালোচকের তীব্র প্রতিবাদকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছিল। সে হাসি স্পষ্টই সকলকে অনুভব করাইয়া দিয়াছিল যে, তুচ্ছ জগতের প্রশংসা বা নিন্দার কত উর্দ্ধে তাঁহার চিত্ত ভ্রমণ করিত। সে রাজ্যে পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর দ্বন্দ্ব কোলাহল নাই, সে রাজ্যে বিশুদ্ধ মৈত্রীভাব ও সার্ব্বজনীন প্রীতি ভিন্ন আর কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না। কেবল হাসিতে নহে, ত্রিবেদী মহাশয়ের

---

* বিগত ১০ই আষাঢ় সাউথ সাবার্ব্বান স্কুলের হলে ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

সকল ক্রিয়াকলাপে এইরূপ একটা অশরীরী লোকের আভাস পাওয়া যাইত। আমার বেশ মনে পড়ে, আজ দুই বৎসর হইবে, সাহিত্যপরিষদের একটী অধিবেশনে ভীষণ বাক্‌বিতণ্ডা হইবার পর এক দল লোক সক্রোধে পরিষৎ-মন্দির হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ত্রিবেদী মহাশয় কিন্তু ইহাতে একটুও বিচলিত হন নাই। তিনি যে নিত্যবুদ্ধশুদ্ধমুক্ত চৈতন্যের উপাসক ছিলেন, সেই চৈতন্যের ন্যায় তিনিও নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্পভাবে অবস্থান করিলেন। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলে কিছু যে সে দিন ঘটিয়াছে, তাহা একেবারেই বোধ হইতেছিল না।

তাঁহার দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলেও মনের জোর খুব বেশী ছিল। তাঁহার মত তিনি হঠাৎ ব্যক্ত করিতেন না, কিন্তু যখন করিতেন, তখন খুব দৃঢ়তার সহিত করিতেন, এবং খুব দৃঢ়তার সহিত তাঁহার মতকে পোষণ করিতেন। কিন্তু ইহা দ্বারা আমার বলা উদ্দেশ্য নহে যে, একগুঁয়েভাবে তিনি কোনও মতকে ধরিয়া থাকিতেন। বয়সের ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত তাঁহার মতেরও ক্রমিক পরিবর্ত্তন ও পুষ্টি ঘটিয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। দেহ যত দিন সজীব থাকে, তত দিন যেমন বাহিরের পরিবর্ত্তনের সহিত নিজের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে, সেইরূপ মানুষের বুদ্ধিও যত দিন সজীব থাকে, তত দিন তাহাও বহির্জগতের ঘাতপ্রতিঘাতের সহিত নিজের সামঞ্জস্য বজায় রাখে। ত্রিবেদী মহাশয়ের মন নূতন সত্য গ্রহণ ও তাহাকে আয়ত্ত করিতে অসাধারণ পটু ছিল। আমার নিকট তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন যে, ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ কয় বৎসর অসাধারণ যত্নের সহিত বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়নের ফল আমরা তাঁহার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ, কর্ম্মকথা, বিচিত্র প্রসঙ্গ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত প্রবন্ধাবলীতে দেখিতে পাই।

রামেন্দ্রবাবু সম্পূর্ণরূপে নিরহঙ্কার ছিলেন। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া থাকিতেন। কখনও তাঁহার মুখে তাঁহার নিজের কীর্ত্তির সম্বন্ধে কোনও কথা শুনিতে পাই নাই। পরের যদি কোনও গুণ দেখিতেন, অথবা কোনও সৎকার্য্যের খবর পাইতেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহা সাধারণের গোচর করিতেন। নিজের বেলায় কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত করিতেন। তিনি যে কখনও কিছু করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের মনেই হইত না, অন্যের নিকট তাহা বলা ত দূরের কথা। আমার এই সংস্রবে একটী ঘটনা মনে

পড়িয়া গেল। আজ নয় বৎসর হইল, আমি ত্রিবেদী মহাশয়ের একটী প্রবন্ধ জর্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদ করিয়া জর্ম্মাণীর কোনও দার্শনিক পত্রিকায় ছাপাইবার জন্য প্রেরণ করি। প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে ত্রিবেদী মহাশয়কে অনুবাদটী একবার দেখাই, এবং তাঁহার মত লই। তিনি তাঁহার সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নে দুই এক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম:—

'আমার প্রবন্ধ যে ভিন্ন ভাষায় অনুবাদযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই......স্বদেশের ও বিদেশের আচার্য্যগণের নিকট যাহা শিখিয়াছি, তাহাই কথঞ্চিৎ সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা ব্যতীত আমার আর কোনও দুরাকাঙ্ক্ষা কখনও ছিল না। রচনাগুলির মধ্যে আমার বিশেষ কৃতিত্ব আছে বলিয়া কখনও কোনও স্পর্দ্ধা আমার মনে উপস্থিত হয় নাই; কোনও নূতন কথা কখনও বলিয়াছি বলিয়াও ধারণা জন্মে নাই।'

ইহা অপেক্ষা অহঙ্কারশূন্যতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আর কি হইতে পারে? অহঙ্কারকে তিনি যেমন দমন করিয়াছিলেন, অন্যান্য রিপুগুলিকেও তিনি সেইরূপ নাশ করিয়াছিলেন। ক্রোধ তাঁহার একেবারেই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যতই বিরক্তিকর ব্যাপার তাঁহার ঘাড়ে পড়ুক না কেন, তিনি কখনও ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন না। এ বিষয়ে ব্রহ্মাস্ত্র ছিল তাঁহার হাসি। তাঁহার সহাস্য বদনের সম্মুখে বিরক্তি যেন আসিতেই সাহস পাইত না।

এই সকল কারণে মনে হয় যে, তিনি গীতার আদর্শ পুরুষ ছিলেন—

'বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি।'

কিন্তু গীতার এই আদর্শ মনে করিলে আমাদের যেরূপ কর্কশ কঠোর লোকের চিত্র মানসচক্ষুতে উদিত হয়, ত্রিবেদী মহাশয়ের অন্তরে সেরূপ কর্কশতা, সেরূপ নির্ম্মমতা আদৌ পরিলক্ষিত হইত না। রামেন্দ্রবাবুর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল। পরের দুঃখ তিনি একেবারেই সহিতে পারিতেন না। বঙ্গসাহিত্যের অক্লান্ত সেবক, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা ৺ ব্যোমকেশ মুস্তফীর মৃত্যুসংবাদে তাঁহাকে শোকে বিহ্বল হইতে দেখিয়াছি। ত্রিবেদী মহাশয়ের ভিতরে কঠোরতার লেশমাত্র ছিল না।

বাস্তবিক ত্রিবেদী মহাশয়ের স্বভাব একেবারে মধু ঢালা ছিল। এই জন্যই কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন,—'তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, তোমার সকলই সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে অভিবাদন করি।' সে কালের আর্য্য ঋষিগণ সমস্ত পৃথিবীকে

মধুময় দেখিতেন। 'ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু। অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু।' ত্রিবেদী মহাশয় আর্য্যদিগের উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। তিনি নিজে মধু ছিলেন, এবং সমস্ত জগৎটাকে মধুময় দেখিতেন। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার মুখে সর্ব্বদা হাসি লাগিয়া থাকিত।

এইবার ত্রিবেদী মহাশয়ের বাল্যজীবন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ-বংশে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জেমো গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী তাঁহার চরিত্রগুণে ও পাণ্ডিত্যে সে অঞ্চলের এক জন শীর্ষস্থানীয় লোক ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে তিনি কান্দি ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। এই দুর্ঘটনা সত্ত্বেও তিনি উক্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং ২৫৲ বৃত্তি পান। পরে তাঁহার খুল্লতাতের সহিত কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৮৬ সালে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পান, এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। অধ্যাপক পেডলার এই পরীক্ষায় রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি রামেন্দ্রবাবুর কাগজ সম্বন্ধে বলেন, 'আমি এ পর্য্যন্ত রসায়নের যত কাগজ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে উহাই out and out the best'। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পদার্থবিদ্যায় এম. এ. পরীক্ষা দেন, এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পর বৎসর তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। পরে কিছু দিন প্রেসিডেন্সি কলেজ ল্যাবরেটারিতে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিবার পর রিপণ কলেজে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপকতা গ্রহণ করেন। ইহাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের আরম্ভ।

রামেন্দ্রবাবুর কর্ম্মজীবনের কথা বলিলেই, সর্ব্বাগ্রে সাহিত্য-পরিষদের নাম মনে পড়ে। সাহিত্য-পরিষৎটী ত্রিবেদী মহাশয়ের হাতে-গড়া জিনিস। ইহার জন্য তিনি চিরজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং ইহার ফল আমরা সাহিত্য-পরিষদের সুন্দর ভবনে ও বহু বিস্তৃত কার্য্যকলাপে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অবশ্য আমার বলা উদ্দেশ্য নহে যে, একমাত্র ত্রিবেদী মহাশয়ই সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টিকর্ত্তা। এ কথা বলিলে যে সকল মহাত্মা তাঁহাদের অর্থ, বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বারা সাহিত্য-পরিষৎকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি

অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। তবে ত্রিবেদী মহাশয়ের উদ্যোগ ও অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতীত সাহিত্য-পরিষৎ কিছুতেই তাহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিত না। তিনি সাত বৎসর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। তাহা ছাড়া, কয়েক বৎসর উহার সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সাত দিন পূর্ব্বে তিনি উহার সভাপতি মনোনীত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পরম দুর্ভাগ্য যে, প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইবার অব্যবহিত পরেই ত্রিবেদী মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিলেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের সভা-পতিত্বে সাহিত্য-পরিষদের যে বিশেষ উন্নতি হইত, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

রিপণ কলেজের সহিত সম্বন্ধ ত্রিবেদী মহাশয়ের কলেজ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইবার অল্প দিন পর হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। সে সম্বন্ধ তাঁহার মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত বরাবর চলিয়াছিল। প্রথমে তিনি অধ্যাপক ভাবে এবং পরে অধ্যক্ষ হিসাবে রিপণ কলেজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। এরূপ এক কলেজে জীবনের সমস্তটা যাপনের উদাহরণ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। রিপণ কলেজে ঢুকিবার পূর্ব্বে তাঁহার গবর্মেণ্টের চাকরী পাইবার একবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। কেন তিনি গবর্মেণ্টের চাকরী লন নাই, সে সম্বন্ধে তিনি এক দিন আমার নিকট বড় মজার গল্প করিয়াছিলেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইবার অব্যবহিত পরেই ত্রিবেদী মহাশয় গবর্মেণ্টের এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে চাকরীর জন্য ডিরেক্টারের নিকট আবেদন করেন। তাহার ফলে ডিরেক্টার তাঁহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলেন। নিয়মিত সময়ে ত্রিবেদী মহাশয় ডিরেক্টারের আফিসে উপস্থিত হন, এবং চাপরাশীর দ্বারা কার্ড পাঠাইয়া দেন। কার্ডটী ডিরেক্টারের নিকট লইয়া যাইবার সময় চাপরাশীটী তাঁহার নিকট বখশিস্ চাহে। ইহাতে ত্রিবেদী মহাশয় এত বিরক্ত হইয়া যান যে, তিনি ভাবেন, 'দূর ছাই, গবর্মেণ্টের চাকরী, যাহার গোড়াতেই এই রকম, তাহার পরে না জানি কত রকম গোলমাল।' এই ভাবিয়া তিনি সেখান হইতে উঠিলেন, আর ডিরেক্টারের সহিত দেখা করিলেন না। এই ঘটনা হইতে ত্রিবেদী মহাশয়ের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও প্রকার বক্রমার্গ দ্বারা কোনও রকম সুবিধা পাইবার চেষ্টা করা, তিনি যে মতে জীবনযাপন করিয়াছিলেন, সে মতের বিরুদ্ধ ছিল। সরল সহজ পথে চলিয়া যতটা সাংসারিক উন্নতি সম্ভবে,

তাহার বাহিরে অন্য কোনও প্রকার সুবিধার চেষ্টা করাকে তিনি পাপ বলিয়া মনে করিতেন।

তিনি নিজে যেমন কোনও প্রকার কুটিলমার্গ পছন্দ করিতেন না, অন্যকেও তিনি তেমনই কোনও প্রকার কুটিলতা অবলম্বন করিতেও প্রশ্রয় দিতেন না। কোনও প্রকার তোষামোদ বা অনুরোধ, উপরোধ তিনি পছন্দ করিতেন না। তাঁহার অধ্যক্ষতায় রিপণ কলেজে বাস্তবিক রাম-রাজত্ব ছিল। কি অধ্যাপক, কি ছাত্র, সকলেই নিজ নিজ কার্য্য করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইত। কাহারও কখনও মনে হইত না যে, প্রিন্সিপ্যালকে খোসামোদ করিবার বা তুষ্ট রাখিবার জন্য কোনও প্রকার চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা আছে।

কেহ তাঁহার বাড়ীতে গিয়া কোনও অনুরোধ করিলে বলিতেন, 'এ কথা ত আমাকে কলেজেই বলিতে পারিতেন, এত কষ্ট করিয়া বাড়ীতে আসার কি দরকার ছিল?' তাঁহার কলেজের অধ্যাপকগণকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করিতেন, এবং সর্ব্বদা মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের ও চরিত্রের প্রশংসা করিতেন। অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের মধ্যে এরূপ মধুর সম্বন্ধ বড় কম দেখিতে পাওয়া যায়। রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পরলোকগত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত রামেন্দ্রবাবু 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্ত' ছিলেন। ক্ষেত্রবাবু এক দিন আমার নিকট বলিয়াছিলেন যে, রামেন্দ্রবাবুর উৎসাহ ব্যতীত তিনি কখনও কিছু লিখিতে পারিতেন না। তাঁহার অকালমৃত্যুতে ত্রিবেদী মহাশয় শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ত্রিবেদী মহাশয়ের কর্ম্মজীবনের কথা বলিতে গেলে তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্রে কর্ম্মের কথা না বলিয়া পারা যায় না। কেন না, সাহিত্য-জগতেই ত্রিবেদী মহাশয়ের কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বঙ্গ সাহিত্যে রামেন্দ্রবাবুর স্থান অতি উচ্চ—এ কথা বলিলে কিছুই বলা হয় না। কোনও কোনও বিষয়ে বঙ্গ-সাহিত্য বলিতে ত্রিবেদী মহাশয়কেই বুঝায়; ত্রিবেদী মহাশয় সে সকল বিষয়ের প্রাণ। মেটেরলিঙ্ককে বাদ দিয়া আধুনিক রোমাণ্টিক সাহিত্য যেরূপ হয়, গেরার্ড হাউপ্টমানকে ছাড়িয়া realistic drama যেরূপ দাঁড়ায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিভাগে, এবং কতক পরিমাণে ইতিহাস বিভাগে, রামেন্দ্রবাবুকে বাদ দিলেও ঠিক সেইরূপ হয়। বাঙ্গালায় যে কত দূর উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে, ইহা রামেন্দ্রবাবু স্পষ্ট

দেখাইয়া দেন। দার্শনিক গ্রন্থ, এবং উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ, বাঙ্গালাতে অবশ্য ত্রিবেদী মহাশয়ের পূর্ব্বে অনেক রচিত হইয়াছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও রামেন্দ্রবাবুর লেখার একটা বিশেষত্ব ছিল। যতই জটিল প্রশ্ন হউক না কেন, ত্রিবেদী মহাশয়ের অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তিবলে ও ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার গুণে তাহা অতি সরল বলিয়া প্রতিভাত হইত। গভীর বিষয়ের সরল ব্যাখ্যা করিতে তাঁহার মত নৈপুণ্য কাহারও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ত্রিবেদী মহাশয়কে বৈজ্ঞানিক বলা উচিত, কি দার্শনিক বলা উচিত, এ বিষয় অনেক তর্ক হইয়াছে। আমার মতে, এ তর্কের কোনও প্রমাণ নাই। যিনি যথার্থ দার্শনিক তিনি বৈজ্ঞানিকও বটে। Aristotle এই জন্য দর্শনশাস্ত্রের সাধারণ সংজ্ঞা দিয়াছিলেন Metaphysics, অর্থাৎ যাহা Physicsএর জ্ঞানলাভের পর, Physicsএর মূল তত্ত্বগুলি আলোচনা করিবার পর পাওয়া যায়। জর্ম্মাণ ভাষায়ও দার্শনিক চিন্তাকে nachdenken বলে, ( অর্থাৎ denken বা বস্তু-চিন্তার পর যাহা উদিত হয় )। দার্শনিক চিন্তা সকল সময়েই nachdenken, অর্থাৎ, এ চিন্তা অন্য সকল চিন্তার পর উদিত হয়, এ চিন্তা অন্য সকল চিন্তার বিষয়ের পুনশ্চিন্তা। সুতরাং দর্শনের আরম্ভ বিজ্ঞানের শেষে। ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবনেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই। প্রথমে ডারউইন, ক্লিফোর্ড, হেল্মহোল্টস্ প্রভৃতি বিজ্ঞানাচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথে তিনি অগ্রসর হন। পরে অনেক দূর অগ্রসর হইবার পর চিন্তা করিতে থাকেন, 'কিরূপ পথ দিয়া এত দূর আসিলাম, আমার গন্তব্য কি, গন্তব্যে পঁহুছিতে হইলে, আমার এ পথ দিয়া আরও যাওয়া উচিত, কি এ পথ ছাড়িয়া অন্য রাস্তা দেখা কর্ত্তব্য?' 'প্রকৃতি' শীর্ষক গ্রন্থে আমরা বিজ্ঞানের পুরা জোয়ার দেখিতে পাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে দুই যায়গায় যেন ভাঁটার টানের আভাস পাওয়া যায়। 'জ্ঞানের সীমানা' ও 'প্রকৃতির মূর্ত্তি' নামক প্রবন্ধে গ্রন্থকারের যেন একটু খট্‌কা উপস্থিত হইয়াছে। বুঝি বা বিজ্ঞান চরম সত্যে লইয়া যাইতে অক্ষম। বুঝি বা এত আড়ম্বর, এত আস্ফালন শেষে নৈরাশ্যের বিরাট শূন্যতায় পর্য্যবসিত হয়! এই খটকা হইতেই 'জিজ্ঞাসা'র উৎপত্তি। যদি বৈজ্ঞানিক সত্য চরম সত্য না হয়, তাহা হইলে কোথায় সত্যকে খুঁজিতে হইবে? জিজ্ঞাসার প্রথম প্রবন্ধ 'সত্য'তে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। বিজ্ঞান ভূয়োদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ভূয়োদর্শনের বাহিরে যাইতে অক্ষম। কিন্তু ভূয়োদর্শন

ভূয়োদর্শনমাত্র; ভূয়ঃ শব্দের অর্থ ভূয়ঃ, চির নহে। ভূয়োদর্শন বহু কাল ব্যাপিয়া দর্শন বা সর্ব্বদেশ ব্যাপিয়া দর্শন নহে। চিরের সহিত তুলনায়, সর্ব্বের সহিত তুলনায়, ভূয়ঃ ও বহু নগণ্যমাত্র! উভয়ের তুলনা হয় না। মাধ্যাকর্ষণের বর্ত্তমান নিয়ম, কালি ছিল, পরশু ছিল, শত বৎসর বা কোটী বৎসর আগেও ছিল, মানিলাম। কিন্তু চিরকাল ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? বিজ্ঞানের সত্য কাজে কাজেই শাশ্বত বা চিরন্তন সত্যের কাছে লইয়া যাইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক সত্য কেবল ব্যাবহারিক সত্য, জীবন-যাপনের সুবিধার জন্য গৃহীত সত্য। 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং রিপণ কলেজে ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে তিনি যে সকল প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে বৈজ্ঞানিক সত্যের এইরূপ অশাশ্বততা সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। 'আমি আছি'—এ সত্য কিন্তু অন্য প্রকার সত্য। ইহা অপর কোনও সত্যের উপর নির্ভর করে না। যদি কোনও সত্যকে নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য বলিতে হয়, তাহা এই সত্য। ত্রিবেদী মহাশয় তাই এক জায়গায় বলিয়াছেন,—

'আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। তর্কের ভিত্তি-মূল পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। যদি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কোন সত্য বা সিদ্ধান্ত থাকে, আমার অস্তিত্ব সেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য।'

ত্রিবেদী মহাশয় এইরূপে দুই প্রকার সত্যের নির্দ্দেশ করেন। এক হইতেছে ব্যাবহারিক বা Pragmatic সত্য, জীবনধারণের সুবিধার জন্য মানিয়া লওয়া সত্য; আর এক হইতেছে, পারমার্থিক বা শাশ্বত সত্য, Absolute Truth.

ফলে দাঁড়াইল এই যে, 'আমি আছি' ইহাই চরম সত্য। কিন্তু এই আমি কি? আমি কখনও পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধে অভ্রভেদী শুভ্র গিরিশৃঙ্গ অবলোকন ও নিম্নে বেগবতী খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদীর কলকল নিনাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দ পাইতেছি। আবার কখনও আমি নিভৃত কক্ষে শান্ত স্তব্ধ ভাবে নিজের ক্রিয়াকলাপের পর্য্যালোচনা করিতেছি। এক আমি বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে কখনও হাসিতেছি, কখনও কাঁদিতেছি, সর্ব্বদাই বিচ-লিত হইয়া আছি; আর এক আমি নির্ব্বিকার শান্তশুদ্ধস্বভাব। প্রথম 'আমি'কে জীবাত্মা বা phenomenal self, এবং দ্বিতীয় 'আমি'কে পর-মাত্মা বা transcendental self বলা হয়। এই দুই 'আমি' কিন্তু মূলতঃ

একই। যে আমি পরমাত্মা, সে আমিও আবার জীবাত্মা। ইহা Kantও যেরূপ জোরের সহিত বলিয়াছিলেন, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিরাও সেইরূপ বা ততোধিক জোরের সহিত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ত্রিবেদী মহাশয়ও ইহাঁদিগের সহিত যোগ দিয়া এই বিরাট সত্যকে পুনরায় ঘোষণা করেন।

আমি আপনাদিগকে এই সকল দার্শনিক technicalities লইয়া বিরক্ত করিতাম না। কিন্তু এই দুই প্রকার 'আমি'র সম্বন্ধের উপর ত্রিবেদী মহাশয়ের সমস্ত দার্শনিক মত নির্ভর করে। এক সাক্ষী চৈতন্য 'আমি' থাকিলেই ত হইত, এই দুই 'আমি'র কি প্রয়োজন? ইহার উত্তর ঋগ্বেদে আছে। 'কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি, মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ'—আমার মনে কাম উপস্থিত হইল, ইহাই জগতের সৃষ্টি-হেতু। অর্থাৎ, ইহা কামনা করিলাম —সেই কামনা হইতেই ইহার উৎপত্তি। আমি কামনা করিয়া নিজকে জগতের মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। এই নিক্ষেপের দরুণই আমার সহিত জগতের সুখ-দুঃখের বন্ধন, জন্ম-মৃত্যুর সম্বন্ধ।

এই নিক্ষেপণের আর এক নাম হইতেছে যজ্ঞ। পুরুষ নিজকে যজ্ঞীয় পশুরূপে আলম্ভন করিয়া জগৎ সৃষ্টি করে।

'তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতম্ অগ্রতঃ'; 'যজ্ঞেন যজ্ঞমজয়ন্ত দেবাঃ' —সেই পুরুষকেই যজ্ঞীয় পশুরূপে আলম্ভন করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন হইয়াছিল, সেই যজ্ঞ হইতেই যাবতীয় চরাচর জগতের সহিত সম্বন্ধ।

এই জন্য ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন,—

'এই বিশ্ব ব্যাপার এক মহাযজ্ঞ—বিশ্বকর্ম্মার সম্পাদিত যজ্ঞ। যজ্ঞ ত্যাগাত্মক—যাজ্ঞিকের পরিভাষায় দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নাম যজ্ঞ। কাজেই জীব যে জীবত্ব গ্রহণ করিয়া জগতে উপস্থিত আছেন—সংসার করিতেছেন, তাহা যখন মূলেই ত্যাগ, তখন যে যে কর্ম্ম ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিশ্বযজ্ঞের অনুকূল।'

জগতের সহিত জীবের সামঞ্জস্য ত্যাগের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ত্যাগের সহিত ভোগের যথার্থ কোনও বিরোধ নাই। ঈশোপনিষৎ বলিয়াছেন,—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করিবে। ভোগ্য বস্তুই যখন ত্যাগের দ্বারা লভ্য, সমস্ত জগতের—এবং কাজে কাজেই সকল ভোগ্যবস্তুরই— যখন ত্যাগেতে সৃষ্টি, তখন ত্যাগের সহিত ভোগের কোনও জাতিগত পার্থক্য থাকিতে পারে না। ইহা ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার কর্ম্মকথার 'যজ্ঞ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদ ভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন।

'ত্যাগের সহিত ভোগের বিরোধ থাকিতে পারে না। ভোগের বিষয় এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা জীবের আত্মত্যাগের বা আত্মপ্রসারণেরই ফল; জীব ত্যাগ স্বীকার করিয়া জীব হইয়াছে বলিয়াই এই ভোগের বিষয় সম্মুখে পাইয়াছে। অতএব ভোগ ত্যাগমূলক; ত্যাগই ভোগ।'

পৃথিবীর যাবতীয় কর্ম্মই যজ্ঞ, অর্থাৎ ত্যাগাত্মক—ইহা দেখান ও বোঝানই ত্রিবেদী মহাশয়ের 'কর্ম্মকথা' গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। এ কথার ঠিক মানে কি, একটু তলাইয়া দেখা উচিত। যাবতীয় কর্ম্মই ত্যাগ, অর্থাৎ, তাহা ethical, আবার কর্ম্মমাত্রই ঋত, অর্থাৎ Cosmic process, কাজেই সমস্ত জাগতিক ব্যাপারই নৈতিক ( Ethical ), অথবা সমস্ত নৈতিক ব্যাপারই জাগতিক। সুতরাং Cosmic process এবং Ethical process মূলতঃ এক। 'ধর্ম্মের জয়' শীর্ষক প্রবন্ধে এই ঐক্যটী ত্রিবেদী মহাশয় পরিস্ফুট করিয়াছেন।

'যে নিয়তি সৌরজগতে গ্রহ উপগ্রহগুলিকে আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ঘুরাইতেছে, যে নিয়তির বশে দিন রাত্রি হয়, ভূমিকম্প ঘটে ও ঝঞ্ঝা বায়ু বহে, অথবা যে নিয়তির বশে ম্যামথ ও ম্যাষ্টোডনের বাসভূমিতে মানুষ রেলপথ চালাইতেছে ও টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, সেই নিয়তি, এবং যে নিয়তি মানুষকে সৎ কর্ম্মে ও অসৎ কর্ম্মে প্রেরিত করে, যাহাতে সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগ করাইয়াছিল ও যীশুকে ক্রুসে ঝুলাইয়াছিল, এই নিয়তি, এই উভয় প্রকোষ্ঠের উভয় নিয়তির মধ্যে এক পরম ঐক্য বর্ত্তমান আছে।'

এইখানে একটু খট্‌কা বাধে। নৈতিক জীবন ও জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য তুলিয়া দিলে, নৈতিক জীবনের সারাংশই চলিয়া যায়। যাহা ঘটিতেছে, এবং যাহা ঘটা উচিত, এই দুই জিনিস এক হইলে, 'উচিত' শব্দের আর কোনও অর্থ থাকে না। ত্রিবেদী মহাশয়ের উদ্দেশ্য কিন্তু morality লোপ করা নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি প্রতিপন্ন করিতে চান যে,এই সাংসারিক বা ব্যাবহারিক জীবনে Moralsএর কোনও স্থান নাই। জগতে ধর্ম্মের জয় হয় না, নিয়তির জয় হয়। ধর্ম্মের ভিত্তি ব্যাবহারিক জগতে নহে, প্রাতিভাসিক জগতে। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নিজের নিজের জগৎ আছে, যেখানে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, যেখানে আমরা নিজের অনুভূতি ও নিজের বিশ্বাস দ্বারা চালিত হই। ধর্ম্ম এই প্রাতিভাসিক বা intuitive রাজ্যে বিচরণ করে। ইহা সকলের সাধারণ সম্পত্তি নহে; ইহা প্রত্যেকের নিজস্ব সামগ্রী। আমার সহিত অনন্তের সম্বন্ধ, প্রতি দিনের মেশামিশি, প্রতি দিনের মাখামাখির সম্বন্ধ। দুর্ভাগ্যক্রমে ত্রিবেদী মহাশয়

প্রাতিভাসিক জগতের সত্তা পরিষ্কাররূপে নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বেই ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

ত্রিবেদী মহাশয়ের দার্শনিক মত লইয়া এত কথা বলিলাম বলিয়া মনে করিবেন না যে, তিনি কেবল দর্শন লইয়াই থাকিতেন। বিজ্ঞানে তাঁহার কত দূর প্রবেশ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা এই দুই বিভাগেই আবদ্ধ ছিল না। ইতিহাসে তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' নামক পুস্তক তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই পুস্তকে তিনি হিন্দুজাতির Culture-history অন্বেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা নূতন। আমাদের Culture-history এ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই। কিরূপে যে হিন্দুর আচার ব্যবহার কালের সহিত ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহার পরিষ্কার ছবি 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' দেখিতে পাওয়া যায়। নানা প্রসঙ্গ 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' উত্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাক্ শব্দের ঐতিহাসিক আলোচনা ও কৃষ্ণের গোপালত্বের তাৎপর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বাক্ শব্দের আলোচনায় ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদে বাক্দেবীর অর্চ্চনা ও শব্দব্রহ্মবাদ যাহা আছে, তাহার সহিত গ্রীক ও খ্রীষ্টীয় Doctrine of Logos-এর মৌলিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই সাদৃশ্যটী রামেন্দ্রবাবু সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন, এবং তাহা হইতে এই অনুমান করিয়াছেন যে, বৈদিক শব্দ-ব্রহ্মবাদ গ্রীকরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিল, এবং পরে তাহা প্যালেষ্টাইনের খ্রীষ্টানদিগকে দেয়। এই মতের সমর্থনে ত্রিবেদী মহাশয় আর একটী বৈদিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা খ্রীষ্টানরা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিল। ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বৈদিক যুগে যে পুরোডাশ-ভক্ষণের প্রচলন ছিল, তাহা, এবং খ্রীষ্টানদিগের Eucharist ভক্ষণ একই জিনিস। কৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, ইহা বৈদিক যুগে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে অনেক স্থানে বিষ্ণুকে 'গোপা' আখ্যান দেওয়া হইয়াছে। আবার এ দিকে সোমক্রয়ের যে অনুষ্ঠান বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল, তাহাতে বাগ্‌দেবীকে গাভী-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। নিরুক্ত-কার যাস্ক নৈঘণ্টুক কাণ্ডে গো শব্দের একুশটী প্রতিশব্দ দিয়াছেন, যথা ধেনু, শব্দ, বাণী, বাক্, ভারতী প্রভৃতি, এবং ইহা দিয়া বলিতেছেন, 'এতে একবিংশতি বাঙ্‌নামানি।' এই সকল কারণে ত্রিবেদী মহাশয় বলিতে চাহেন যে, বাক্ = গো = ব্রহ্ম, এবং এই জন্যই হিন্দুধর্ম্মে গাভীর এত সম্মান, এবং কৃষ্ণকে গোপাল-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

অনেক প্রসঙ্গ এই 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' উত্থাপিত হইয়াছে। সময়াভাবে সে-গুলির উল্লেখ করিতে পারিলাম না। যে দুইটীর উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, এ পুস্তকে কিরূপ গভীর ঐতিহাসিক আলোচনা আছে। বাস্তবিক, এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় কেন, কোনও ভাষায় আছে কি না সন্দেহ। কোনও কোনও বিষয়ে Houston Stewart Chamberlainএর 'Foundations of the Nineteenth Century' নামক পুস্তকের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। Chamberlainএর পুস্তকে ইউরোপের Culture-history দিবার যথার্থ চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এ পুস্তকের এক মহা দোষ আছে। ইহা অত্যন্ত বেশী dogmatic, গায়ের জোরে Chamberlain তাঁহার প্রিয় মতটী চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, জাতিই জগতের সকল উন্নতি-অবনতির মূল। ত্রিবেদী মহাশয়ের পুস্তকে কিন্তু dogmatic ভাবের লেশমাত্র নাই।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও ত্রিবেদী মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্ব লিখিবার চেষ্টা ত্রিবেদী মহাশয় সর্ব্বপ্রথম করিয়াছেন। তাঁহার 'ধ্বনি-বিচার' নামক প্রবন্ধে এ চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই। বাঙ্গালা শব্দের এরূপ বৈজ্ঞানিক বিচার, কেহ কখনও এ পর্য্যন্ত করিতে সাহস করেন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের উদ্ধারের যে চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টার মূলে ত্রিবেদী মহাশয় ছিলেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদের যে চেষ্টা, সে চেষ্টা প্রধানতঃ রামেন্দ্রবাবুরই চেষ্টা।

আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। ত্রিবেদী মহাশয় অসাধারণ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি ঢাক ঢোল বাজাইয়া তাঁহার স্বদেশপ্রেম কখনও ঘোষণা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি অসাধারণ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে তিনি মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনও ভাষায় কখনও চিঠিপত্র লিখিতেন না। ধুতি চাদরও কখনও ছাড়িতেন না। শুনিয়াছি, প্রথম জীবনে কলেজে চোগা চাপ্‌কান্ পরিয়া যাইতেন, কিন্তু পরে ধুতি চাদর ভিন্ন অন্য কোনও বেশ তাঁহার দেখা যাইত না। বাহিরেও যেরূপ, ভিতরেও সেইরূপ, তিনি খাঁটী স্বদেশী ছিলেন। তিনি বিদেশীর যাহা ভাল, তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কখনও চোখ বুজিয়া বিদেশীর অনুকরণ করিতেন না। সে দিন অপর একটী স্মৃতি-

সভায় এক জন বক্তা বলিয়াছিলেন,—ত্রিবেদী মহাশয় কখনও বিশ্বাস করিতেন না যে, ভারতবাসী পাশ্চাত্য জাতির সম্মুখে 'intellectual orphan' হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই বক্তার ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আমরা 'intellectual orphan' নহি। আমাদের নিজের জ্ঞান, নিজের বুদ্ধি, নিজের ভাষা আছে। আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার এখনও সমগ্র জগৎকে জ্ঞান বিতরণ করিতে পারে, আমাদের ভক্তিসিন্ধু এখনও জগতের সমগ্র ভক্তবৃন্দকে ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিতে পারে।

শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র।

---

# 'শব্দকথা'।

[ দ্বিতীয় প্রস্তাব। ]

'শব্দকথা'-সমালোচনের প্রথম প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি যখন মুদ্রাকরের করে রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছিল, এবং যখন এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটির কল্পনা রচনায় পরিণত হইতেছিল, তখন কে জানিত যে, গ্রন্থকার রামেন্দ্রসুন্দরকে লোকান্তরে লইয়া যাইবার জন্য, মহাকাল অতি ক্ষিপ্রকরে উদ্যোগ করিতেছিলেন। ধর্ম্মরাজের ধর্ম্ম বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। কিন্তু সাধু ও সুধী জনের অকালে প্রাণহরণ যদি অধর্ম্ম হয়, তবে সে অধর্ম্ম তাঁহার মস্তকে পুঞ্জীভূত হউক! দেশমাতৃকার এমন সর্ব্বনাশ আর কেহ করে নাই। কিন্তু জাতিগত এ আক্ষেপ হইতে আমি বিরত হইতেছি। আমি ব্যক্তিগত ক্ষোভের কথাও বলিতেছি না। ত্রিবেদী মহাশয়ের কৃত 'শব্দকথা'র আমার এই ক্ষুদ্র সমালোচনা তাঁহার চক্ষে পড়িল না বলিয়া আমার যে ক্ষোভ, তাহার কোনও মূল্য নাই। আবার তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা ভাল হউক বা মন্দ হউক, তিনি নিজে দেখিতে পাইলেন না। 'শব্দকথা'র এই সমালোচনা উপলক্ষ করিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গালা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল নূতন সারগর্ভ কথার প্রচার করিতেন, তাহা হইতে যে আমরা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইলাম, এবং এ বিষয়ে তাঁহার সহিত সবিশেষ ও সম্যক্ আলোচনা করিবার সুযোগ বঙ্গসাহিত্যসেবিগণ যে চিরকালের মত হারাইলেন—এই দুঃখই দুঃখ। কিন্তু দুঃখের ভার বক্ষে লইয়াই আমাদিগকে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

‘শব্দকথা’-সমালোচনার প্রথম প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে যে, গ্রন্থখানির জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ ‘ধ্বনি-বিচার’ পৃথক্‌ভাবে আলোচিত হইবে, এবং ‘কারক-প্রকরণ’ প্রভৃতি বাঙ্গালা ব্যাকরণসম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রবন্ধ একত্র বিচারিত হইবে। তদনুসারে শেষোক্ত প্রবন্ধগুলির আলোচনা করা যাইতেছে।

১। ‘কারক-প্রকরণ’

"বাঙ্গালা ব্যাকরণের কারক-প্রকরণে নানা গণ্ডগোল আছে"—এই কথা প্রবন্ধারম্ভে বলিয়া গ্রন্থকার সংস্কৃত ভাষার কারক ও ইংরাজি ভাষার কারকের সহিত বাঙ্গালা ভাষার কারকের সাদৃশ্য ও বৈষম্যের বিচার করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত কারকের বিভক্তি ও বাঙ্গালা কারকের বিভক্তির সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার ফলে তিনি যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা লইয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষার "কারক-প্রকরণের সংস্কার" করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি এই—

"(১) (বাঙ্গালা ভাষায়), কর্ত্তার সাধারণতঃ বিভক্তিচিহ্ন থাকে না। স্থানবিশেষে বিভক্তিচিহ্ন, এ', য়, তে। (২) কর্ম্মের বিভক্তিচিহ্ন কোথাও কে', কোথাও বা রে', কোথাও বা বিভক্তিচিহ্ন থাকে না। স্থানবিশেষে চিহ্ন এ', য়। (৩) সম্বন্ধ বুঝাইবার চিহ্ন র', এর। (৪) অপাদানের বিভক্তিচিহ্ন নাই।* (৫) সম্প্রদানের চিহ্ন কর্ম্ম হইতে অভিন্ন। (৬) করণ ও অধিকরণের চিহ্ন এ', য়', তে'; কিন্তু ঐ কয়টী চিহ্ন করণ ও অধিকরণের নিজস্ব নহে, অন্য কারকেও উহাদের প্রয়োগ হয়।"

অতঃপর তাঁহার প্রস্তাব এই :—

"আমার বিবেচনায় বাঙ্গালায় করণ ও অধিকরণ দুইটা কারকে ভেদ রাখিবার প্রয়োজন নাই। দুয়েরই বিভক্তিচিহ্ন সমান, * সর্ব্বত্র অর্থভেদ বাহির করাও কঠিন। দুইটাকে মিশাইয়া একটা নূতন কারক নূতন নাম দিয়া প্রচলন করা যাইতে পারে। এমন কি যে সকল স্থানে অর্থ ধরিয়া করণ বা অধিকরণ এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে পারা যায় না, অথচ বিভক্তির রূপ তৎসদৃশ, সেই সকল স্থলেও এই নূতন কারকের পর্য্যায়ে ফেলা চলিতে পারে। কর্ত্তা ও কর্ম্ম ব্যতীত আর যে সকল পদের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় আছে, এবং যাহারা উক্তরূপ বিভক্তি গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই এই নূতন কারকের শ্রেণীতে পড়িবে। তাহাদের মধ্যে আর সূক্ষ্ম বিভাগ কল্পনা করিয়া ইতরবিশেষ করা নিষ্প্রয়োজন।......কর্ম্ম ও কর্ত্তা ব্যতীত যে সকল বিশেষ্যপদ ক্রিয়ার আশ্রয়ে থাকে, তাহাদিগকেও ঐ বিভক্তির খাতিরে এই নূতন

* "দ্বারা, দিয়া প্রভৃতিকে বিভক্তি বলিতে আমি প্রস্তুত নহি,...'দ্বারা, দিয়া, হইতে,...চেয়ে প্রভৃতি পদগুলিকে বিভক্তিচিহ্ন মনে করা চলিতে পারে না।...উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলিতেও কারকত্ব অর্পণ করা চলিবে না।"—(শব্দকথা, ৭৮।৮০।৮১ পৃঃ।)

কারকের কোঠায় ফেলা যাইতে পারে। ইহার নামকরণ আমার সাধ্যাতীত। পণ্ডিতেরা আমার প্রস্তাব মঞ্জুর করিলে নামের জন্য আটকাইবে না।"......কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারককে উঠাইয়া দিতে বলিব না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে চাহি যে, বাঙ্গালা ব্যাকরণের কারক প্রকরণে তিনটির বেশী কারক রাখা অনাবশ্যক :—কর্ত্তা, কর্ম্ম ও আর একটি তৃতীয় কারক, যাহার বিভক্তিচিহ্ন এ' এবং তে'। করণ ও অধিকরণ এবং আর যে সকল পদের অর্থ ধরিয়া কারক নির্ণয় করা দুরূহ, তাহারা এই তৃতীয় কারকের অন্তর্গত হইবে। সম্প্রদান, কর্ম্ম হইতে অভিন্ন, সম্প্রদান রাখিবার দরকার নাই। ক্রিয়ার সহিত অন্বয়ের অভাবে অপাদান অস্তিত্বহীন। * সেই কারণে সম্বন্ধবাচক পদও কারক নহে। অতএব বাঙ্গলা ব্যাকরণে তিনটির অধিক কারকের প্রয়োজন নাই।"

ত্রিবেদী মহাশয়ের এই অভিনব প্রস্তাব আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না, এবং সম্প্রদান, করণ ও অপাদান প্রভৃতি কারকের বিভক্তিচিহ্ন ও অর্থ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তও যুক্তিসঙ্গত নহে। এ বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা 'কারক' ও 'বিভক্তি' এই দুইটি শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ বা লক্ষণ কি, তাহা দেখিব। সংস্কৃত ব্যাকরণে "ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্" ইহাই সাধারণতঃ কারকের লক্ষণ। কোনও বাক্যে ক্রিয়ার সহিত যে পদের অন্বয় আছে, তাহাকে কারক বলে। এই 'অন্বয়' (অনু+ই+অল্) শব্দের অর্থ, অনুগমন। তবেই যে পদ ক্রিয়ার অনুগত, অর্থাৎ ক্রিয়া যাহাকে কোনও না কোনও প্রকারে আকর্ষণ বা শাসন (ইংরাজী ব্যাকরণে ইহাকে 'Government' বলে) করে, তাহার নাম কারক। সুতরাং কারকের এই ক্রিয়ানুগামিত্ব সামান্যতঃ অর্থের উপরই নির্ভর করে। সেই জন্য ক্রিয়ানুগামিত্বের প্রকারভেদে অর্থাৎ অর্থভেদে কারকভেদ হইয়াছে। "ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্" এই সূত্রের অন্য প্রকার অর্থও হইতে পারে। 'ক্রিয়ান্বয়ী' এই পদের অর্থ ক্রিয়ায়াঃ অন্বয়ঃ অস্ত্যস্য—ক্রিয়ার অন্বয় ইহার আছে। এ স্থলে 'ক্রিয়ায়াঃ' এই পদের বিভক্তি 'কর্ত্তরি ষষ্ঠী' অথবা 'কর্ম্মণি ষষ্ঠী' হইতে পারে। কর্ম্মণি ষষ্ঠী ধরিলে সূত্রের অর্থ পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই হইবে—অর্থাৎ যে পদ ক্রিয়ার অনুগমন করে, তাহার নাম কারক। কিন্তু যদি কর্ত্তরি ষষ্ঠী ধরা যায়, তবে অর্থ ইহার ঠিক বিপরীত হইবে—ক্রিয়া যে পদকে অনুগমন করে, তাহাকে কারক বলে। বিভক্তির প্রয়োগভেদে এইরূপ অর্থ-বৈপরীত্য ঘটিতেছে বলিয়া বৈয়াকরণের "ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্" এই সূত্রের কোনও প্রমাদ

* "বাঙ্গলায় সম্প্রদান কর্ম্মের সহিত অভিন্ন ও অপাদানের অস্তিত্ব নাই। এই দুইটিকে উঠাইতেই হইবে।" (শব্দকথা ৮৬ পৃঃ।)

ঘটিবে না। কারণ যে দিক্ দিয়াই হউক, ক্রিয়ার সহিত কোনও পদের এই অনুগামিত্ব সম্বন্ধ থাকিলেই সে পদ কারক-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। কারকের এই প্রাচীন সূত্রটির ঐ রূপ অর্থ-দ্বন্দ্ব দেখিয়াই, বোধ হয়, 'কলাপ' ব্যাকরণের তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৃত্তিকার দুর্গসিংহ কারকের একটি নূতন সূত্র করিয়াছেন। "ক্রিয়ানিমিত্তং কারকং লোকতঃ সিদ্ধম্"—তিনি এই উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহার এ উপদেশের অর্থ এই—"যৎ ক্রিয়ানিমিত্তমাত্রং প্রধানমপ্রধানং বা যতঃ ক্রিয়া ভবতি তৎ কারকমুচ্যতে" ইতি লোকতঃ সিদ্ধম্। অর্থাৎ, যে পদ ক্রিয়াসম্পাদনে নিমিত্ত হইবে, তাহা, প্রধানই হউক আর অপ্রধানই হউক, কারক নামে কথিত হয়, এবং ইহা লোক-ব্যবহার-( Common-sense )-সিদ্ধ। দুর্গসিংহের এই সূত্র প্রাচীন সূত্রটি অপেক্ষা সরল ও স্পষ্টতর। কলাপ ব্যাকরণের এক জন টীকাকার কারকের এই নূতন সূত্রের ব্যাপকতা এতটা সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়াছেন যে, তিনি 'সম্বন্ধ' পদকেও কারক বলিতে উদ্যত হইয়া, "সম্বন্ধস্য ক্রিয়ানিমিত্তত্বেঽপি ষট্সু কারকশব্দস্য রূঢ়ত্বাৎ ন কারকত্বমিতি সংক্ষেপঃ"—( সম্বন্ধ, ক্রিয়ানিমিত্ত হইলেও কারক শব্দের ষট্সংখ্যায় রূঢ়ত্ববশতঃ কারক সংজ্ঞার অধিকারী হইতে পারিল না ) এই কথা কহিয়া আত্মসংবরণ করিয়াছেন। *

উপরে কারকের যে দুইটি সূত্র উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অর্থের প্রকার অনুসারেই কারকের প্রকার হয়। এই জন্য কোনও ক্রিয়াব্যাপারে প্রধান ও অপ্রধান যে কয় প্রকার অর্থের সংযোগ প্রতীত ও আবশ্যক হইবে, তৎসংখ্যক কারকেরও প্রয়োজন হইবে। এই হেতু কারকের সংখ্যা অর্থযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত—বিভক্তির প্রয়োগ বা অল্পাধিক্যের দ্বারা নিয়মিত নহে, এবং সেই কারণে তাহা ভাষাভেদের অধীন নহে। কারকের এই নিত্যত্ববশতঃ পৃথিবীর যে সকল সভ্য জাতির ভাষা সম্যক্ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাঁহাদের ব্যাকরণে কারক-সংখ্যা প্রায় একই রূপ। ইংরাজি ভাষার ব্যাকরণে ( প্রকৃতপক্ষে ইংরাজি ভাষার ব্যাকরণ নাই ) যে কারক-সংখ্যা অল্পতর, তাহা সে ভাষায় ত্রুটীমূলক। সে যাহা হউক, অর্থভেদে কারকভেদ বলিয়া বিভিন্ন কারক নির্দ্দেশের জন্য বিভিন্ন বা বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এই বিশেষ চিহ্নগুলির নাম 'বিভক্তি'। শব্দের উত্তর এই

* কোনও কোনও বাঙ্গালা ব্যাকরণে সম্বন্ধপদকে যে সম্বন্ধ কারক বলা হয়, তাহার অনুকূল পক্ষে টীকাকার সুষেণাচার্য্যের এই উক্তি যুক্তির আভাসরূপে গৃহীত হইতে পারে।

বিভক্তিগুলি যুক্ত হইয়া অর্থভেদ ও তাহা হইতে কারকভেদ সংঘটিত করে। সংস্কৃত ব্যাকরণে ছয়টি কারকের জন্য ছয়টি বিভক্তি আছে। কারকের জন্যই এই বিভক্তিগুলির উৎপত্তি। বিভক্তির জন্য কারকের উৎপত্তি নহে। আবার, কারকের এই বিভক্তিগুলির আকার সর্ব্বত্রই যে একেবারে বিভিন্ন, এমন নহে। যথা—প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনের বিভক্তি, তৃতীয়া-চতুর্থী-পঞ্চমীর দ্বিবচনের বিভক্তি, চতুর্থী-পঞ্চমীর বহুবচনের বিভক্তি, এবং পঞ্চমী-ষষ্ঠীর একবচনের বিভক্তি, ক্রমান্বয়ে সাধারণতঃ একরূপ। এই কারণে বিভক্তি সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র না হইলে যে স্বতন্ত্র কারক হইতে পারিবে না, এমন নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণে 'বিভক্তি' শব্দের লক্ষণ এইরূপ—"অর্থস্য বিভজনাদ্ বিভক্তয়ঃ" ইতি দুর্গসিংহঃ। ইহার টীকার্থ এই—"সংখ্যাকর্ম্মাদয়ো হ্যর্থা বিভজ্যন্তে যাভি স্তা বিভক্তয়ঃ"—যাহা দ্বারা সংখ্যা ও কর্ম্মাদিরূপ অর্থ বিশিষ্টরূপে বিভক্ত হয়, তাহাকে বিভক্তি বলে। 'বিভক্তি' শব্দের এই লক্ষণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কর্ত্তৃকর্ম্মকরণাদি কারকের অর্থ বিভাগ করিবার জন্যই এই জাতীয় বিভক্তির উৎপত্তি। কারকের অর্থগত নিত্যত্ব সম্বন্ধে স্ফুটতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? দুঃখের বিষয়, ত্রিবেদী মহাশয়ের মত বিচক্ষণ ধীমান্ ব্যক্তি কারকের এই নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

---

# আদান প্রদান।

১

নয়ানজুলির ব্রজ সরকার নিজে বিবাহ না করিয়া যখন খুড়তুত ভাই রসিকের বিবাহের উদ্যোগ করিল, তখন পাঁচ জনে এই নির্ব্বোধ লোকটার বুদ্ধি-হীনতা-দর্শনে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহারা শুধু বিস্ময় অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, অযাচিতভাবে মূর্খ ব্রজ সরকারকে নিজের বাপের বংশ বজায় রাখিবার জন্য অনেক উপদেশও দিল। বুদ্ধিহীন ব্রজ কিন্তু এই সকল বুদ্ধিমান্ হিতৈষীদিগের উপদেশের সার্থকতা অনুভব করিল না; সে হাসিয়া উত্তর করিল, 'রসিকের বাপের বংশ আর আমার বাপের বংশ কি আলাদা!'

আসল কথা, ছোট মুদীখানার দোকানটার আয়ে দুইটা পেট চালাইয়া

দীর্ঘ সাত বৎসরের চেষ্টায় সে যে তিন শত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাতে এক জনের বিবাহ হইতে পারে। সে এক জন ব্রজ নিজে হইলে, আবার যে অতগুলি টাকার যোগাড় করিয়া রসিকের বিবাহ দিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। বিবাহ করিলে আর একটী পেটের খরচ বাড়িবে। এই সামান্য দোকানের আয়ে তিনটী পেটের খরচ যোগাইয়া আর দশ বৎসরেও সে এতগুলি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবে কি না সন্দেহস্থল। এ দিকে রসিকেরও বিবাহের বয়স হইয়াছে। অগত্যা ব্রজ নিজে বিবাহ না করিয়া সঞ্চিত টাকায় রসিকের বিবাহ দিতে উদ্যত হইল।

খুড়া ধনঞ্জয় সরকার অনেক দিন পূর্ব্বে পৃথক্ হইয়াছিল, এবং জমীদারের সহিত মোকদ্দমা করিয়া মৃত্যুকালে এত দেনা রাখিয়া গিয়াছিল যে, জমী জমা ঘর ভিটা সব বেচিয়া লইয়াও মহাজন সমগ্র টাকার উশুল পাইল না। সাত বছরের ছেলে আর পাঁচ বছরের মেয়ে উমার হাত ধরিয়া খুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহত্যাগ করিলেন। ব্রজ তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিল, 'ভাবনা কি খুড়ী, আমার কুঁড়ে তো আছে।'

অনেক দিন আগে ব্রজ মাতৃপিতৃহীন হইয়াছিল। ঘরে আর কেহ ছিল না। সে নিজে রাঁধিত, নিজে খাইত; বাকী সময়টা তাসের আড্ডায় ও কীর্ত্তনের আখড়ায় ঘুরিয়া দিন কাটাইয়া দিত। যে দুই পাঁচ বিঘা জমী ভাগজোতে বিলি ছিল, তাহারই আয়ে কোনরূপে দিন চলিয়া যাইত। আর দিন চলিবার জন্য তাহার উদ্বেগও কিছুমাত্র ছিল না। শুধু এক এক দিন স্তব্ধ সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্যের মধ্যে আপনাকে যখন নিতান্ত একা বলিয়া মনে হইত, তখন সে ঘরে চাবি লাগাইয়া কীর্ত্তনের আখড়ায় ছুটিয়া যাইত, এবং কীর্ত্তনীয়া-দের সঙ্গে গলা মিলাইয়া গাহিতে থাকিত—

"আমি ভবে একা দাও হে দেখা, ওহে বাঁকা বংশীধারী!"

সুতরাং ব্রজ শূন্য সংসারে খুড়ীকে পাইয়া খুবই উৎসাহিত হইল। প্রতি-বেশী যদু সান্যাল মহাশয় বলিলেন, 'হাঁ হে ব্রজ, এ সব আবার জড়ালে কেন?'

ব্রজ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'কও কথা দাদাঠাকুর, এ আবার জড়াজড়ি কি? মা আর খুড়ী কি আলাদা?'

কিন্তু দিন কতক পরে যখন দিন চলিবার ভাবনা আসিল, তখন ব্রজনাথের আনন্দের মাত্রাটা যেন কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়িল। তবে সে একে-

বারে নিরুৎসাহ হইল না, মায়ের এক যোড়া কাণের পাশা আর দুই গাছা রূপার পৈঁছে ছিল। তাহা পঞ্চাশ টাকায় বেচিয়া একটী ছোট মুদীখানার দোকান খুলিল। দোকানের আয়ে কোনরূপে সংসার চলিতে লাগিল। ব্রজ রসিককে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিল।

এক দিন ব্রজ মধ্যাহ্নে ঘরে শুইয়া শুনিতে পাইল, প্রতিবেশিনী বামার মা আসিয়া খুড়ীর দুর্ভাগ্যের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছে, এবং এখনও যদি তিনি ছেলেটীকে মানুষ করিয়া তাহার মাথায় এক গণ্ডূষ জল দিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলেও যে তাঁহার যথেষ্ট সৌভাগ্য, ইহাও ব্যক্ত করি-তেছে। তাহার আক্ষেপ শুনিয়া খুড়ী হতাশভাবে বলিতেছেন, 'হায় মা, মাথা পেতে দাঁড়াবার জায়গা নাই, আর মাথায় জল দেব। কপাল আমার!'

ব্রজ চুপ করিয়া শুইয়া এই সকল আক্ষেপোক্তি শুনিতে লাগিল।

তার পর উমার বিবাহ হইল। খুড়ী মারা গেল। ব্রজ তিলকাঞ্চনে খুড়ীর শ্রাদ্ধ করিল। রসিক তখন পাঠশালা ছাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জমীদারী-কাছারীর গোমস্তা শিবু চক্রবর্ত্তীকে ধরিয়া ব্রজ তাহাকে পাটোয়ারী কাজের শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করিয়া দিল।

চারি বৎসর শিক্ষানবীশীর পর রসিকের মাসিক পাঁচ টাকা মাহিনা হইল। ব্রজনাথের আনন্দের সীমা রহিল না। সে মহোৎসাহে ভ্রাতার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিল। লোকে বলিল, 'ব্রজ, আগে নিজে বিয়ে ক'রে তার পর ভায়ের বিয়ে দেবে।'

ব্রজ উত্তর করিল, 'আমার কি আর বিয়ের বয়স আছে? এখন ছোঁড়াটার মাথায় এক গণ্ডূষ জল না দিয়ে নিজে টোপর মাথায় দেওয়া কি সাজে?'

তাহাই হইল। ব্রজনাথ দুই শত টাকা কন্যাপণ দিয়া রাধানগরের নকুড় ঘোষের বারো বছরের মেয়ে থাকমণিকে ঘরে আনিল। বিবাহের এক মাস পরেই রসিক নরুণচকের গোমস্তার পদে নিযুক্ত হইল। নকুড় ঘোষ গর্ব্ব-সহকারে ব্রজনাথকে বলিল, 'আমার মেয়ের আয়-পয়টা দেখলে হে সরকারের পো?'

আহ্লাদে গদগদকণ্ঠে ব্রজনাথ বলিল, 'ছোট বৌমা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।'

কিন্তু মাস কয়েক পরে যখন উমার বৈধব্য-সংবাদ আসিয়া ব্রজনাথের আনন্দটাকে ম্লান করিয়া দিল, তখন সে ছোট বৌমার লক্ষ্মীত্বের উপর সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পারিল না। সে নিজে গিয়া সদ্যোবিধবা উমাকে

গৃহে লইয়া আসিল। রসিক বলিল, 'রায় মহাশয়ের ( উমার স্বামীর ) জমী জায়গাগুলার কি বন্দোবস্ত কর্‌লে?'

ব্রজনাথ উদাসভাবে বলিল, 'সে উমির দেওর যা হয় করবে।'

রসিক বলিল, 'সে একা ভোগ করবে?'

বিরক্তির সহিত ব্রজনাথ বলিল, 'ভোগ করুক, বিলিয়ে দিক্, সে তার খুসী। আমার কি অত ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে? আমার তিন তিন দিন দোকান বন্ধ!'

জ্যেষ্ঠের নির্ব্বুদ্ধিতায় রসিকের হাসি আসিল। হাসি চাপিয়া সে মনে মনে স্থির করিল, সুবিধামত এক দিন গিয়া জমীজায়গাগুলার বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া আসিবে। অল্প জমী ত নয়, আট দশ বিঘা লাখরাজ জমী, অন্ততঃ সাত আট শো টাকায় বিক্রয় হইবে।

২

'উমি, ও উমি, ও পোড়ারমুখী!'

'কেন গা দাদা?'

'বলি—এ সব কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে আবার?' বলিয়া উমা ছুটিয়া আসিল, এবং অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, 'ঐ ত তোমার তামাক সাজা রয়েছে, ধরিয়ে খাও না।'

'আর এই গাড়ুর জল? এটাও খেতে হবে নাকি?'

রাগে চোখ মুখ ঘুরাইয়া উমা বলিল, 'না, আমার ছরাদ করতে হবে।'

ব্রজনাথ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, 'এই পোড়ারমুখী রেগে মরেছে।'

মুখখানা ভারী করিয়া উমা বলিল, 'তোমার কথায় মরা মানুষেরও রাগ হয়, আমি তো জ্যান্ত মানুষ। তামাক সাজা রয়েছে, খাবে; গাড়ুতে জল আছে, মুখ হাত পা ধোবে; তা নয়, এটা কি হবে, ওটা কি হবে?'

তাহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া ব্রজ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'মর পোড়ারমুখী, সাধে কি বলি? তোর আক্কেলটা কি রকম? আমি মুদী মানুষ, আমার কি এই সাজা তামাক খাওয়া, গাড়ুর জলে পা ধোয়া পোষায়?'

ভ্রাতার মুখের উপর একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উমা গাড়ুটা তুলিয়া লইল, এবং জলটা উঠানে ঢালিয়া ফেলিতে ফেলিতে ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, 'আমার ঝকমারি হয়েছে; তুমি পুকুরঘাটে পা ধুয়ে এস; নিজে তামাক সেজে

খাও; আমি যদি আর কক্ষনো তোমার কাজ করতে যাই, আমাকে গুণে সাত ঝাঁটা মেরো।'

ব্রজ তাহার হাত হইতে গাড়ুটা কাড়িয়া লইয়া হাস্যপ্রফুল্লকণ্ঠে বলিল, 'দূর পাগলী, তুই না করলে আমার কাজ করবে কে?'

'ভূতে' বলিয়া উমা রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ব্রজনাথ কিন্তু তাহার রাগ দেখিয়া একটুও শঙ্কিত বা বিমর্ষ হইল না; উমার এই তীব্র ক্রোধের ভিতর দিয়া যে একটা স্নেহের আভাস ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহারই মাধুর্য্য উপভোগ করিতে করিতে সে প্রফুল্লমুখে কলিকায় আগুন ধরাইল। তার পর ফুঁ দিয়া আগুনটা জমকাইয়া লইয়া তামাকে টান্ দিতে দিতে ডাকিল, 'উমি, ও উমি!'

দুই তিন বার ডাকের পর উমা আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল, এবং ভারী মুখে গম্ভীরস্বরে বলিল, 'আবার কি? হুঁকোর বাসি জলটা চাই নাকি? কিন্তু তা তো আর পাবার উপায় নাই।'

ব্রজ এমনই জোরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল যে, সে হাসি তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে মিলিয়া বিষম কাশি উৎপাদন করিল। খানিকটা খুব কাশিয়া হাসিয়া সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'নাঃ, তুই নেহাৎ হাসালি উমি।'

উমা গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রজনাথ হুঁকায় একটা জোর টান দিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'তুই রাগ করিস্ কেন? আমি বলছিলাম কি জানিস্?'

'কি বলছিলে?'

'আমি বলি যে, আমার এত করবার দরকার কি? যার না করলে চলে না, তাকে একটু দেখবি শুনবি।'

'তাকে দেখবার লোক কোন নাই?'

'থাকলেও ছোট বৌমা একা, সংসারের কাজ কর্ম্ম আছে। আর আমি যেমন সব নিজের হাতে ক'রে নিতে পারি, সে তা পারে না। তার পান থেকে চূণটী খস্‌লে কি কাণ্ডটা করে, তা জানিস্ তো?'

'খুব জানি।'

'সেই তরেই তো বলি, তার দিকে একটু নজর রাখবি।'

ভ্রূভঙ্গী করিয়া উমা বলিল, 'সে হ'লো দশ টাকা মাইনের গোমস্তাবাবু, আর তুমি দোকানদার।'

ব্রজ পুনরায় হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'এই দেখ্ দেখি তোর ছেলেমানুষী! নাঃ, তোর কোনও কালেই বুদ্ধি হবে না।'

উমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না হয় না হবে।'

ব্রজনাথ মস্তক আন্দোলন করিতে করিতে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিল, 'না হয় না হবে! একটু বুঝে দেখ্ না। আমার তরে তো কিছু আটকায় না। আর হাজার হোক, রস্‌কে হ'লো তোর মার পেটের ভাই। বলে— আক চেয়ে কি সোঁদর মিঠে?'

ক্রোধতীব্রকণ্ঠে উমা বলিল, 'তাই ভেবেই তুমি বুঝি আমার কাজ পছন্দ কর না দাদা? আমাকে তুমি আজ কাল পর ভাব?'

হাসিতে হাসিতে ব্রজনাথ বলিল, 'মনে কর্ না—তাই ভাবি। আর আমার দেখাদেখি তুইও আমাকে একটু পর ভাব দেখি।'

উমা রাগে মুখ ভার করিয়া নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রজনাথ বলিল, 'আসল কথাটা কি জানিস্, আমার কাজ কর্‌তে গিয়ে তোকে যে লাঞ্ছনা সইতে হবে, সেটা কি ভাল?'

উমা বলিল, 'আমার আবার কিসের লাঞ্ছনা বল তো?'

মৃদু হাসিয়া ব্রজনাথ বলিল, 'কিসের লাঞ্ছনা, তা তুইই জানিস্ উমি, তবে আমাকে আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিস্ কেন? একে তো তোর কপাল পুড়ে আমার বুকে বাজ পড়েচে, তার উপর আমার তরে যদি তোকে দু'কথা শুনতে হয়—না উমি, তা আমার সহ্য হবে না।'

ব্রজনাথের স্বরটা গাঢ় হইয়া আসিল। উমা জোরে মাথা নাড়িয়া ভারী গলায় বলিল, 'না হয় না হবে, কিন্তু আমি কারও দাসী বাঁদী নই যে, সকলের কাজ কত্তে যাব। আমি কারও কিছু কর্‌তে পারব না, তাতে আমাকে ভাত কাপড় দাও—চাই না দাও।'

উমার দুই চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ ঢাকিয়া ছুটিয়া পলাইল। ব্রজনাথের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না, সে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া আপন-মনে বলিল, 'না, মেয়েমানুষগুলোর সঙ্গে পেরে উঠবার যো নাই।'

সে হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতে লাগিল। হঠাৎ রন্ধনশালা হইতে ছোট বোয়ের মৃদু অথচ তীব্র কণ্ঠস্বর তাহার কাণে আসিল। সে মুখের কাছ হইতে হুঁকাটা সরাইয়া কাণ খাড়া করিয়া রহিল। শুনিতে পাইল,

ছোট বৌ উমাকে উদ্দেশ করিয়া আপন-মনে বলিতেছে, 'দরদ দেখেও বাঁচি না। আদরের বোন; একটা সংসার পেটে পুরে এসেছেন, এখন আবার এ সংসারটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্চেন।'

হুঁকাটা বাঁ হাতে ধরিয়াই ব্রজনাথ ঘরের বাহির হইয়া আসিল, এবং ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে ডাকিল, 'ছোট বৌমা!'

ছোট বোয়ের কণ্ঠ নীরব হইল। ব্রজনাথ রোষরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, 'মুখ সামলে কথা কইবে বৌমা, উমি কারও বাবার ঘরে যায় নি, সেটা মনে রেখো।'

সে হুঁকাটা রাখিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

৩

মেয়েমানুষ বিধবা হইয়া ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় লইলে, তাহাকে ভ্রাতার না হউক, অন্ততঃ ভ্রাতৃবধূর পাঁচ কথা শুনিতে হয়। ইহার উপর উমা যখন ব্রজনাথের উপর একটু বেশী টান দেখাইতে লাগিল, তখন এই পক্ষপাতিতার জন্য তাহাকে বেশ দশ কথা শুনিতে হইল। কথা শুনিলেও উমা কিন্তু এই পক্ষপাতিত্ব না দেখাইয়া থাকিতে পারিত না। সে যখন দেখিল, দাদা—যে এই সংসারের স্তম্ভস্বরূপ, আপনার সকল শক্তি সামর্থ্য দিয়া যে এই সংসারটীকে খাড়া করিয়াছে, এবং সে জন্য যাহার নিজের দিকে চাহিবার অবসর একটুও হয় নাই, সেই লোকটীর নিঃস্বার্থতা কাহারই সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই, তাহার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহে না, অথচ সে সংসারের এই গভীর অবজ্ঞাকে এমনই অনায়াসে সহ্য করিয়া যাইতেছে, যাহা রক্ত মাংসের শরীরে নিতান্তই অস্বাভাবিক ও আশ্চর্য্যজনক; সময়ে এক ঘটী জল, এক মুঠা ভাত পাইলেই সে কৃতার্থ হয়, অথচ সেটাও যেন তাহার ন্যায্য প্রাপ্যের মধ্যেই নয়, শুধু অপরের দয়ার উপরেই তাহার জীবনটা নির্ভর করিতেছে; যেন রাজ্যেশ্বর আপনার রাজৈশ্বর্য্য সব বিলাইয়া দিয়া ভিক্ষুকের বেশে লোকের করুণা চাহিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তখন ব্রজনাথের এই মহত্ত্বপূর্ণ ভিক্ষা উমার হৃদয়ে সম্ভ্রম ও ভক্তির উদ্রেক করিলেও লোকের নিদারুণ অকৃতজ্ঞতা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল; সুতরাং সে এই সকল অকৃতজ্ঞ লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া অন্যায়ের প্রতীকারে উদ্যত হইল।

কিন্তু এই অন্যায়ের প্রতিরোধ-চেষ্টাই যে কাহারও কাহারও নিকট নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হইল, তাহা উমা বুঝিল না। আমার যাহা কর্ত্তব্য,

তাহা আমি পালন করি বা না করি, অন্যে আসিয়া যে আমার কর্ত্তব্যের অসম্পূর্ণতাটুকু পূরণ করিয়া দিবে, ইহা সহ্য করিতে পারি না; মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আসিয়া এখানে কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে একটা বিদ্বেষ উৎপাদন করে, এবং তাহাতেই অপরের অযাচিত উপকারও শ্লেষ ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় না। সুতরাং জ্যেষ্ঠের উপর উমার পক্ষপাতে ছোট বোয়ের অন্তর বিদ্বেষে ভরিয়া উঠিল। সে বিদ্বেষটা ব্রজনাথের উপর নয়, উমার উপরেও নয়, শুধু নিজের অসম্পূর্ণ কর্ত্তব্যের উপর উমা যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সেইটুকুর উপরেই তাহার সকল ক্রোধ, সকল বিদ্বেষ আসিয়া পড়িল, এবং তাহার ফলে সময়ে সময়ে উমাকে বেশ দুই পাঁচ কথা শুনিতে হইল। উমা কিন্তু সে সব কথা গায়ে মাখিয়া সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করিতে চাহিত না। সে সহিষ্ণুতার সহিত আপনার কাজ করিয়া যাইত।

কিন্তু সে দিন তাহার জন্য ব্রজনাথকে বিচলিত হইতে এবং ছোট বোয়ের পিতৃ-উচ্চারণ করিতে শুনিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার পর ব্রজনাথ দোকান বন্ধ করিয়া ঘরে আসিলে সে জ্যেষ্ঠের নিকট গিয়া তিরস্কারের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার রকম কি দাদা?'

ব্রজনাথ স্বাভাবিক মৃদু হাস্যের সহিত উত্তর দিল, 'কিসের রকমটা উমি?'

উমা ঘাড় দোলাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল, 'তোমার উপর অন্যায় হইলে আমি কিছু বলতে পাব না, তবে আমার কথায় তুমি কথা কইতে যাও কেন?'

তাহার মুখের উপর হাস্যপ্রফুল্ল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ব্রজনাথ বলিল, 'তুই যে ছোট বোনটী।'

উমা ঘাড় নাড়িয়া ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিল, 'কক্ষণো না, তুমিই বলেছ, মার পেটের ভাই নও, পর।'

উমার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। ব্রজনাথ ঘাড় নীচু করিয়া তামাক সাজিতে লাগিল। উমা ভারী গলায় বলিল, 'আমার তা হ'লে এখানে থাকা হবে না, দাদা।'

ব্রজনাথ মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?'

উমা বলিল, 'পরের জন্য কথা কইতে গিয়ে তুমি যে একটা অনর্থ বাধাবে, তা আমি দেখতে পারব না।'

মুখ তুলিয়া সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, 'দূর পোড়ারমুখী, তুই পর?'

উমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ব্রজনাথ

বলিল, 'সত্যি উর্মি, মুখের কথা আর হাতের শর, একবার ছাড়লে আর ফেরে না। ছোট বৌমাকে কথাটা ব'লে অবধি মনটা খারাপ হ'য়ে আছে।'

উমা নিরুত্তর। ব্রজনাথ বলিল, 'দাঁড়িয়ে রইলি যে, বোস্ না।'

উমা বসিল। ব্রজনাথ হুঁকার মাথায় কলিকা বসাইয়া ফূৎকার দ্বারা হুঁকার ধূলা ঝাড়িয়া তাহাতে টান দিল। ঘরের ভিতর রেড়ীর তেলের আলোটা মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সেই অস্পষ্ট আলোকে ঘরের জিনিস-পত্রগুলা ঝাপ্সা দেখাইতেছিল। বাহিরে মেঘের গুরু-গম্ভীর ধ্বনির সঙ্গে ঝিম্-ঝিম্ বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঘরের পিছনে খিড়কীপুকুরের পাড় হইতে ভেকের অশ্রান্ত চীৎকার উত্থিত হইতেছিল। ঠাণ্ডা বাতাসটা রহিয়া রহিয়া উদাস-ভাবে বহিয়া যাইতেছিল।

উমা ডাকিল, 'দাদা!'

'কেন উর্মি?'

'আমার একটা কথা রাখবে?'

'তোর কোন্ কথা না রাখি?'

'সে ছোট খাট কথা!'

'বড় কথাই একটা ব'লে দেখ।'

'বল্‌লে রাখবে?'

'রাখবো।'

'তুমি বিয়ে কর।'

এই অসম্ভাবিত প্রস্তাবে ব্রজনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িয়া চোখ দুইটা বিস্তৃত করিয়া উমার মুখের দিকে চাহিল। বিস্ময়স্তব্ধকণ্ঠে বলিল, 'বিয়ে! আমি!'

জোর গলায় উমা বলিল, 'হাঁ,তুমি। কেন, তোমাকে কি বিয়ে কত্তে নাই?'

ব্রজনাথ নিঃশব্দে তামাক টানিতে লাগিল। উমা তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া আগ্রহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বল?'

ব্রজনাথ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'পাগল! বিয়ে!—এই বয়সে?'

উমা বলিল, 'কত আর বয়স তোমার? জোর তিরিশ হবে।'

ব্রজনাথ বলিল, 'দূর, আট গণ্ডা সাড়ে আট গণ্ডা হবে।'

উমা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, 'তবে আর কি তোমার বিয়ের বয়স আছে? তোমার বোনকে কত বয়সের ছোকরার হাতে দিয়েছিলে?'

'যতই হোক, তিরিশের বেশী হবে না।'

বলিয়া ব্রজনাথ একটু ম্লান হাসি হাসিল। বাহিরে বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গড়্-গড়্ শব্দে ডাকিয়া উঠিল। ব্রজনাথ জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তামাক টানিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উমা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বল দাদা?'

ব্রজনাথ মুখখানাকে একটু বিকৃত করিয়া বলিল, 'ছিঃ, লোকে কি বলবে?'

'কিন্তু লোকে কি অসময়ে তোমার মুখে এক গণ্ডূষ জল দিতে আসবে?'

'লোকে না দেয়, তুই দিবি।'

'আমার দায় পড়েছে।'

বলিয়া উমা রাগে মুখ ফিরাইয়া লইল। ব্রজনাথ গম্ভীরভাবে হুঁকায় টান দিতে দিতে বলিল, 'কিন্তু বিয়ে তো মুখের কথা নয়, তিন চার শো টাকা চাই।'

উমা বলিল, 'সে সব আমি জানি না, তুমি করবে কি না, তাই বল।'

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, 'যদি না করি?'

উমা উঠিয়া দাঁড়াইল, তর্জ্জনী উদ্যত করিয়া ক্রোধগম্ভীরস্বরে বলিল, 'তা হ'লে এই ভিটেয় যদি তেরাত্তির পোয়াই, তবে আমার নাম উমিই নয়।'

বলিয়া উমা ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। ব্রজনাথ ডাকিল, 'শোন্ উমি, শোন্।'

উমা কিন্তু ফিরিল না। ব্রজনাথ হুঁকাটা মুখের কাছে ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে বৃষ্টির ঝম্-ঝম্ শব্দটা একটু প্রবল হইয়া আসিল।

৪

পর দিন রসিক বাড়ী আসিলে উমা তাহাকে ধরিয়া বসিল। দাদা বিবাহ করিবে শুনিয়া রসিক প্রথমে খুব খানিকটা হাসিল; তার পর বিজ্ঞোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, 'বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, রোজগারের ক্ষমতা নাই, ওকে মেয়ে দেবে কে?'

রসিকের কথায় উমার রাগ হইল; রাগিয়া বলিল, 'দাদার রোজগারের ক্ষমতা না থাকলে আজ তুমি রোজগারী হ'তে না ছোটদা।'

রসিক এই রূঢ় উত্তরে ভ্রূকুটী করিল। উমা বলিল, 'টাকা পেলে মেয়ে দেবার অনেক লোক আছে, তুমি মেয়ের চেষ্টা দেখ।'

রসিক বলিল, 'তা যেন দেখবো, কিন্তু টাকা? দাদার হাতে টাকা আছে?'

'তা আমি জানি না।'

'কিন্তু সেটা আগে জানা দরকার। দেনা আমি করতে পারব না, ঋণ পাপকে আমার বড্ড ভয়।'

উমা বলিল, 'দেনাই হোক, পাওনাই হোক, বিয়ের চেষ্টা তুমি দেখ।'

উমা চলিয়া গেলে ছোট বৌ স্বামীকে বলিল, 'আসল কথাটা কি জান, ঠাকুরঝিই ওঁকে বিয়ের তরে ধরে বসেছে।'

রসিক গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া উত্তর করিল, 'সেটা আমি বুঝি, তা নৈলে এত দিনের পর দাদার বিয়ের ঝোঁক উঠবে কেন। বুড়ো বয়সে চূড়োকরণ।'

ছোট বৌ বলিল, 'তা চূড়োকরণই হোক, আর যাই হোক, তুমি চেষ্টা দেখ। নয় তো ভারী লোকনিন্দে হবে। অমনই তো লোকে কত কথা বলে, নিজে বিয়ে করলে না, ভায়ের বিয়ে দিলে!'

বিরক্তিপূর্ণস্বরে রসিক বলিল, 'কেন দিলে? আমি কি বিয়ের তরে কেঁদে বেড়িয়েছিলাম?'

ছোট বৌ বলিল, 'তা তুমি কেঁদেই বেড়াও, আর হেসেই বেড়াও, উনি যেমন তোমার বিয়ে দিয়েছেন, তেমনি তুমিও দিয়ে দোষ থেকে খালাস হও।'

ক্রোধে মুখভঙ্গী করিয়া রসিক বলিল, 'বিয়ে দেব, টাকা কোথায়? তিন চার শো টাকা চাই।'

ছোট বৌ বলিল, 'তুমিও কতক দাও, উনিও কতক যোগাড় করুন। তুমি তো আমাকে দু'শো টাকার নেক্‌লেস দেবে বলেছিলে, সেই টাকাটাই না হয় দাও না।'

বলিয়া ছোট বৌ একটু হাসিল। রসিক কিন্তু সে হাসিতে একটুও প্রীত হইল না; রাগে হাত নাড়িয়া বলিল, 'সে টাকা আমার বাক্সে তোলা আছে কি না? পূজোর কিস্তী না এলে হবে না।'

অগত্যা ছোট বৌ নিরস্ত হইল। উমা কিন্তু নিরস্ত হইল না; সে শুধু ছোটদার উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না, প্রতিবেশীদিগকেও চেষ্টা দেখিবার জন্য অনুরোধ করিল। প্রতিবেশীরা সরলপ্রাণ ব্রজনাথের উপর সন্তুষ্ট ছিল, এবং সে বিবাহ না করায় তাহাদের অনেকে দুঃখিত হইয়াছিল। এক্ষণে ব্রজনাথ বিবাহ করিবে শুনিয়া তাহারা মহোৎসাহে পাত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

পাত্রীর অভাব হইল না। তিন শত টাকা পণে একটী মেয়ে স্থির হইল। বিবাহের দিনও নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। সব ঠিক হইয়া গেলে রসিক জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল, 'টাকার যোগাড় আছে তো দাদা?'

ব্রজনাথ হাসিয়া বলিল, 'টাকার যোগাড় না ক'রে কি কাজে হাত দিয়েছি রে ভাই!'

রসিক শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ঐ তো সামান্য তিন পয়সার দোকান; উহার দ্বারা সংসার চলে; তাহার উপর এক কথায় এত টাকার যোগাড় কিরূপে হইল? কথাটা বুঝিতে না পারিলেও রসিক মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না, নিজেই তোলাপাড়া করিতে লাগিল। রসিক জানিত না যে, সঞ্চয়ী ব্রজনাথ যে উপায়ে কিছু কিছু জমাইয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিল, সেই উপায়েই এই কয় বৎসরে সে আড়াই শত টাকা জমাইয়াছিল; বাকী শ' খানেক টাকা কর্জ্জ করিবে, স্থির করিয়াছিল।

রসিক ভিতরের কথা জানিত না, সুতরাং সে আপনার পাটোয়ারী বুদ্ধির দ্বারাও এই অর্থ-সংগ্রহের রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিল না। অনেক চিন্তার পর অবশেষে সে যেন একটা সূত্র খুঁজিয়া পাইল, এবং সেই সূত্র ধরিয়া সে একেবারে উমার শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল।

সেখানে গিয়া রসিক যাহা দেখিল, তাহাতে সে যেন সহসা গাছ হইতে পড়িল। সে দাদাকে বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য বলিয়াই জানিত, কিন্তু সে যে এতটা বিশ্বাসঘাতক, এমন জুয়াচোর হইতে পারে, ইহা কোনও দিন কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। সে উমার দেবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জমী জায়গা-গুলার বন্দোবস্তের কথা তুলিতেই উমার দেবর তাহাকে একখানা বিক্রয়-কোবালা দেখাইয়া দিল। রসিক দেখিল, তাহাতে উমা আপনার অংশের সমস্ত সম্পত্তি ছয় শত টাকায় দেবরকে বিক্রয় করিয়াছে। দলীলে ব্রজনাথ বকলমে উমার নাম স্বাক্ষর করিয়াছে; তাহার নীচে উমা বুড়া আঙ্গুলের ছাপ দিয়া দলিল রেজিষ্টারী করিয়া দিয়াছে। দেখিয়া রসিকের ক্রোধ ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। এতক্ষণে সে দাদার বিবাহের টাকা যোগাড়ের গুপ্ত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল।

৫

গাত্রহরিদ্রার পূর্ব্ব দিনে সন্ধ্যার আগে ছোট বৌ বরণডালা সাজাইতেছিল; উমা পাশে বসিয়া কাল কখন কি করিতে হইবে, ছোট বৌকে তাহারই উপদেশ

দিতেছিল। ব্রজনাথ নিজের ঘরের দাবার উপর বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে উমাকে ডাকিয়া বলিল, 'আর কি কি চাই, এই সময়ে বল্ উমি, এর পর কাজের সময় এটা চাই, ওটা নিয়ে এস ব'লে যেন জ্বালাতন করিস্ নে।'

উমা সহাস্যে বলিল, 'কও কথা দাদা, এর মধ্যেই জ্বালাতনের ভয়? এই তো কলির সন্ধ্যা। এর পর বৌ এসে যে দিনরাত জ্বালাতন করবে। কি বল বৌদি?'

ছোট বৌ ভ্রূভঙ্গী করিয়া নিম্নস্বরে বলিল, 'দূর!'

ব্রজনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'সে জ্বালাতন শুধু আমি একা হব না উমি, তোরা দু'জনেও তার ভাগ পাবি।'

উমা হাসিয়া উঠিল। ছোট বৌ মৃদুস্বরে বলিল, 'মেয়ের গায়ে-হলুদের কাপড়টা কিন্তু ভাল হ'ল না।'

উমা ডাকিয়া বলিল। 'শুনছো দাদা?'

ব্রজনাথ বলিল, 'ওগো! বুড়ো বরের কনে, তার কাপড়ের ভাল মন্দ নাই।'

উমা হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তুমি বুড়ো ব'লে কনে তো বুড়ী নয়?'

ব্রজনাথ একটু হাসিয়া হুঁকায় ঘন-ঘন টান দিতে লাগিল। হঠাৎ একবার মুখের কাছ হইতে হুঁকাটা সরাইয়া বলিল, 'এ ছোঁড়া গেল কোথায়? কাল গায়ে হলুদ, আজ পর্য্যন্ত দেখা নাই। নিজের বিয়ের বাজার আপনাকে করতে হবে জানলে উমি, কখনও তোর কথা শুনতাম না। ছি ছি, লোকে বলবে কি?'

উমা বলিল, 'বলবে কেন, বলছে।'

'কি বলছে?'

'নিন্দে। পাড়ায় কাণ পাতা দায়।'

'তোর মাথা!' বলিয়া ব্রজনাথ হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির বেগ না থামিতেই রসিক ধীরে ধীরে বাড়ী ঢুকিল। ব্রজনাথ ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, 'এই যে, কোথায় ছিলি রে? আমাকে গাছে তুলে দিয়ে বুঝি সরে দাঁড়িয়েছিলি?'

গম্ভীর ভাবে 'হুঁ' বলিয়া রসিক ধীরগম্ভীরপদে নিজের ঘরে ঢুকিল। মুখ হাত ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া রসিক নিজের ঘরের দাবায় বসিল। ব্রজনাথ লণ্ঠন জ্বালিয়া গাত্রহরিদ্রার পান সুপারী আনিবার জন্য বাহির হইতেছিল; এমন সময় রসিক ডাকিল, 'দাদা!'

লণ্ঠনটা উঠানে রাখিয়া ব্রজনাথ উত্তর দিল, 'কি রে রসিক ?'

রসিক বলিল, 'সত্যি কথা বলবে ?'

ব্রজনাথ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, 'সত্যি কথা ? মিছে কথাই বা বলবো কিসের তরে ?'

তীব্রকণ্ঠে রসিক বলিয়া উঠিল, 'আর তোমার সাধুতা জানাতে হবে না। বিয়ের টাকাটা কোথা থেকে যোগাড় হলো শুনি।'

বিস্ময়ের সহিত ব্রজনাথ বলিল, 'কেন বল্ তো ?'

রসিক বলিল, 'কেন কি ? বলে ফেল না।'

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, 'চুরী করেছি।'

গর্জ্জন করিয়া রসিক বলিল, 'চুরী নয়, জুয়াচুরী করেছ।'

ব্রজনাথ বিস্ময়ে নীরব। ছোট বৌ রন্ধনশালার দরজা দিয়া মুখ বাড়াইল। উমা দাবার খুঁটীটা ধরিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রসিক বলিল, 'একটা অবীরা বিধবার সর্ব্বনাশ করে' বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে লজ্জা করে না ?'

ব্রজনাথ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ধীর-প্রশান্ত-কণ্ঠে বলিল, 'তুই কি বলছিস্ রসিক ?'

রসিক বলিল, 'উমার জমীজায়গা কত টাকায় বেচে এসেছ ?'

বিস্ময়রুদ্ধকণ্ঠে ব্রজনাথ বলিল, 'কত টাকায় ?'

রসিক চীৎকার করিয়া বলিল, হাঁ, ছ'শো টাকা নিয়ে ওর দেওরকে বিক্রী-কোবালা লিখে দিয়ে এসেছ। আর সেই টাকাগুলা এত দিন গাপ্ করে রেখে এখন বিয়ে করতে যাচ্ছ। কেমন, ঠিক কি না ?'

ব্রজনাথ এমনই জোরে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল যে, তাহাতে রসিকও চমকিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া সে হাস্যপ্রফুল্লকণ্ঠে বলিল, 'আচ্ছা চুরী তুই ধরেছিস্ রসিক। ওরে মুখ্যু, গোপাল রায় যখন কাঁদতে কাঁদতে বললে, "এই ক' বিঘে জমীই পুঁজি দাদা, এই নিয়ে যদি তোমরা হাঙ্গামা বাধাও, তা হ'লে ছেলে পিলে নিয়ে আমি মারা যাব।" তখন আমিও ভেবে দেখলাম, কথাটা ঠিক। কিন্তু মানুষের মন নয় মতিভ্রম। তাই উমিকে দিয়ে একেবারে সাফ বিক্রী-কোবালা লিখে দিয়ে এলাম। ব্যস্, হাঙ্গামার মূলোচ্ছেদ। বুঝলি ?'

রসিক কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া শ্লেষ পূর্ণস্বরে বলিল, 'চমৎকার গল্প বলেছ দাদা, কিন্তু আমিও পাটোয়ারীতে ঘুণ। এখন যদি ভাল চাও, টাকাগুলি বের করে দাও।'

ব্রজনাথ জোর গলায় বলিল, 'যদি না দিই ?'

রসিক বলিল, 'মগের মুল্লুক নাকি ? কালই দশ জন ভদ্রলোক ডেকে এর বিচার করবো। আমি রসিক সরকার, সহজে ছাড়বো, মনে করো না।'

ব্রজনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর ধীরগম্ভীরকণ্ঠে বলিল, 'ভদ্রলোক ডাকিয়ে আমাকে অপমান করবি ?'

রসিক মাথা নাড়িয়া বলিল, 'নিশ্চয়।'

কিন্তু উমির টাকায় তোর কি অধিকার ?'

'সম্পূর্ণ অধিকার। কেন না, সে আমার বোন।'

ব্রজনাথের হৃদয় ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল।

রসিক বলিল, 'যদি ভাল চাও, অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা আমায় দাও।'

ব্রজনাথ লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিল, এবং অবিলম্বে বাহির হইয়া আসিয়া রসিকের সম্মুখে তিন শত টাকা রাখিয়া দিল। উমা চীৎকার করিয়া বলিল, 'কর কি দাদা, কাল যে গায়ে-হলুদ !'

ব্রজনাথের ওষ্ঠপ্রান্তে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। উমা ছুটিয়া আসিয়া নোটের তাড়াগুলা তুলিয়া লইতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রসিক সেগুলাকে হস্তগত করিল। উমা চীৎকার করিয়া বলিল, 'নিমকহারাম, দাদা যে নিজের বিয়ের টাকায় তোমার বিয়ে দিয়েছে ! তোমার এই অন্যায় কি ধর্ম্মে সইবে ?'

ব্রজনাথ তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'ছি উমি, আমার সামনে ওকে শাপ-সম্পাৎ দিস্ নে।'

উমা বলিল, 'কিন্তু তোমার যে বিয়ে !'

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, 'আর বিয়ে নয় উমি, বিয়ে না হ'তেই যে রসিক পর হ'তে যাচ্ছিল, বিয়ে হলে সে কি হ'তো বল্ দেখি।'

ছোট বৌ অগ্রসর হইয়া নিম্নস্বরে বলিল, 'সে যা হয় হবে, কিন্তু তুমি বল ঠাকুরঝি, ঐ টাকা ক'টার তরে ওঁর বিয়ে আটকাবে না।'

বলিয়া সে আপনার গায়ের গহনাগুলা খুলিয়া ব্রজনাথের পদপ্রান্তে স্থাপন করিল। ব্রজনাথ সবিস্ময়ে বলিল, 'এ সব কি হবে ছোট বৌমা ?'

মৃদুস্বরে ছোট বৌ বলিল, 'আপনার বিয়ে ?'

ব্রজনাথ আবার হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তবে আজ আর একবার বলি বৌমা, এগুলা কি তোমার বাবার যে, যাকে তাকে দান করতে বসেছ ? আমার বিয়ে আটক করে কে ?'

বলিয়া সে আস্তে আস্তে গিয়া রসিকের হাতটা ধরিল, এবং তাহার হাত হইতে নোটের তাড়া কাড়িয়া লইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। রসিক হত-বুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

# কবি-তর্পণ।

[ স্বর্গীয় কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের স্মরণে। ]

১

গাঁথিতে গাঁথিতে মালা আজি মালাকর—
ফুল-মাঝে কোথা অন্তর্ধান?
কত স্ফুট, কত কলি—
গেছে যে চরণে দলি',
গেছে ফেলি' বীণা তার, কাঁদেনি অন্তর।
শুনিবে কি আকুল আহ্বান?

২

কোথা গেল রাজহংস ত্যজি' পদ্মসর—
কোন্ স্বচ্ছ মানসের তীরে?
অমরীরা কুতূহলে
ক্রীড়া করে যার জলে
উৎক্ষেপিয়া রাশি রাশি মুকুতা-শীকর!
সেথা হ'তে আসিবে কি ফিরে?

৩

মেঘের ঝঞ্জনা-ধ্বনি—প্রাবৃট-উৎসব
কঠোর কি বেজেছিল কানে?
তাই কি সে পিকবর
গেলা উড়ি' দেশান্তর,
( অনন্ত বসন্ত যেথা কাকলী-সুরব )
মুখর করিতে মধু গানে!

৪

হে অতৃপ্ত, ফুলে ফুলে মধুপ যেমন
ভাব-মধু করিলে সঞ্চয়;
আজি কোথা গেলে উড়ি',
( পাব না ত মাথা খুঁড়ি' )
কোন্ অভিনব কুঞ্জে করিতে গুঞ্জন—
হে তৃষিত হইলে উদয়?

৫

উত্তীর্ণ যে হয় সন্ধ্যা—ওগো পুরোহিত,
অর্চ্চনার কাল বুঝি বহে।
সাঁঝের আরতি তরে
ধর গো 'প্রদীপ' করে,
তোমার মঙ্গল-শঙ্খ কর গো ধ্বনিত,—
এস এস, বিলম্ব না সহে!

৬

এত ত্বরা, লীলা শেষ! হে সুহৃৎ কবি,—
সাঙ্গ কি হ'য়েছে তব গান?
প্রকৃতির বুকে মধু—
তেমনি ত আছে, বঁধু,
মালঞ্চে তেমনি ফুল, অক্ষয় সুরভি!—
নহে নহে আজি অবসান!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

# ঝুলন।

গৌড় মল্লার।

সখি কি বলিবি মোরে, না দুলে দোলায়
সে যে কোথা গেল চলে সারা বাদলায়।
কেমনে গো রহিবে সে মোরে আজি ভুলে,
যখন বাদল-হাওয়া বহে অনুকূলে।
যমুনার নীল জল সঘনে আনন্দে
বহিতেছে দুলে দুলে তরঙ্গের ছন্দে।
গহন গগনতল কেকারবে পূরে
ময়ুর ময়ূরী দুলে সাওনীর সুরে;
কদম্বের চারিদিকে গন্ধে পুলকিত,
দুলিছে শুনিবে বলে বাঁশরীর গীত।
যবে গরজিবে মেঘ বাদলেতে ভারী,
শূন্য দোলে বসে রব কেমনে গো নারী!
আমারি নয়ন শুধু বরষায় ঝুরে—
ব্যর্থ মোর মন-সাধ সে রহিল দূরে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আষাঢ়।—প্রথমেই স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একখানি ছবি আছে। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় একটী সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিশেষ কোনও তথ্য নাই। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বুদ্ধ-পূর্ণিমা' পড়িয়া মনে হয়, কবির প্রতিভা যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। কোনও বিশেষত্ব নাই। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকারের 'বৌদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি' সংক্ষিপ্ত হইলেও তথ্যপূর্ণ। শ্রীগুরুদাস সরকারের 'শ্রীমন্দির-পরিক্রমা' উল্লেখযোগ্য। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ অধিকারীর 'শুভদৃষ্টি' অনধিকারীর অনধিকারচর্চ্চা।—প্রথমেই 'সজল জলদ ছেয়েছে বিমান, বিমানধরণী তিমিরলিপ্ত।'—'বিমান' আকাশ নয়; ব্যোমযান, যান, রাজগৃহ, সিংহাসন, এমন কি, অশ্বও হইতে পারে, কিন্তু আকাশকে প্রকাশ করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের 'শিরোপরে অনন্ত বিমান' মনে পড়ে! তাঁহার কৈশোরের ভুল নিরঙ্কুশ কবি-প্রয়োগ নহে। 'শুভদৃষ্টি'তে প্রহেলিকাও আছে—'অতনুর তনু অণু পরমাণু বেঁধে অনুরাগ আকুল বুকে, এক হয়ে গেল দুইটী জীবন—' ইহার অর্থ, কূটার্থ—গূঢ়ার্থ আমরা আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। 'শুভদৃষ্টি'তে 'অসীম ভাসিল সীমানার মাঝে', কিন্তু মানবের বুদ্ধি সসীম। সীমানার মাঝে অসীমের ভাসার কল্পনা নিশ্চয়ই 'সসীম' বুদ্ধির সাধ্য নয়। শ্রীসুষমা সিংহের 'সন্ধ্যা' সময়োপযোগী প্রবন্ধ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের নাইট-উপাধি-বর্জ্জন উপলক্ষে 'বিশ্ববরেণ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় সমীপে' কবিতায় যে 'নীরব নিবেদন' করিয়াছেন, তাহা সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভার যোগ্য হয় নাই বটে, কিন্তু ইহাই বাঙ্গালার একমাত্র ভাবের পুষ্পাঞ্জলি। কবির কষ্টকল্পিত মুদ্রাদোষে কবিতাটি মাটী হইয়াছে। ইহাতে সত্য আছে, ভক্তি আছে, কিন্তু কবিত্ব নাই। ঘটনাটি যেমন জাতির জীবনে চিরস্মরণীয়, সত্যেন্দ্রনাথের এই ভক্তির দান সাহিত্যে তেমনই চিরস্মরণীয় হইবে, এমন আশা করা যায় না। শ্রীদ্বিজদাস দত্তের 'বেদে বিশ্বমানবের আদিম ধর্ম্মবিধান' সুলিখিত, সারগর্ভ প্রবন্ধ। 'ভারতী' ইহাকে প্রথম স্থান দিলেন না কেন?

প্রবাসী। শ্রীঅজিতকুমার হালদারের 'রামদাস ও শিবাজী' নামক ছবিখানি উল্লেখযোগ্য, উপভোগ্য। শিবাজীর অঙ্কনে চিত্রকর ভাবকে রেখার ফাঁদে ধরিয়াছেন, শিবাজীর চিন্তাকে রূপ দিয়াছেন। 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি'র ইতিহাসে ইহা সম্পূর্ণ নূতন;—অত্যন্ত আশাপ্রদ। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে চিত্রকরকে ধন্যবাদ করি। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক 'গানে' হেঁয়ালি আছে, বিশেষত্ব নাই। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'সামঞ্জস্যের কথা' অত্যন্ত গুরুপাক, সাহিত্যের বা দর্শনের 'লচ্ছাসার'। 'শ্রীঃ' 'রাজা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাস্তবিক, বাঙ্গালা ক্রমে তপোবন হইয়া উঠিতেছে। এখানকার সাহিত্যও গেরুয়া পরিয়া হিমালয়ে চলিল। 'বুড়া বয়সের আর বাকী কি?' বাঁচিয়া আর সুখ কি?—এক দিকে সচল আয়তনের ভেকধারীরা চামর ঢুলাইয়া কামায়ন গান করিতেছে; আর এক দিকে নাটিকা, কবিতা, টপ্পা প্রভৃতি জটা-বল্কল ধারণ করিয়া

'যৌবনে যোগিনী' সাজিয়া আসরে আসিয়া 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' স্মরণ করিতে বলিতেছে ! 'সামঞ্জস্যের কথা' কহিতে পার, কিন্তু সামঞ্জস্য হয় না ;—রচনাটির প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে যথেষ্ট লিপিচাতুরী আছে, 'মানুষের জীবনের সঙ্গে বিশ্বের একটা যোগ—তাহার আনন্দ এবং তাৎপর্য্য' আছে, কিন্তু লেখক সে আনন্দ ভোগ করিবার অবকাশ দেন নাই ; সে 'তাৎপর্য্য' ধর্ম্মের তত্ত্বের ন্যায় 'নিহিতং গুহায়াম্।' ইহার কারণও সুস্পষ্ট ; ব্যাখ্যাতা স্বয়ং বলিতেছেন,—'ফুল বোল পাতা আমি আমি ছিঁড়িতে পারি, চট্‌কাইতে পারি, খাইতে পারি, মাখিতে পারি,—কিন্তু এমন করিয়া বসন্তকে পাইব না।' নিশ্চয়ই 'সবুজ পাতা।' প্রবন্ধটিতে লেখকের আহারের প্রভাব সুস্পষ্ট, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। শ্রীসত্যচরণ লাহার 'ঋতুসংহার' উপভোগ্য। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসবর্ণ-বিবাহ-আইনের সমর্থন করিয়া যে চারিখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, 'অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে পত্র' নামে তাহা প্রচারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পত্রে পূজ্যপাদ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—'আইন যদি বরকে জোর করিয়া বলাইতে চায় "আমি হিন্দু নহি", তবে আইনের সেই বলগর্ব্বিত কথার জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া দেওয়া অধম নীচত্বের চিহ্ন। বিবাহের ন্যায় অত বড় একটা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অমন ধারা একটা কাপুরুষোচিত নীচত্ব স্বীকার করা বরের পক্ষে কোনো ক্রমেই শোভা পায় না।' ইহা নিশ্চয়ই নীচতা, এবং শুধু বরের পক্ষে কেন, কোনও ভদ্রলোকের পক্ষেই শোভা পায় না। দ্বিজেন্দ্রনাথের মত সহৃদয়, মহাশয়, বাঙ্গালীর 'ব্যথার ব্যথী', প্রেমিক মহাজন এইরূপ নীচতায় ব্যথিত হইবেন, ইহাও স্বাভাবিক। কিন্তু যে দেশে 'চেরাগের নীচেই অন্ধকার' জমিয়া থাকে, যে দেশে মতে ও ব্যবহারে আদৌ সামঞ্জস্য নাই, সে দেশের উপায় কি? আইন, নীতি, মতবাদ সে দেশে মানুষকে নীচতা হইতে দূরে থাকিবার পথ দেখাইয়া দিতে পারে, কিন্তু যে সুবিধাবাদী, তাহাকে উন্নত করিতে পারে না। আইন আমাদিগকে 'মনে মুখে এক' করিতে পারিবে না। সমাজ বা লোকমতের সংহত শক্তি ও শাসন ভিন্ন মানবের মনের সংস্কার হইতে পারে না। মানবের মনের সংস্কার না হইলে তাহার সমাজের সংস্কার হয় না। কেন না, পুঁথি-গত সংস্কার সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে না ; পবিত্র করিতে পারে না, বরং আরও কলুষিত করে। রবীন্দ্রনাথের 'বাতায়নিকের পত্র' তাঁহার যোগ্য হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালীকে আমরা পড়িতে, মনে মুদ্রিত করিয়া রাখিতে বলি। রবীন্দ্রনাথের এই যুগধর্ম্মের বিশ্লেষণ ও সনাতন মানব-ধর্ম্মের নির্দ্দেশ—তাঁহার কম্বু কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত এই ভারতবাণী বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে আর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি তুলিবে। ইহা ইউরোপের পক্ষেও মহৌষধ, এসিয়ার পক্ষে ও আমাদের পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী-সুধার কাজ করিবে। ইউরোপ যদি তাহার ভাবনা না ভাবে, বর্ত্তমানের মোহে ভবিষ্যৎকে ভুলিয়া থাকে, ক্ষতি নাই। কিন্তু আমরা যেন বর্ত্তমানের আলোকে আমাদের অবস্থার বিচার করিতে পারি ; অবস্থার মত ব্যবস্থা করিয়া ভবিষ্যতের পথে প্রবর্ত্তিত হইতে পারি। রবীন্দ্রনাথ 'বাতায়নিকের পত্রে' সেই পথের সন্ধান দিয়াছেন। শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরীর 'পাঁচমঢ়ী' ও 'তুলসী'র 'জুন্নার' সুলিখিত ও সুখপাঠ্য। শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগের 'শিশির'কে 'সাহিত্যিক স্নাকামী' ভিন্ন আর কি বলিব? শ্রীশান্তা দেবীর 'পরাজয়' চলনসই গল্প।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'র ক্ষুদ্র সমালোচনায় 'অহং' ও সোঽহং-এর আমদানী করিয়াছেন। সমালোচকের শক্তি যে 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী', তাহারই প্রমাণ; এবং বলা বাহুল্য, ইহাও উপভোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূতন কিছু করো' বাঙ্গালার নবীন ভাবুকদের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিল! কিন্তু বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভয় হয়। জয়দেবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। ভারতচন্দ্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার আধ্যাত্মিক ও তদপেক্ষা সূক্ষ্ম 'ঐথরিক' ব্যাখ্যা হিমালয়ের মত উচ্চ হইয়া যোড়াসাঁকো ও বোলপুরের মধ্যে 'স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।' তাহার উপর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা!—এই ত কলির সন্ধ্যা। অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালা সাহিত্যে আধ্যাত্মিক উপন্যাসের, অন্ততঃ উপন্যাসবিশেষের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 'ফ্যাশন' হইয়া উঠিবে। তখন সত্যেন্দ্রনাথের হেনা, শরচ্চন্দ্রের চরিত্রহীন প্রভৃতি বাঙ্গালা দেশে উপনিষদের স্থান অধিকার করিবে। 'নাল্পেন সুখমস্তি।' অতএব, বাহুল্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের বহু-কথিত 'এ পার হইতে ও পারে' পাড়ী দিয়া আমরা এই সকল সনক শৌনক শঙ্কর সায়নকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারিব না? শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'বাদলা-ভাঙা রাতে'র নাম শুনিয়া ভয় হইয়াছিল, কিন্তু কবিতাটি বোঝা যায়। শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টো-পাধ্যায়ের 'আশ্বাসে' ভুলিয়া অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বেশ হইতেছে।

ব্রহ্মবিদ্যা। জ্যৈষ্ঠ—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'অসতো মা সদ্গময়' ব্রহ্মবিদ্যার উপযোগী বটে, কিন্তু ইহাতে বৈদিক ভাবের সৌরভ নাই। যাহা নাই, তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। যাহা আছে, তাহা বুঝা যায়। কবি এই রচনায় কবিত্বের বিনিময়ে 'সদ্ভাব' দান করিয়াছেন। সে সদ্ভাবের আধার—সুমার্জ্জিত, সুসংস্কৃত, সুতরাং মনোজ্ঞ হইয়াছে। শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিকের 'হ্লাদিনী শক্তি ও তাহার বিলাস' বৈষ্ণব শাস্ত্রের প্রেম-লীলার ব্যাখ্যান। শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরীর 'যোগে' কবিত্বও আছে, শাস্ত্রও আছে; কোনটার সীমা কোথায়, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীমনোরমা দেবীর 'আবাহন-গীতি' গদ্যে লিখিলে কোনও ক্ষতি ছিল না। বরং ছন্দ ও কবিতা বাঁচিয়া যাইত। বাস্তবিক, বাঙ্গালা দেশে 'কাব্যি'র প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। আমরা অনেক সময়ে ভাবি, বাঙ্গালার রাজা কে? ইংরেজ, না কাব্যি? কে বড়? 'বুরোক্রাসী', না 'কাব্যি'? পাহারাওয়ালা ও গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানও যথেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী বটে; তাহাদিগকেও আমরা ভয় করি, ইহাও সত্য; কিন্তু বাঙ্গালার নব্য কবিরা বোধ করি তাহাদের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। এক এক সময়ে মনে হয়, ইহারাও যদি কলম ধরে, এবং সমস্ত দিনের রাজপাটের পর কবিতা লিখিতে বসে! বাস্তবিক, বিদ্যাসাগরের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়,—ধন্য রে কাব্যি! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! জরতী 'তত্ত্ববোধিনী' এবং কাষায়পরিবীতা 'ব্রহ্মবিদ্যা'ও তোর প্রতাপে জর্জ্জরিত! তুই আ-টপ্পাব্রহ্মপর্য্যন্ত সর্ব্বত্র 'অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে মাসিক-পালন' করিতেছিস্! শ্রীযদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি রায় বাহাদুরের 'অদ্বৈত-তত্ত্ব' সুচিন্তিত নিবন্ধ। শ্রীমতী হরিপ্রিয়ার 'বর্ণমালা স্তুতি' 'এরে কৃষ্ণ'র মত; কষ্টকল্পিত রচনা! শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'সাধু তারাচরণ এবং শ্রীশ্রীবুড়াকালী'

উল্লেখযোগ্য সন্দর্ভ। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' সুলিখিত।—'ব্রহ্মবিদ্যা' যথাসময়ে প্রকাশিত হইতেছে; প্রবন্ধ-বৈশিষ্ট্যেও সমৃদ্ধ হইয়াছে।

প্রতিভা। জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীঅক্ষয়কুমার দাসগুপ্তের 'সারনাথে লুপ্ত বৌদ্ধকীর্ত্তি' সুরচিত নিবন্ধ। সারনাথের সৃষ্টি হইতে ধ্বংস পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। লেখক প্রমাণ-প্রয়োগে সারনাথের প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছেন, এবং সাধারণ পাঠকের অধিগম্য করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কয় মাস পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'সারনাথ' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধে এই গ্রন্থের উল্লেখ নাই। তাহার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়া থাকিবে। যাঁহারা এক পথের পথিক, তাঁহারা পরস্পরের রচনার আলোচনা করিলে সুফল ফলিতে পারে। শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষের 'অতিথি' একটি গান। অতিথি নারায়ণ, তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে নাই। 'প্রতিভা' 'অতিথি'কে আশ্রয় দিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন আর কিছু বলিবার নাই, এমন নহে। কিন্তু 'অতিথি'! 'বেঁধে মারে, সয় ভাল।'—ইতি। শ্রীবিমলাচরণ ঘোষের 'মৌর্য্য যুগের বাণিজ্য' সারগর্ভ, গবেষণাপূর্ণ, তথ্য-সমৃদ্ধ প্রবন্ধ। আজ কাল ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও দর্শনে অশিক্ষিতপটু কুক্কুটমিশ্র শর্ম্মাদের তাণ্ডব দেখিয়া বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভয় হয়। 'মৌর্য্য-যুগের বাণিজ্যে' এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। 'প্রতিভা' এ বিষয়ে সৌভাগ্যশালিনী। 'প্রতিভা'য় কৃতবিদ্য মনীষীরা অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া দর্শন, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। এই জন্য আমরা 'প্রতিভা'র অনুরাগী। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সিদ্ধান্তবাগীশ ও শ্রীসতীনাথ দেবশর্ম্মা 'আলোচনা'য় 'ভারতবর্ষে'র ১৩২৪ সনের অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'সক্ড়ি-তত্ত্বে'র সমালোচনা করিয়াছেন। 'It is never too late' সত্য বটে, কিন্তু আলোচনা এত 'বাসী' না হইলেই ভাল হয়। তবে 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল!' ইহাও জীবনের লক্ষণ। মাসিক সাহিত্যে নানা বিষয়ের অবতারণা হয়, কিন্তু সাহিত্য-সমাজে তাহার আলোচনা হয় না। এ ঔদাস্য, এ উপেক্ষা শোচনীয়।

ভাণ্ডার। জ্যৈষ্ঠ। 'কাঙ্গালী সর্দ্দারের বিপদোদ্ধার' গল্প চলিতেছে। 'ম্যালেরিয়ার প্রতীকার' বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায়-সমিতি-সম্মেলনে শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র মিত্র কর্তৃক পঠিত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।—এই প্রবন্ধ ও তাহার 'পরিশিষ্টে' বাঙ্গালীর জানিবার মত অনেক তথ্য ও সুপরামর্শ আছে। আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। আমাদের সংবাদপত্রসমূহে এই শ্রেণীর প্রবন্ধের প্রচার ও আলোচনা হয় না কেন? 'নানা কথা' এবার অত্যন্ত অল্প। আমরা বাঙ্গালার এই 'সবে ধন নীলমণি'র অত্যন্ত পক্ষপাতী; সর্ব্বান্তঃকরণে 'ভাণ্ডারে'র স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি কামনা করি। সেই জন্যই বলি, পূর্ব্বের তুলনায় 'ভাণ্ডার'কে রিক্ত বলিয়া মনে হইতেছে। সম্পাদক মহাশয় পূর্ণ—সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করুন।

# রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ

## চয়নিকা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যসমুদ্র হইতে রত্নরাজি বাছিয়া [illegible] অপরূপ কণ্ঠমালা রচিত হইয়াছে। কবিবরের সমগ্র কাব্যগ্রন্থ পাঠের যাঁহাদের সময় বা সুবিধা নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই চয়নিকা ( Selection ) বিশেষ উপযোগী। ইহার মধ্যে কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিই স্থান পাইয়াছে। মসৃণ কাগজে ছাপা, সুন্দর বাঁধাই, সাধারণ সংস্করণ দুই টাকা।

## সঙ্কল্প ও স্বদেশ

কবিবরের স্বদেশ সম্পর্কীয় যাবতীয় কবিতা এই গ্রন্থে সংগৃহীত। ইহার অনেক কবিতা আজকাল মুখে মুখে শোনা যাইতেছে। মূল্য আট আনা।

## শিশু

শিশুর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বিবিধ ছন্দে, বিচিত্র রসে, ছেলের কথায় শিশু-জীবনের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ। শিশুর আনন্দ, বর্ষীয়ানের উপভোগ্য। মূল্য বারো আনা মাত্র।

## নৈবেদ্য ॥০ খেয়া ১৲

রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্‌বিষয়ক অপূর্ব্ব-সুন্দর কবিতা-পুস্তক। ইহারা দুঃখের সান্ত্বনা, বিপদের সহায়, সম্পদের বন্ধু, উৎসবের সহচর হইবার একান্ত উপযুক্ত।

## কথা ও কাহিনী

ছন্দে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও কাল্পনিক গল্পের বই। রসে ছন্দে ভাবে সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়—অননুকরণীয়। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। মূল্য বারো আনা।

## গীতাঞ্জলি ১।০

ইহাতে কবিবরের আধুনিকতম ১৫০টি নূতন গান ও কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। পুরু কাগজে [illegible] বাঁধাই। [illegible] উপযুক্ত।

## গান [illegible]

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গান'—নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা ইহাতে অনেক বেশী গান আছে—এবং এখনকার রচিত আধুনিকতম গানগুলিও দেওয়া হইয়াছে। এমন সমগ্র সম্পূর্ণ সংগ্রহ আর কখনো প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা বাঁধা মনোরম—উপহার দিবার যোগ্য।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

## কাব্য-গ্রন্থাবলী।

নূতন সংস্করণ

কাটা ছাঁটা বাদ-দেওয়া সংস্করণ নহে; সমস্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অনুরূপে এই সংস্করণ প্রস্তুত।

সন্ধ্যা-সঙ্গীত ।০, প্রভাত-সঙ্গীত ।৵০, ভানুসিংহের পদাবলী ।০, ছবি ও গান ।০, কড়ি ও কোমল ৷৵০, প্রকৃতির প্রতিশোধ ।০, চিত্রাঙ্গদা ।০, মালিনী ।০, রাজা ও রাণী ৸০, বিসর্জ্জন ॥০, বিদায় অভিশাপ ৵০, মানসী ৸০, সোনার তরী ৸০, চিত্রা ॥০, চৈতালি ।০, কল্পনা ॥০, কণিকা ।০, ক্ষণিকা ৸০, কথা ॥০, কাহিনী ৷৵০, শিশু ৸০, নৈবেদ্য ॥০, খেয়া ১৲, গীতাঞ্জলি ১।০, গান ১॥০, গীতালি ১৲, বলাকা ১৲, গীতিমাল্য ১৲।

বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠাভাজন

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত ও সম্পাদিত

১। চরিত্র-গঠন—শিশুদিগের চরিত্র গঠনের সম্পূর্ণ উপযোগী। মূল্য ॥০ আনা।

২। ঋদ্ধি—সংসারে কিরূপে ঋদ্ধি বা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাহা পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছেন।

৩। মেঘনাদবধ কাব্য—অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের সচিত্র সটিক রাজসংস্করণ মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস

## নামিকো ১৲

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত

## অঞ্জলি ॥০

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রণীত

১। উপনিষৎ সংগ্রহ ১ম ও ২য় মূল্য ।০ ও

২। পালিপ্রকাশ—পালিভাষার ব্যাকরণ মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় প্রণীত

১। ভারত সাধক—৸০

২। বুদ্ধের জীবন ও বাণী—৸০

৩। শিখগুরু ও শিখজাতি—১৲

শিশুদের হাতে তরল গল্পের বই না দিয়া শরৎবাবুর পাকা হাতের লেখা ঐ বইগুলি দিন, ছেলেরা কিছু শিখিবে, এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করিবে।

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস,

২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত

# স্বরাজ ফ্যাক্টরি

৬৯ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট।

রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক।

নূতন নূতন কল কব্জায়, বিখ্যাত কারিকরদিগের সাহায্যে ও বিশেষ পারদর্শী লোকের তত্ত্বাবধানে;

## খুব মজবুত ষ্টীলে প্রস্তুত

এবং গ্যাস-ষ্টোভে নানা প্রকার এনামেল রং করা ষ্টীল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, কল, ক্যানভাস ও চামড়ার সুট কেস, ব্যাগ, হোল্ডঅল, বেডষ্ট্রাপ ইত্যাদি

পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা বহুলপরিমাণে মজুত থাকে।

অর্ডার যত্নসহকারে, সত্বর, সকল দিক বজায় রাখিয়া, সরবরাহ করা হয়।

ক্যাটালগ বিনা খরচায় পাওয়া যায়।

## এইচ্, ঘোষ

৭১ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

---

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

যাঁহারা, বা সংগ্রাহক-রূপে যোগদান করিয়া লাভবান্ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

কর্পোরেশন ষ্ট্রীট্ ; কলিকাতা। } শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রধান সম্পাদক।

২৯শ ভাগ। শ্রাবণ ; ১৩২৬। ৪র্থ সংখ্যা।

## মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।



### লেখকগণের নাম

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহারাধন বক্সী, শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সেন, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র, শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সম্পাদক।

### সূচী



অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য পাঁচ আনা।

২।১, রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৩।এ, রাধাপ্রসাদ লেন, (সুকীয়া ষ্ট্রীট) কলিকাতা, মণিকা প্রেসে শ্রীহরিচরণ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজাম বাহাদুর,
শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশূর, বরদা, ত্রিবাঙ্কুর, যোধপুর, ভরতপুর,
পাতিয়ালা ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাদুরগণের এবং অন্যান্য স্বাধীন
রাজন্যবর্গের অনুমোদিত বিশ্বস্ত পৃষ্ঠপোষিত

কবিরাজ [illegible] সেন মহাশয়ের

# জবাকুসুম তৈল।

শিরোরোগের মহৌষধ।

গুণে অদ্বিতীয় !

গন্ধে অতুলনীয় !

এই নিদারুণ গ্রীষ্মের সময় যদি শরীরকে স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল রাখিতে ইচ্ছা করেন, যদি শরীরের দুর্গন্ধ ও ক্লেদ দূর করিতে চান, যদি মস্তিষ্ককে স্থির ও কার্য্যক্ষম রাখিতে ইচ্ছা করেন, যদি রাত্রে সুনিদ্রার কামনা করেন, যদি কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে, বৃথা চিন্তা ও সময় নষ্ট না করিয়া, জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করুন। জবাকুসুম তৈলের গুণ জগদ্বিখ্যাত। রাজা ও মহারাজ সকলেই ইহার গুণে মুগ্ধ।

১ শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

ভিঃ পিতে ১।/০ টাকা। তিন শিশির মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা।
ভিঃ পিতে ২॥/০ টাকা। ১ ডজন মূল্য ৮৸০ টাকা। ভিঃ পিতে ১০৲ টাকা।

সি, কে, সেন কোং লিমিটেড্।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক,—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

---

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র
উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

# সপ্তস্বর।

( সচিত্র গীতিকাব্য )

**মূল্য ১।০ মাত্র।**

সকল মাসিকে ও সংবাদপত্রে একবাক্যে প্রশংসিত।

এই গ্রন্থে ২৫খানি তিন রঙ্গের উৎকৃষ্ট ছবি আছে।—দেখিলে নয়ন-মন মুগ্ধ হইবে। যেমন ছবিগুলি সুন্দর, রচনাও ততোধিক সুন্দর। শকুন্তলা, আশ্রম-চিত্র, মহর্ষি বশিষ্ঠ, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র, গুরু নানক, গুরুগোবিন্দ, রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, তানসেন প্রভৃতি নানাবিষয়ক কবিতাগুলি যেমন রচনা নৈপুণ্যে অতিশয় মনোজ্ঞ সেইরূপ চিত্রগুলিও বিশেষ চিত্তরঞ্জক। এই গ্রন্থখানি প্রাইজ-বুক্ হইবার যোগ্য।

ঋতেন্দ্রবাবুর পরিচয় পাঠকবর্গকে নূতন করিয়া দেওয়া to paint the lilly অথবা to guild the gold ছাড়া আর কিছুই নহে। তাঁহার সপ্তস্বরের আরোহ-অবরোহের মধ্য দিয়া যে একটী অনাবিল পবিত্র সঙ্গীতধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহা 'Music of the spheres'এর সহিত তুলনীয়। মর্ত্তে থাকিয়া পাঠক যদি স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনিতে চান, তাহা হইলে একখানি সপ্তস্বর কিনিয়া পাঠ করুন।

# পদরাগ

( গান )

**মূল্য ৸০ আনা মাত্র।**

পদরাগের রাগরাগিণী সংমিশ্রণে এক একটি পদ যেন বীণাপাণির কমল-লাঞ্ছিত-কোমল-করধৃত স্বর্ণবীণার অপূর্ব্ব ঝঙ্কার। পদরাগ, শব্দ-অনন্ত-ব্রহ্ম—তাঁহার অভিব্যঞ্জনা—ইহাতে শতাধিক পদ সন্নিবিষ্ট আছে। এক কথায়, বেদ-উপনিষদ-পুরাণের সারবস্তু পদরাগে প্রকটিত। জহুরী বস্তু চিনিয়া লউন।

**প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,**

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

# অনু, তুর্বশ ও যদু ।

ঋগ্বেদের যুগে অনু, তুর্বশ ও যদু নামে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। কণ্ববংশীয় ঋষিগণ ইহাদিগের যজ্ঞ করিতেন, দেখা যায়। এই তিন বংশের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, যদিও বেদ হইতে তাহা জানা যায় না, তবে ইহাঁদের কোনও যজ্ঞ একই ঋষিদিগের দ্বারা একই স্থানে সাধিত হইয়াছিল বলিয়া, উঁহারা এক-বংশীয় ছিলেন, অনুমান করি।

কণ্বপুত্র বৎস ঋষি তুর্বশ যদুদিগের একটী যজ্ঞে নিম্নলিখিত রূপ স্তব পাঠ করেন। তিনি বলিতেছেন, 'হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে কক্ষীবান্ এবং ব্যশ্বঋষি, তোমাদিগকে দীর্ঘতমা যেমন তুষ্ট করিয়াছেন, যেমন বেনের পুত্র পৃথী যজ্ঞগৃহ সকলে (তুষ্ট করিয়াছেন), সেইরূপ এই স্তব তুষ্ট করুক।' (১) 'হে অশ্বিদ্বয়! অবশ্য আগমন কর; তোমাদের জন্য এই হব্য সকল রক্ষিত আছে। তুর্বশ যদুর মধ্যে এই সকল সোম ও কণ্বদিগের মধ্যে এই সকল (সোম) তোমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে।' (২) বৎস ঋষি এই স্তবে যে সকল ঋষির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারাও সম্ভবতঃ এই যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন। কারণ, উঁহারা যে সম-সাময়িক, তাহা অন্য স্তবের দ্বারা সপ্রমাণ করা যায়।

ঋগ্বেদ হইতে জানা যায় যে, পজ্র-বংশীয় উচথ্যের পুত্র অন্ধ দীর্ঘতমা এবং দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান। সেইরূপ ভৃগুর দুই পুত্র, কবি ও বেন। কবির পুত্র উশনা, এবং বেনের পুত্র পৃথী। (৩) ব্যশ্ব ঋষি অঙ্গিরাবংশীয় ছিলেন।

---

(১) যৎ। বাং। কক্ষীবান্। উত। যৎ। ব্যশ্বঃ। ঋষিঃ। যৎ। বাং। দীর্ঘতমাঃ। জুহাব। পৃথী। যৎ। বাং। বৈন্যঃ। সদনেষু। এব। ইৎ। অতঃ। অশ্বিনা। চেতয়েথাম্॥—৮।৯।১০

(২) আ। নূনং। যাতং। অশ্বিনা। ইমা। হব্যানি। বাং। হিতা।
ইমে। সোমাসঃ। অধি। তুর্বশে। যদৌ। ইমে। কণ্বেষু। বাম্। অথ॥ —৮।৯।১৪

(৩)

উদ্ধৃত ঋকে দেখা যাইতেছে যে, কণ্ববংশীয়দিগের যজ্ঞ, তুর্বশ ও যদুদিগের যজ্ঞের সহিত একত্র সম্পন্ন হইত। ইহাতে তুর্বশ যদুগণ সম্ভবতঃ কণ্ব ঋষির সহিত কোনও প্রকারে সম্বন্ধবিশিষ্ট ছিলেন, মনে করা যাইতে পারে।

বোধ হয়, কণ্বগণ তুর্বশ যদুদিগের দেশে বাস করিতেন। আমরা 'বৈবস্বত মনু' প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, 'পরাবান্' নামক দেশে মনুর রাজধানী ছিল। তিনি নমুচিকে বধ করিয়া বোধ হয় এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। (১) পরাবান্ অর্থে দূরদেশও বুঝায়। সে অর্থ গ্রহণ করিলে, মনুর রাজ্য ঋগ্বেদের অনেক ঋষির বাসস্থান হইতে দূরে ছিল, মনে করিতে হইবে। ইহাও দেখা যাইতেছে যে, মনুও এক জন দাসের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। অতএব মানব-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার সহিত মানবধর্ম্মাবলম্বিগণ নানা দেশের জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পণি, দাস, দস্যু, বৃত্র প্রভৃতি জাতি তখন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিল। ইহাদিগের রাজ্য জয় করাই মানবদিগের প্রধান কার্য্য ছিল।

অনেক ঋষি তুর্বশ যদুকে 'পরাবান্' হইতে আনয়নের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ঘোরপুত্র কণ্ব ও ভরদ্বাজ-ভ্রাতা শংযুর নাম উল্লেখযোগ্য। (২) ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, তুর্বশ যদুগণ মনুর রাজধানীর অধিবাসী ছিলেন, বা উহার নিকটবর্ত্তী কোনও দেশে বাস করিতেন। এক জন ঋষি বলিয়াছেন, 'হে নাসত্যদ্বয়! যদি তোমরা পরাবানে

---

(১) অত্র। দাসস্য। নমুচেঃ। শিরঃ। যৎ। অবর্ত্তয়ঃ। মনবে। গাতুং। ইচ্ছন্॥—৫।৩০।৭
[ বভ্রু ঋষি ]

( হে ইন্দ্র! ) এই ( দানব-যুদ্ধে ) যখন মনুর নিমিত্ত সুখ ইচ্ছা করিয়া দাস নমুচির মস্তক চূর্ণ করিয়াছিলে।

নম্যা। যৎ। ইন্দ্র। সখ্যা। পরাবতি। নিবর্হয়ঃ। নমুচিং। নাম। মায়িনম্॥—১।৫৩।৭
[ আঙ্গিরস সব্য ঋষি ]

হে ইন্দ্র! যখন শত্রু-নত-কারী ( বজ্রের ) সহায় দ্বারা পরাবানে নমুচি-নামক মায়াবীকে বধ করিয়াছিলে।

(২) অগ্নিনা। তুর্বশং। যদুং। পরাবতঃ। উগ্রদেবম্। হবামহে।
[ ঘোরপুত্র কণ্ব ]—১।৩৬।১৮

আমরা তুর্বশ, যদু, উগ্রদেবকে পরাবান্ হইতে অগ্নি দ্বারা আহ্বান করি।

যঃ। আ। অনয়ৎ। পরাবতঃ। সুনীতি। তুর্বশং। যদুম্॥—৬।৪৫।১ [ শংযু ঋষি ]

যিনি ( অর্থাৎ ইন্দ্র ) তুর্বশ যদুকে পরাবান্ হইতে সুখে আনিয়াছেন।

থাক, বা তুর্বশের দেশে থাক।' (১) ইহাতে মনে হয়, তুর্বশের দেশ পরাবানের সন্নিহিত ছিল।

কণ্বপুত্র দেবাতিথি, অঙ্গিরাবংশীয় প্রিয়মেধগণ ও পজ্রবংশীয় এক ঋষি (সম্ভবতঃ কক্ষীবান) তুর্বশ যদুদিগের একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে তাঁহারা যে স্তব পাঠ করেন, তাহা হইতে আমরা অবগত হই যে, তাঁহারা অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছেন। (২) প্রথম ঋকে ঋষিগণ ইন্দ্রকে এইরূপে আহ্বান করিতেছেন:—হে ইন্দ্র! পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, বা দক্ষিণ, যেখানে (তুমি) ঋত্বিকদিগের দ্বারা আহূত হইয়াছ, হে শ্রেষ্ঠ! হে প্রশর্ধ! (সেই স্থান হইতে) অনুর পুত্রের নিমিত্ত, তুর্বশের নিমিত্ত (আমাদিগের) ঋত্বিকদিগের দ্বারা আহূত হইয়া (আইস)। ৭ম ঋকে ঋষিগণ বলিতেছেন:—তোমার প্রচণ্ড শক্তির বন্ধুত্ব থাকিলে (আমরা) ভয় করি না, শ্রান্ত হইব না। প্রার্থিত-বস্তু-প্রদানকারী তোমার কৃতকর্ম্ম মহৎ ও স্তবার্হ। তোমার (প্রসাদে) যেন তুর্বশ ও যদুকে জীবিত দেখি। এই ঋক হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তুর্বশ যদু এমন বিপদে পড়িয়াছেন যে, তাঁহাদের জীবনসংশয় হইয়াছে। কিন্তু সে বিপদ কিসের জন্য? ১৬শ ঋকে দেখিতেছি, ঋষি বলিতেছেন:—হে পূষা! (বাহুস্থিত) নাপিতের ক্ষুরের মত আমাদিগকে তীক্ষ্ণ কর। হে বিমোচন! রায় (অর্থাৎ রাজ্য বা ঐশ্বর্য্য) দাও। তব সম্বন্ধীয় গাভীধন যাহা তুমি মর্ত্যকে প্রেরণ কর, তাহা আমাদিগের সুখলভ্য (হউক)। এই ঋক্ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অনুর পুত্র, তুর্বশ ও যদু কোনও স্থানে গোজয়ের যুদ্ধে গমন করিয়াছেন। সেই যুদ্ধে তাঁহারা বিপদে পড়িয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের রাজা কুরুঙ্গ এই যুদ্ধে বা যুদ্ধকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই জন্য তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে এই স্তব রচিত হইয়া পঠিত হইয়াছিল। ঋষিগণ এই শ্রাদ্ধে যে দান প্রাপ্ত হন, তাহাও ঋক্‌বদ্ধ করিয়াছেন। (৩)

---

(১) যৎ। নাসত্যা। পরাবতি। যৎ। বা। স্থঃ। অধি। তুর্বশে॥—১।৪৭।৭

(২) যৎ। ইন্দ্র। প্রাক্। অপাক্। উদক্। ন্যক্। বা। হূয়সে। নৃভিঃ।
সিম্। পুরু। নৃসূতঃ। অসি। আনবে। অসি। প্রশর্ধ। তুর্বশে॥—৮।৪।১
মা। ভেম। মা। শ্রমিষ্ম। উগ্রস্য। সখ্যে। তব।
মহৎ। তে। বৃষ্ণঃ। অভিচক্ষ্যং। কৃতং। পশ্যেম। তুর্বশং। যদুম্॥—৮।৪।৭
সং। নঃ। শিশীহি। ভুরিজোঃ ইব। ক্ষুরম্। রাস্ব। রায়ঃ। বিমোচন।
ত্বে। তৎ। নঃ। সুবেদং। উস্রিয়ম্। বসু। যং। ত্বং। হিনোষি। মর্ত্যম্॥—৮।৪।১৬

(৩) স্থূরং। রাধঃ। শত অশ্বং। কুরুঙ্গস্য। দিবিষ্টিষু।
রাজ্ঞঃ। সুভগস্য। রাতিষু। তুর্বশেষু। অমন্মহি॥—৮।৪।১৯

এখানেও দেখা যাইতেছে, কণ্ব-পুত্র তুর্বশ যদুদিগের যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে পজ্রবংশীয় ঋষি কক্ষীবানও উপস্থিত ছিলেন। ঋগ্বেদে দেখিতে পাই, তুর্বশ সুদাসের বিরুদ্ধে পরুষ্ণী-যুদ্ধে আগমন করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে যদুর নাম দেখিতে পাই না, কিন্তু অনুর পুত্রের নাম প্রাপ্ত হই। বোধ হয়, এই যুদ্ধের পূর্ব্বেই যদু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। অতএব উল্লিখিত যজ্ঞ পরুষ্ণী-যুদ্ধের সময় সম্পন্ন হয় নাই। ইহা আমাদিগকে আর এক যুদ্ধের সন্ধান প্রদান করিতেছে। কিন্তু ঐ যুদ্ধে তুর্বশ যদু পরাভূত হওয়ায়, উহার বিজয়-যজ্ঞ সম্ভব ছিল না। আমরা 'সম্রাট অভ্যাবর্ত্তী' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বৃচীবান ও বরশিখদিগকে জয় করিয়া সম্রাট একটী যজ্ঞ করেন। এই বিজয়-যজ্ঞে ভরদ্বাজ ঋষি একটী স্তব রচনা করিয়া পাঠ করেন। ঐ স্তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সম্রাটের মিত্র সৃঞ্জয় তুর্বশ প্রাপ্ত হন। আমরা ঐ প্রবন্ধে এই ঘটনার অর্থ এইরূপ অনুমান করিয়াছি যে, তুর্বশ যদু সম্রাট অভ্যাবর্ত্তী দ্বারা বৃচীবান ও বরশিখদিগের গোহরণ করিতে প্রেরিত হইয়া পরাভূত হন, এবং উঁহাদের মধ্যে তুর্বশ বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। পরে বৃচীবান্‌গণ জয়ে উৎফুল্ল হইয়া সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীর যজ্ঞ নষ্ট করিতে আগমন করে। কিন্তু সৃঞ্জয় উঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া তুর্বশকে উদ্ধার করেন। এই কার্য্যের জন্য সম্রাট সৃঞ্জয়কে তুর্বশ প্রদান করেন, অনুমান করিয়াছি।

তুর্বশ যদু যেমন সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীর আদেশবাহী সেনাপতি ছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা পূরুবংশীয়দিগেরও যুদ্ধের সেনাপতিরূপে নিযুক্ত হইতেন, দেখিতে পাই। পুরুকুৎস কর্ত্তৃক শরৎদাসের সাতপুর জয়ের পর পূরুগণ একটী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। ঐ যজ্ঞে ভরদ্বাজ, কণ্বপুত্র সোভরি, ভৃগুবংশীয় জমদগ্নি, অত্রি, অগস্ত্য, গোতম প্রভৃতি ঋষিগণ হোতা ছিলেন। ভরদ্বাজ ও অগস্ত্য ঋষি এই যজ্ঞের নিমিত্ত দুইটী স্তোত্র রচনা করিয়া পাঠ করেন। এই পঠিত স্তোত্রদ্বয়ের অন্তর্গত দুইটী ঋক্ নিম্নে উদ্ধার করা গেল। ইহাদের মধ্যে একটী অক্ষরে অক্ষরে মিলে। ( ১ ) অপরটী যদিও অক্ষরে

সৌভাগ্যবান্ রাজা কুরুঙ্গের স্বর্গগমন হেতু দান সকলের মধ্যে, তুর্বশদিগের মধ্যে প্রভূত ধন ও শত অশ্ব পাইয়াছি।

( ১ ) ত্বং। ধুনিঃ। ইন্দ্র। ধুনিমতীঃ। ঋণোঃ। অপঃ। সীরাঃ। ন। স্রবন্তীঃ।
প্র। যৎ। সমুদ্রং। অতি। শূর। পর্ষি। পারয়। তুর্বশং। যদুং। স্বস্তি॥

ভরদ্বাজ ৬।২০।১২ ; অগস্ত্য, ১।১৭৪।৯

অক্ষরে মিলে না, তথাপি উঁহাদের মধ্যেও বেশ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম ঋকে তুর্বশ যদুকে সমুদ্রপার হইতে উদ্ধারের প্রার্থনা রহিয়াছে। দ্বিতীয় ঋকে পূরু-রাজ পূরুকুৎসের সাত পুর জয়ের উল্লেখ আছে। পূরু-রাজের যজ্ঞে তুর্বশ যদুর রক্ষার জন্য প্রার্থনা থাকায় (১) তাঁহারা যে পূরু-রাজের মিত্রস্থানীয়, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। তাঁহারা সমুদ্রপারে গমন করিয়াছেন; ইন্দ্র তাঁহাদিগকে সমুদ্র পার করিয়া সুমঙ্গলে আনয়ন করুন, এই প্রার্থনা। কিন্তু সমুদ্রপারে গমন করিবার তাঁহাদের কি কারণ ছিল? তাঁহারা সমুদ্রপারে কোন্ দেশে এবং কিরূপে গমন করিয়াছিলেন, তাহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বেদ হইতে কোনও উত্তর প্রাপ্ত হই নাই। আমরা অনুমান করি যে, তুর্বশ যদু, শরৎদাসের সাত পুর জয়ে পূরু-রাজের সেনাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই জন্য পূরুদিগের যজ্ঞে তাঁহা-দের মঙ্গল-প্রার্থনা হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীর যজ্ঞে সৃঞ্জয়ের নাম ও সৃঞ্জয়ের যজ্ঞে দিবোদাসের নাম আমরা প্রাপ্ত হই। এই দুই স্থলে সৃঞ্জয় বৃচীবানদিগকে এবং দিবোদাস শম্বরকে জয় করেন। অতএব কোনও যুদ্ধ-বিজয়-যজ্ঞে রাজা ও তাঁহার সেনাপতির নামোল্লেখ সেকালের প্রথা ছিল বলিয়া মনে হয়। আমাদের এই অনু-মান সত্য হইলে, তুর্বশ যদু পূরুরাজের সেনাপতি ছিলেন।

---

হে ইন্দ্র! নদীদিগের মত প্রবহমান, তরঙ্গযুক্ত জল সকলকে (শত্রুদিগের) কম্পয়িতা তুমি বাহির করিয়াছ. হে শূর! যখন সমুদ্র অতিক্রম করিয়া উত্তীর্ণ হও (তখন) তুর্বশ যদুকে সুমঙ্গলে পার কর।

(১) সনেম। তে। অবসা। নব্যঃ। ইন্দ্র। প্র। পূরবঃ। স্তবন্তে। এনা। যজ্ঞৈঃ।

সপ্ত। যৎ। পুরঃ। শর্ম। শারদীঃ। দর্ৎ। হন্। দাসীঃ। পুরুকুৎসায়। শিক্ষন্॥

—ভরদ্বাজ ৬।২০।১০

হে ইন্দ্র! তোমার রক্ষার সহিত (আমরা) নবতর ধন ভজনা করি। পূরুগণ এই সকল যজ্ঞের দ্বারা স্তব করিতেছে। কারণ, পুরুকুৎসকে দিবার জন্য সাত পুর ও শর্ম বিদীর্ণ করিয়াছ, শারদী দাসী (প্রজাকে) বধ করিয়াছ।

দনঃ। বিশঃ। ইন্দ্র। মৃধ্রবাচঃ। সপ্ত। যৎ। পুরঃ। শর্ম। শারদীঃ। দর্ৎ।

ঋণোঃ। অপঃ। অনবদ্য। অর্ণাঃ। যূনে। বৃত্রং। পুরুকুৎসায়। রন্ধীঃ॥

—অগস্ত্য; ১।১৭৪।২

হে ইন্দ্র! মিথ্যাবাক্যযুক্ত শারদী বিশকে দমন করিয়াছ যখন (তাহাদের) সপ্তপুর বিদীর্ণ করিয়াছ। হে অনিন্দনীয়! গমনশীল জল প্রবাহিত করিয়াছ। যুবক পুরুকুৎসের জন্য বৃত্রকে বধ করিয়াছ।

আমরা ইহাও অনুমান করি যে, শরৎদাসের সাত পুর জয় করিতে সমুদ্র-যাত্রা করিতে হইয়াছিল। কারণ, শরৎদাসের রাজ্য নর্ম্মদা ও তাপ্তীর মধ্যে বর্ত্তমান সাতপুর পর্ব্বতে অবস্থিত ছিল। সাত পুর জয় হইবার পর, তুর্বশ যদু কোনও কারণবশতঃ সেই স্থানে অবস্থান করেন, এবং পুরুকুৎস দেশে আসিয়া যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞে তাঁহাদের যে মঙ্গল-প্রার্থনা রহিয়াছে, তাহাতে সমুদ্রপার হইতে ফিরিবার কথা জানা যায়। ঋগ্বেদে এই সমুদ্র-যাত্রার ও পূর্ব্বে আর এক সমুদ্রযাত্রারও উল্লেখ আছে। অগস্ত্য ঋষি বলিয়াছেন,—তুগ্রপুত্র ভুজ্যুকে অশ্বিদ্বয় সমুদ্রে 'প্লব' নামক নৌকা দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন। (১) দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষিও সমুদ্র হইতে তুগ্র-পুত্রের উদ্ধারের বর্ণনা করিয়াছেন। (২) এই সকল বিবরণ হইতে জানা যায়, সেকালে সমুদ্রগামী নৌকায় শত দাঁড় ও পক্ষ (অর্থাৎ পাল) থাকিত। ঐ সকল নৌকাকে প্লব, পতঙ্গ, নাব বলা হইত। সমুদ্রকে ঋষিগণ কৃষ্ণবর্ণ, হস্তগ্রাহ্য-দ্রব্য-বর্জ্জিত ও ভূমিশূন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল বিবরণ

---

(১) যুবং। এতং। চক্রথুঃ। সিন্ধুষু। প্লবং। আত্মন্বন্তং। পক্ষিণং। তৌগ্র্যায়। কম্।
যেন। দেবত্রা। মনসা। নিঃ উহথুঃ। সুপপ্তনি। পেতথুঃ। ক্ষোদসঃ। মহঃ॥—১।১৮২।৫

(হে অশ্বিদ্বয়!) দৃঢ়, পক্ষযুক্ত, সুখকর. সিন্ধু সকলে প্রসিদ্ধ, 'প্লব' তুগ্র-পুত্রের নিমিত্ত তোমরা করিয়াছিলে। যে দিবা অনুগ্রহ দ্বারা, হে শোভন-পতনদ্বয়! নামিয়াছিলে (ও) মহাসমুদ্র হইতে (তাহাকে) বহন করিয়াছিলে।

অববিদ্ধং। তৌগ্র্যং। অপ্সু। অন্তঃ। অনারম্ভণে। তমসি। প্রবিদ্ধম্।
চতস্রঃ। নাবঃ। জঠলস্য। জুষ্টাঃ। উৎ। অশ্বিভ্যাং। ইষিতাঃ। পারয়ন্তি॥—১।১৮২।৬

অবলম্বনরহিত, কৃষ্ণবর্ণ (সমুদ্রে), জল সকলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত তুগ্রপুত্রকে অশ্বিদ্বয় দ্বারা প্রেরিত, উদকধারী (সমুদ্র) দ্বারা সেবিত চারিটী নৌকা তুলিয়াছিল।

(২) তিস্রঃ। ক্ষপঃ। ত্রিঃ। অহা। অতিব্রজৎভিঃ। নাসত্যা। ভুজ্যুং। উহথুঃ। পতঙ্গৈঃ।
সমুদ্রস্য। ধন্বন্। আর্দ্রস্য। পারে। ত্রিভিঃ। রথৈঃ। শতপদ্ভিঃ। ষট্ অশ্বৈঃ॥—১।১১৬।৪

হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা তিন রাত্রি, তিন দিন দ্রুতগামী 'পতঙ্গ' সকলের দ্বারা ভুজ্যুকে বহন করিয়াছিলে। জলপূর্ণ সমুদ্রের পারে, জলবর্জ্জিত দেশে, শতচক্রবিশিষ্ট ষট্অশ্বযুক্ত তিনটী রথের দ্বারা (বহন করিয়াছিলে)।

অনারম্ভণে। তৎ। অবীরয়েথাম্। অনাস্থানে। অগ্রভণে। সমুদ্রে।
যৎ। অশ্বিনৌ। উহথুঃ। ভুজ্যুং। অস্তম্।
শতঅরিত্রাম্। নাবং। আতস্থিবাংসম্॥—১।১১৬।৫

হে অশ্বিদ্বয়! অবলম্বনহীন, ভূমিশূন্য. হস্তগ্রাহ্য বস্তুহীন, সমুদ্রে সেই (কার্য্য) করিয়াছ, যখন শত-দাঁড়যুক্ত নৌকায় স্থাপিত ভুজ্যুকে গৃহে আনয়ন করিয়াছিলে।

দেখিয়া মনে হয়, এই দুই ঋষি 'প্লবে'র সাহায্যে সমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন। সে কালে সমুদ্রে যে অনেক নৌকা যাতায়াত করিত, তাহার নিদর্শন এই যে, ভুজ্যু সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলে চারিটী নৌকা সেই সময়ে ঐ স্থান দিয়া গমনকালে তাঁহাকে উদ্ধার করে, এই সংবাদ। নৌকাদিগের এই আকস্মিক আগমন, দেবতাদিগের কৃপা ভিন্ন অন্য ভাবে ভাবা একালেও সম্ভব নয়। ঋষিগণ এই ঘটনা ঋক্‌বদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া আমরা সে কালের সমুদ্র পথে গমনাগমনের সংবাদ জানিতে পারিতেছি। তুর্বশ, যদু ও পুরুকুৎস সে কালের শত-দাঁড়যুক্ত নৌকার সাহায্যে গুজরাটের উপকূল দিয়া নর্ম্মদাতীরে আগমন করিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের যুক্তিযুক্ত অনুমান। কারণ, দেখান গিয়াছে, সমুদ্রযাত্রা অগস্ত্যের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি ঋক্ রচনা করিয়া ইন্দ্রের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন যে, তুর্বশ যদুকে সুমঙ্গলে সমুদ্রপার হইতে আনয়ন করুন। অগস্ত্য ঋষি সমুদ্র শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিয়া যদি আপন ঋকে সমুদ্র শব্দ ব্যবহার করেন, তবে উহার অর্থ সমুদ্রই বুঝায়; নদী বুঝাইতে পারে না।

তুর্বশ যদুগণকে যে ইন্দ্র সমুদ্র পার করিয়াছিলেন, তাহা বামদেব ঋষির এক ঋক্ হইতেও অবগত হওয়া যায়। (১) তিনি ইহাদিগকে 'অস্নাতারা' অর্থাৎ অনভিষিক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহারা পুরুবংশীয় ও মনুবংশীয় অভিষিক্ত রাজাদের অধীনে রাজত্ব করিতেন, এবং যখন আবশ্যক হইত, তাঁহারা ঐ সকল রাজবংশের যুদ্ধে সেনানায়ক-রূপে গমন করিতেন। ইহার উদাহরণ আমরা পরুষ্ণী-যুদ্ধে প্রাপ্ত হই। নিম্নে বসিষ্ঠের ঋক্ উদ্ধার করা গেল। (২)

উদ্ধৃত ঋকে বসিষ্ঠ ঋষি তুর্বশকে যক্ষু আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য ইহার অর্থ করেন,—'যজ্ঞকুশল'। আমরা অনুমান করি, ইনি যক্ষু নামক জাতির পুরোহিত ছিলেন। বৈদিক যুগে যক্ষু জাতির অস্তিত্ব আমরা বসিষ্ঠ

---

(১) উত। ত্যা। তুর্বশাযদূ। অস্নাতারা। শচীপতিঃ।
ইন্দ্রঃ। বিদ্বান্। অপারয়ৎ ॥—৪।৩০।১৭
এবং সেই অনভিষিক্ত তুর্ব্বশ যদুকে শচীপতি, বিদ্বান্, ইন্দ্র পার করিয়াছিলেন।

(২) পুরোড়াঃ। ইৎ। তুর্বশঃ। যক্ষুঃ। আসীৎ। রায়ে। মৎস্যাসঃ। নিশিতাঃ। অপীব।
শ্রুষ্টিং।চক্রুঃ। ভৃগবঃ। দ্রুহ্যবঃ। চ। সখা। সখায়ং। অতরৎ। বিষূচোঃ ॥—৭।১৮।৬
যক্ষু তুর্বশ ধনলাভের নিমিত্ত (জলে) দলবদ্ধ মৎস্য সকলের (গমনের) মত অগ্রগামী হইয়াছিলেন। ভৃগু ও দ্রুহ্যগণ শীঘ্র পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। সখা (ইন্দ্র), সখা (সুদাসকে) নানা দিকের (আক্রমণ হইতে) রক্ষা করিয়াছিলেন।

ঋষির রচনা হইতেই জানিতে পারি। (১) এই বক্ষু জাতি বর্ত্তমান সীরদরিয়া নামক নদীর তীরে বাস করিত বলিয়া আমরা অনুমান করি। এই অনুমানের প্রথম কারণ, সীরদরিয়ার প্রাচীন নাম Jaxartes বা যক্ষতের্শ। এই নামে বক্ষু শব্দের ছায়া বর্ত্তমান। দ্বিতীয় কারণ, টড তাঁহার রাজস্থানের ইতিহাসে বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ যুধিষ্ঠির ও বলদেবের সহিত জবুলি স্থানে গমন করিয়া গজনী নগর স্থাপন করেন, এবং সমরকন্দ পর্য্যন্ত দেশ ব্যাপিয়া নিবাস করেন। ( ২ ) শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবিতাবস্থাতেও তুর্বশ যদুদিগের মূল বংশ আফগানিস্থান ও সমরকন্দে সীর-দরিয়ার তীরে রাজত্ব করিতেছিলেন; নচেৎ ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া আফগানিস্থান ও তুর্কিস্থানে বাস ভারতবাসী যদুবংশীয়দিগের পক্ষে এত সহজ হইত না।

আমরা 'পুরুকুৎস ও ত্রসদস্যু' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, দিবোদাসের পুত্র স্বীয় পিতার শম্বরজয়ের স্তব রচনা করিয়াছিলেন। ঐ স্তবে শরৎদাসের সাত পুর জয়ের উল্লেখও আছে। ( ৩ ) শম্বরের পুর বৈলস্থানে অবস্থিত ছিল। ইহা যে 'ভীল'দিগের দেশ, তাহা ঐ প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। শম্বর-জয়ের সহিত সাত পুর জয় একত্র উল্লিখিত হওয়ায়, আমরা অনুমান করি, উহাদের মধ্যে এক জন ( শম্বর ) বৈলস্থানে, অপর ( শরৎ ) মহাবৈলস্থানে বাস করিত। ( ৪ )

আমরা অপর এক প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, পরুষ্ণী-যুদ্ধে ক্ষিতিগণ পশ্চিম হইতে আগমন করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে তুর্বশ, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে, তুর্বশ যদু ও অনুদিগের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। অঙ্গিরাবংশীয় কুৎস ঋষি একটী ঋকে (৫) বলিয়াছেন যে, 'হে ইন্দ্রাগ্নি! যদ্যপি যদু, তুর্বশ, দ্রুহ্যু, অনু (বা) পুরুদিগের

( ১ ) অজাসঃ। চ। শিগ্রবঃ। বক্ষবঃ। চ। বলিং। শীর্ষাণি। জভ্রুঃ। অশ্ব্যানি।—৭।১৮।১৯ অজগণ, শিগ্রু গণ, যক্ষুগণ অশ্বের মস্তক সকল উপহার আহরণ ( বা প্রদান ) করিয়াছিল।

(২) But the sons of Crishna, who accompanied them (i.e. Yoodhishtira and Baladeva ) after an intermediate halt in the farther Do-ab of the five rivers, eventually left the Indus behind, and passed into Zabulisthan, founded Gajni, and peopled these countries even to Samarkand.—*Tod's Rajasthan, Vol I. p. 72.*

( ৩ ) ১।১৩১।৪ ( ৪ ) ১।১৩১।১ ও ৩। ( ৫ ) ১।১০৮।৮

মধ্যে থাক, এই সকল স্থান হইতে, হে বৃষম্বয়! এখানে আইস, অনন্তর সুত-সোম পান কর।' ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থানেও এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। আমরা অনুমান করি, ইহারাই পঞ্চ ক্ষিতি নামে ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ইহারা আফগানিস্থান ও উহার উত্তরবর্ত্তী সুমরকন্দ দেশে বাস করিত। ইহাদের পশ্চিমে পার্থবদিগের বাস ছিল, তাহা 'সম্রাট অভ্যাবর্ত্তী' প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। পার্থবদিগের পঞ্চ-মানুষী বিশদিগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয়, ক্ষিতিগণই উহাদের পঞ্চ-মানুষী বিশ ছিল, এবং পার্থব বংশই ইহাদের সম্রাট-বংশ।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

---

# সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা।

৫

সধবার প্রেম—( বিবাহের পূর্ব্বে জাত )

বিধবার প্রেমে পড়া হিন্দু সমাজের আদর্শ অনুসারে ঘোরতর পাপ-কার্য্য। এই সকল পাপ-চিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া কোনও কোনও হিন্দু বিধবা সংযম-ভ্রষ্ট হইতে পারেন, এই কারণে সমাজের পক্ষে এই সকলের চিত্রাঙ্কন নিতান্ত দুষণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু সধবা স্ত্রীর পরপুরুষের সহিত প্রেম করাটা সকল সমাজেই নিন্দনীয়, এবং তাহার চিত্রাঙ্কন সকল সমাজের পক্ষেই অনিষ্ট-জনক। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের অনেক উপন্যাসলেখক বিলাতী উপন্যাসকে আদর্শ করিয়া সধবার পরপুরুষের প্রতি প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং করিতেছেন।

সধবার পরপুরুষাসক্তি দুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ—কুমারী অবস্থায় এক জনকে ভালবাসিয়া পরে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হইলেও পূর্ব্ব প্রেম-ভাজনকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ—এক জনের সঙ্গে বিবাহের পরে অন্য পুরুষকে ভালবাসা। ইহার মধ্যে প্রথমটিতে বরং আমরা অবস্থা-বিশেষে, সেই রমণীকে কৃপার পাত্র মনে করিয়া ক্ষমা করিতে পারি; কিন্তু দ্বিতীয়টিতে সেই রমণী কোনও অবস্থায়ই ক্ষমার যোগ্য নহে। কিন্তু যে সকল লেখকের আর্ট আছে, তাঁহারা এই দ্বিতীয়টিতেও পরপুরুষাসক্ত রমণীকে নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া তাহার প্রতি পাঠকের সমবেদনা

আকর্ষণ করেন। ইহাতে তাঁহাদের আর্টের সার্থকতা হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু সমাজের হিসাবে তাহা অত্যন্ত দূষণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে তাঁহার শৈবলিনী-চরিত্রে, প্রথম শ্রেণীর প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার আর্টের গুণে এই বুড়া বয়সেও 'শৈবলিনী সৈ' পড়িতে পড়িতে আমাদের চোখে জল আসে। প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যকালের গভীর প্রণয় টেনিসনের এনক-আর্ডেন ( Enoch arden ) কে স্মরণ করাইয়া দেয়। শৈবলিনীর চন্দ্রশেখরের সঙ্গে, এবং প্রতাপের সুন্দরীর সঙ্গে বিবাহ হইলেও, উভয়ের মধ্যে সেই প্রেম রহিয়া গেল। শৈবলিনী তাহার দেবতুল্য স্বামীকে পাইয়াও সেই বাল্যকালের প্রেম ভুলিতে পারিল না। চন্দ্রশেখর বয়সে প্রবীণ,তিনি তাঁহার পুঁথি লইয়াই সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন; তিনি শৈবলিনীকে আপনার করিয়া লইবার কোনও চেষ্টাই করেন নাই। হয় ত শৈবলিনী তাঁহার প্রেমের স্বাদ পাইলে, প্রতাপকে ভুলিতে পারিত। কিন্তু যখন গৃহে তাহার প্রেম-পিপাসা মিটিল না, তখন সে প্রতাপকে পাইবে, এই পাগলের খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া লরেন্স ফষ্টরের নৌকায় গিয়া উঠিল। গ্রন্থকার কিন্তু শৈবলিনীকে কখনও ফষ্টরের সহিত মিলিত হইতে দেন নাই। আবার, প্রতাপ শৈবলিনীকে ফষ্টরের কবল হইতে উদ্ধার করিবার পর, যখন প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর সাক্ষাৎ হইল, তখনও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। শৈবলিনীর পাপ মানসিক পাপ; সেই পাপের জন্য শৈবলিনীর প্রতি আমাদের যথেষ্ট সমবেদনার উদ্রেক হয়। তাহা হইলেও গ্রন্থকার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুষানলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গ্রন্থের অধিকাংশ ভাগই সেই প্রায়শ্চিত্তের কথায় পরিপূর্ণ। ইহা দ্বারা পাঠকের মনে পাপীর প্রতি সহানুভূতি ও পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা হয়। প্রতাপ শৈবলিনীর কল্যাণ-কামনায় যখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়া আপনার মানসিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল, তখন তাহা দেখিয়া হৃদয়ে উচ্চ ভাবের সঞ্চার হয়। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের আর্টের সার্থকতা। তবুও প্রেমের মাদকতা এত বেশী যে, শৈবলিনীর কঠোর দণ্ড দেখিয়াও লোকের মনে পাপাসক্তি কমে না। এবং শৈবলিনীর অনুকরণে পরপুরুষাসক্তি সমাজে চলিয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

স্যার রবীন্দ্রনাথের কোনও উপন্যাসে আমরা এই শ্রেণীর প্রেমের চিত্র পাই না। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'দেবদাসে' এই শ্রেণীর আর

একটি প্রেমচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহা তাঁহার আর্টের গুণে নিতান্ত মর্ম্মস্পর্শী ও tragic হইয়াছে। যে নারী বিবাহের পরে পরপুরুষকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতে থাকে, সে দ্বিচারিণী, সন্দেহ নাই। দ্বিচারিণী রমণী সকল সমাজেই নিন্দনীয়। কিন্তু লেখক পার্ব্বতীকে এরূপ অবস্থাপরম্পরার মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন যে, তাহার প্রতি আমাদের রাগ হয় না, বরং তাহার দুরদৃষ্টের জন্য দুঃখ হয়। প্রতাপ-শৈবলিনী অথবা রমা-রমেশের ন্যায় পার্ব্বতী ও দেবদাস বাল্যকালে এক সঙ্গে খেলা করিত, এক পাঠশালায় পড়িত, এক সঙ্গে দুষ্টামী করিত। দেবদাস তাহার দুষ্টামীর জন্য পাঠশালা হইতে তাড়িত হইল; পার্ব্বতীও গুরুমহাশয়ের নামে মার-পিটের মিথ্যাভিযোগ উপস্থিত করিয়া পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করিল। কিন্তু দেবদাস অত্যন্ত গোঁয়ার; সে পার্ব্বতীকে অতি সামান্য কারণে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিত। তবুও পার্ব্বতী তাহাকে ভাল না বাসিয়া পারিত না। ক্রমে দেবদাস বড় হইল; তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় পাঠান হইল। সেখানে গিয়া তাহার লেখাপড়ায় মনোযোগ হইল, এবং কলিকাতার সংসর্গে তাহার অনেক গ্রাম্যতা দোষ কাটিয়া গেল, সে সভা ভব্য বাবু হইল। সে প্রথম প্রথম পার্ব্বতীকে প্রায়ই পত্র লিখিত—ক্রমে তাহাও বন্ধ হইল। গ্রীষ্মের বন্দে দেবদাস বাড়ীতে আসিয়া পার্ব্বতীদের বাড়ীতে গেল, কিন্তু পার্ব্বতীর সঙ্গে বেশী কথা কহিতে পারিল না, তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। পার্ব্বতীর বয়স তের বছর হইয়াছে। পিতা মাতা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পার্ব্বতী দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী, দেবদাসের পিতা খুব বড়লোক; পার্ব্বতীর মাতা দেবদাসের সঙ্গে পার্ব্বতীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পার্ব্বতী 'বেচাকেনা ঘরের মেয়ে, তার ওপর আবার ঘরের পাশে কুটুম্ব, ছিঃ ছিঃ!'—এই কারণে দেবদাসের পিতার এ বিবাহে মত হইল না। পার্ব্বতীর পিতাও জেদ করিলেন, যত শীঘ্র হয় তিনি অন্য পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবেন। তাঁহার মেয়ে ত কুৎসিত নয়, পাত্রের অভাব কি? কিন্তু তাঁহার এই সংকল্প শুনিয়া পার্ব্বতীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ('বাজ' নহে!) সে তাহার সখী মনোরমাকে বলিল, 'আমি জানি আমার স্বামীর নাম দেবদাস......আমি দেবদাসকে জিজ্ঞাসা করিব, তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন কি না?'—'বলিস্ কি? লজ্জা করবে না?' 'লজ্জা কি? তোমাকে বল্‌তে কি লজ্জা কল্লুম?' 'মনোদিদি, তুই মিছামিছি মাথায় সিন্দূর পরিস্। কাকে স্বামী বলে, তাই

জানিস্ নে। তিনি আমার স্বামী না হ'লে, আমার সমস্ত লজ্জা সরমের অতীত না হ'লে, আমি এমন করে মরতে বসতুম না। তা ছাড়া দিদি, মানুষ যখন মরতে বসে, তখন সে কি ভেবে দেখে, বিষটা তেতো কি মিষ্টি? তাঁর কাছে আমার কোনও লজ্জা নেই।' একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া পাড়া-গেঁয়ে মেয়ের মুখে এরূপ কথা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না কি? কিন্তু লেখক তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, পার্ব্বতী অকালপক্ক বালিকা। তাহা হইলেও যেন কেমন কেমন লাগে। যাহা হউক, পার্ব্বতী যথার্থই এক দিন গভীর রাত্রে একাকিনী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দেবদাসদের বাড়ীর সদর-দরজায় দরোওয়ানদিগের ও অন্দরে দাসদাসীদিগের হাত এড়াইয়া দোতালায় দেবদাসের শয়নগৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। দেবদাস হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'এমন কাজ করলে পারু! এত রাত্রে—ছি ছি, কাল মুখ দেখাবে কেমন কোরে?' পার্ব্বতী বলিল, 'আমার সে সাহস আছে।' পার্ব্বতী মনে মনে নিশ্চয় জানিত, দেবদাস তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার সমস্ত লজ্জা ঢাকিয়া দিবে। সে দেবদাসের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অবরুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, 'এইখানে একটু স্থান দেও দেবদা!' দেবদাস অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'বাপ মায়ের একেবারে অমত, তা জানো? —তবে আর কেন?' পার্ব্বতী তাহার পা-চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। পরে দেবদাস পার্ব্বতীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে রাখিতে গেল। পার্ব্বতী বলিল, 'যদি দুর্নাম রটে, হয় ত কতকটা উপায় হতে পারবে।'

এক ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার এইরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার বাস্তব-জীবনে প্রায়ই দেখা যায় না। সাহিত্যেও ইহার একমাত্র তুলনা এই গ্রন্থকারের 'অরক্ষণীয়া'-চরিত্রে। মনোরমার সহিত কথোপকথনে গ্রন্থকার পার্ব্বতীর মুখ দিয়া যে কৈফিয়ৎ বাহির করিয়াছেন, তাহাও এই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার মুখে শোভা পায় না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। যাহা হউক, লেখকের বর্ণনার গুণে এই অসম্ভব ব্যবহারও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে।

ইহার পরে দেবদাস তাহার পিতার নিকট পার্ব্বতীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিল। পিতা ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, জননী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, দেবদাস তাহার তোড়-জোড় বাঁধিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া এই মর্ম্মে পার্ব্বতীকে পত্র লিখিল—'তোমাকে সুখী করিতে গিয়া পিতা মাতাকে এত বড় আঘাত দিব, তাহা আমার দ্বারা

অসাধ্য, আর আমি যে তোমাকে বড় ভালবাসিতাম, তাহা আমার কোনও দিন মনে হয় নাই—আজও তোমার জন্য আমার অন্তরের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ অনুভব করিতেছি না, শুধু এই আমার বড় দুঃখ, যে তুমি আমার জন্য কষ্ট পাইবে !'

এই শেষ কথাটা লিখিয়া দেবদাসের মনে অনুতাপ হইল। এই শেষ কথাটাই উভয়ের জীবনের কাল হইল। দেবদাসের স্বভাব এই যে, সে কোনও কাজই ভাবিয়া চিন্তিয়া করিতে পারে না, নিতান্ত ঝোঁকের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করে। সে পার্ব্বতীকে ঐ চিঠি লিখিয়া অনুতপ্তমনে কলিকাতা হইতে বাড়ী গেল। এ দিকে হাতিপোতার জমীদার ভুবনমোহন চৌধুরীর সঙ্গে পার্ব্বতীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। ভুবন বাবু প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরে প্রৌঢ় বয়সে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেছেন। বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব্বে পার্ব্বতী দু-প্রহর বেলায় কলসী-কক্ষে বাঁধে জল আনিতে গিয়া দেখিল, দেবদাস এক কুল গাছের আড়ালে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে। দেবদাস পার্ব্বতীকে কাছে ডাকিয়া বলিল, 'আমি এসেছি পারু !' পার্ব্বতী বলিল, 'কেন ?' 'তুমি আসতে লিখেছিলে, মনে নাই ?' 'না।' অবশেষে দেবদাস বলিল, 'আমি যেমন করিয়া পারি, মা বাপের মত করিব।'

পার্ব্বতী বলিল, 'তোমার মা বাপ আছেন, আমার নেই ?'......'তোমাতে কিছুমাত্র আমার আস্থা নাই। আমি যাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি ধনবান, বুদ্ধিমান—শান্ত স্থির। তিনি ধার্ম্মিক। আমার মা-বাপ আমার মঙ্গল কামনা করেন; তাই তাঁরা তোমার মত এক জন অজ্ঞান, চঞ্চলচিত্ত, দুর্দ্দান্ত লোকের হাতে আমাকে কিছুতেই দিবেন না। তুমি পথ ছেড়ে দাও।' ইহার পরে উভয়ের ঝগড়া হইল। দেবদাস রাগে অপমানে ভীষণ হইয়া উঠিয়া বলিল, 'শোন পার্ব্বতী, অতটা রূপ থাকা ভাল নয়। অহঙ্কার বেড়ে যায়। দেখ্‌তে পাও না, চাঁদের অত রূপ বলেই তাতে কলঙ্কের কালো দাগ; পদ্ম অত সাদা বলেই তাতে কালো ভোমরা বসে থাকে। এস, তোমার মুখেও কিছু কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দিই।' এই বলিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে সেই ছিপের বাঁট ঘুরাইয়া পার্ব্বতীর মাথায় আঘাত করিল, সঙ্গে সঙ্গেই কপালের উপর বাম ভ্রূর নীচে পর্য্যন্ত চিরিয়া গেল। চক্ষের নিমিষে সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিয়া গেল।

'দেবদা' কোরলে কি ?' বলিয়া পার্ব্বতী মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। দেবদাস

তখন তাহার জামা ছিঁড়িয়া জলে ভিজাইয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিল। পার্ব্বতী বলিল, 'দেবদা, কাউকে যেন বোলো না'—'মাপ কর আমাকে।' দেবদাস অবশেষে পার্ব্বতীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, 'তুমি ভালই করেছ। আমার কাছে তুমি হয় ত সুখ পেতে না, কিন্তু তোমার এই দেবদাদার অক্ষয় স্বর্গবাস ঘটত।'

ইহার পরে চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পার্ব্বতীর বিবাহ হইল, এবং সে স্বামীর গৃহে চলিয়া গেল। তাহার স্বামী এক জন সচ্চরিত্র, বিচক্ষণ, সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। বয়স চল্লিশের উপর। তাঁহার অনেকগুলি বড় বড় ছেলে মেয়ে। তিনি এই বয়সে বিবাহ করিয়া নিজেকে নিতান্ত অপরাধী জ্ঞান করিতেন। শয্যায় শুইতে আসিয়া প্রথম স্ত্রীর কথা মনে করিয়া চোখের জল মুছিতেন। তাঁহার রাজার সংসার। পার্ব্বতী অল্প দিনের মধ্যেই নিজের চরিত্রগুণে সেই ছেলে মেয়েদিগকে স্নেহে বশ করিয়া ফেলিল, এবং সংসারে রাজরাণীর মত প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিল।

এ দিকে দেবদাস কলিকাতায় গিয়া চুনীলাল নামক বিশৃঙ্খল-চরিত্র যুবকের সহিত মিশিয়া চন্দ্রমুখী নাম্নী এক বেশ্যার বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিল, এবং মদ ধরিল। সেই চন্দ্রমুখীকে সে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত, কিন্তু চন্দ্রমুখী তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। দেবদাসের পিতা মাতা তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সে কিছুতেই বিবাহ করিল না। পরে পিতার মৃত্যু হইলে দেবদাস বাড়ীতে আসিল। পার্ব্বতীও তখন পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। শ্রাদ্ধ শেষ হইলে সে দেবদাসের বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য ধর্ম্মদাসের নিকট তাহার চরিত্রকাহিনী সমস্ত অবগত হইল। তখন তাহার মনে হইল—'তাহার দেব দাদা এমন হইয়া যাইতেছে, এমন করিয়া নষ্ট হইতেছে, আর সে পরের সংসার ভাল করিবার জন্য বিব্রত! পরকে আপনার ভাবিয়া সে নিত্য অন্ন বিতরণ করিতেছে, আর তাহার সর্ব্বস্ব আজ অনাহারে মরিতেছে।' পার্ব্বতী সন্ধ্যার পরে দেবদাসের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। দেবদাস বলিল, 'দু'জনে মিলে মিশে একটা ছেলে-মানুষি করে ফেলে—এই দেখ দেখি মাঝ থেকে কি গোলমাল হয়ে গেল। রাগ করে তুই যা ইচ্ছে তাই বললি, আমিও কপালের ওপরে ঐ দাগই দিয়ে দিলাম।' পার্ব্বতী বলিল, 'দেবদাদা, ঐ দাগই আমার সান্ত্বনা, ঐ আমার সম্বল।' অবশেষে পার্ব্বতী দেবদাসকে বলিল, 'প্রতিজ্ঞা কর, আর মদ

খাবে না।' দেবদাস কিছুতেই প্রতিজ্ঞা করিল না। পরে পার্ব্বতী মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া অনেক কান্না কাঁদিল। পরে বলিল, 'দেবদা, আমার যে বড় কষ্ট,—আমি যে মরে যাচ্ছি। কখনও তোমার সেবা করতে পেলাম না—আমার বাড়ী চল—আমার ছেলেবেলার সাধ—স্বর্গের ঠাকুর' আমার এ সাধটী পূর্ণ করিয়া দাও—তার পরে মরি—তাতেও দুঃখ নাই।' দেবদাস তাহার পদপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—'আমাকে যত্ন করিলে যদি তোমার দুঃখ ঘুচে—আমি যাব।'

পার্ব্বতী স্বামিগৃহে ফিরিয়া গিয়া আবার তাহার সংসারধর্ম্মে মন দিল। বড় ছেলে মহেন্দ্রের বিবাহ দিয়া বৌ ঘরে আনিল। গরীব দুঃখীকে দান করিয়া, ঠাকুরবাড়ীর কাজ করিয়া, সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া, অন্ধ শ্বশুরের পরিচর্য্যা করিয়া তাহার দিন কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আর পাঁচ বৎসর অতীত হইল। তাহার কোনও সন্তান হইল না। পুত্রবধূ ঘরে আনার পর তাহার কাজ অনেকটা কমিয়াছে, এখন তাহার ভাবনা কিছু বাড়িয়াছে। সে নৈরাশ্যের ভাবনা। সে কখনও কাজ করিয়া, মিষ্ট কথাবার্ত্তা কহিয়া, পরোপকার, সেবা শুশ্রূষা করিয়া সময় কাটায়; আবার কখনও সব ভুলিয়া ধ্যানমগ্না যোগিনীর মতও থাকে। এই সময়ে হঠাৎ তাহার বাল্যসখী মনোরমার এক চিঠি পাইল,—'দেবদাস নিতান্ত উচ্ছন্ন গিয়াছে। সে প্রায়ই কলিকাতায় থাকে, বাড়ী আসে কেবল টাকা লইতে আর তাঁহার দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিতে। এই সময়ের মধ্যেই নাকি তাহার অর্দ্ধেক বিষয় উড়াইয়া দিয়াছে। তাহার সে সোনার বর্ণ নাই, সে চেহারা নাই, দেখিলে ভয় হয়, ঘৃণা করে—' ইত্যাদি। এই চিঠি পাইয়া পার্ব্বতী দুইখানা পাল্কীতে বড় ছেলেকে সঙ্গে লইয়া পিত্রালয়ে রওনা হইল। কিন্তু সেখানে গিয়া দেবদাসের দেখা পাইল না। মনোরমা বলিল, 'পারু, দেবদাসকে দেখ্‌তে এসেছিলে?' পার্ব্বতী বলিল, 'না, সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলাম। এখানে তার আপনার লোক ত কেউ নেই।' মনোরমা অবাক হইয়া বলিল, 'বলিস্ কি? লজ্জা করতো না?' 'লজ্জা আবার কাকে? নিজের জিনিস নিজে নিয়ে যাব, তাতে লজ্জা কি?' 'ছিঃ ছিঃ— ও কি কথা? একটা সম্পর্ক পর্য্যন্ত নেই—অমন কথা মুখে এনো না।' পার্ব্বতী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, 'মনোদিদি, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যে কথা বুকের মাঝে বাসা করে আছে, এক আধবার তা' মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়ে। তুমি বোন, তাই এ কথা শুন্‌লে।'

ভারতবর্ষের তখনকার ভাগ্যবিধাতৃগণের শিক্ষা ও সভ্যতা কিরূপ ছিল, এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। এ কথার উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়, তাঁহারা যাযাবর ছিলেন। ইহাই তাঁহাদের সম্যক্ পরিচয়। তাঁহাদের এই যাযাবরত্বের পরিচয় শুধু তাঁহাদের দেশের শাসন ও সংরক্ষণের প্রণালী ব্যতীত সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও পাওয়া যায়। যাযাবরদের একটী বিশেষ পরিচয়—তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন। আমাদের মুসলমান সম্রাটগণ ও তাঁহাদের সঙ্গীদের মধ্যে যে কিরূপ বহুবিবাহের প্রচলন ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। যাযাবরত্বের আর একটী চিহ্ন—কৃষির উপর বিতৃষ্ণা ও ধীরে ধীরে পরিশ্রম করিয়া সম্পত্তি গড়িয়া তুলিবার উপর অনাস্থা। মুসলমানদের মধ্যে এই ভাবও তখন বেশ প্রকট ছিল। অস্ত্রের ঝন্ঝনা ব্যতীত আর একটী জিনিস তাঁহাদের প্রিয় ছিল—সেটী ব্যবসায়। ইহাও যাযাবরত্বের অন্যতম নিদর্শন। তাঁহারা গাড়ী গাড়ী পণ্য বোঝাই করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসিতেন। তুর্কীরা যে সব দেশ জয় করিয়াছিল, সেই দেশবাসী কৃষকেরা (পারস্য ও আফগানিস্থানের তাজিকগণ ও মধ্য-এসিয়ার সারটীমগণ) তুর্কীদের অন্ন জল যোগাইত।

আফগান ঘোরী, লোদী ও সৈয়দরাও এই তুর্কীদের মত ছিল। এখনও তখনকার মত এই আফগানরা গরু চরায়, মেষ তাড়ায়, এবং যখন তাহাদিগকে রাখালী করিতে হয় না, তখন মারামারি করিয়া মরে। আফগান দেশে কৃষি, শিল্প ও সমস্তই পার্শিয়ান, আর্ম্মেনিয়াণ ও হিন্দুদের হাতে। আমাদের দেশে শত শত কাবুলী দেখা যায়; তাহারা পীঠে মোট বাঁধিয়া পণ্য লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। তাহারা স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসে, এবং সর্ব্বদা সীমানা বদল করিবার প্রয়াসী। (বর্ত্তমান আফগান যুদ্ধ ইহাদের এই প্রকৃতির অনেকটা পরিচায়ক) এক বাড়ীর সীমানার সহিত অন্য বাড়ীর সীমানার গণ্ডগোল লাগিয়াই আছে। এক গ্রামের সীমানার সহিত অন্য গ্রামের সীমানার কত যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা বলা একরূপ দুঃসাধ্য। De Sacyর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'তাহারা কোনও আইনের বাঁধনের বা একটী নির্দ্দিষ্ট শাসনের অধীন থাকিতে একেবারে অক্ষম। সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত ঝগড়াঝাঁটী ও হাতাহাতীর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক এল্‌ফিনষ্টোনকে জনৈক আফগান বলিয়াছিল—'অমিল, অশান্তি ও রক্তপাত আমাদের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম—আমরা কাহারও অধীনে পরিচালিত হইয়া থাকিতে পারি না, পারিব না।'

এখন দেখা যাইতেছে, তুর্কী ও আফগান, উভয়েই জাতিগত ও ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও সেই এক যাযাবর জাতি। কিন্তু এই যাযাবরত্বেরও নানা স্তর আছে। এই যে অস্থিরতা, অশান্তিপ্রিয়তা, কৃষির উপর বিতৃষ্ণা, নিয়মের অধীনতার উপর ঘৃণার বিকাশ নানা স্তরের সৃষ্টি করে—এই সকল তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন ক্রমে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ১৫২৬—১৮৫৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত যে মুসলমানবংশের লোক একের পর এক রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের রাজত্বকে যে কেন মুঘলবংশ বলা হয়, ঐতিহাসিকরা সে জন্য বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। এই তুর্কীরা মুঘলদিগকে দেখিতে পারিত না। যাবর

ও তাঁহার সঙ্গীরা সবাই তুর্কী; অথচ তুর্কী-প্রতিষ্ঠিত সম্রাজ্যের নাম মুঘল সম্রাজ্য হইয়া গেল। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, বহু দিন হইতে যেটা চলিয়া আসিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছার অভাব, এবং নিজেরা যে যাযাবর, সেই পরিচয়টা না ঢাকিবার চেষ্টা।

এই যাযাবর জাতিরাই ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্যের স্থাপয়িতা। মুসলমান শাসনপ্রণালীও যাযাবর-জাতীয়। তাঁহাদের দেশশাসন-প্রণালীতে, সামাজিক আচার ব্যবহারে, যে দেশ তাঁহারা জয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি ব্যবহারে, ও অধিকৃত দেশবাসীর সহিত সংস্রবে তাঁহাদের যাযাবরত্ব স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অদৃষ্টবিপর্য্যয়ে, রাজবংশের পরিবর্ত্তনে—তাঁহাদের সমগ্র ইতিহাস ব্যাপিয়া এই যাযাবরত্বের ছাপ মুদ্রিত হইয়া আছে। আফগান, তুর্কী, সকল মুসলমান রাজত্বের সময়েই এই যাযাবরত্বই তাঁহাদের ইতিহাসের কলকাঠী-ইহাই তাঁহাদের সভ্যতার অঙ্গ।

যে ইচ্ছায় তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশ আক্রমণ ও বিজয়ের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইতেন, সেই ইচ্ছায় হুণ ও মঙ্গলদের যাযাবরত্ব খুব বেশী ভাবে ফুটিয়া উঠিত। এই ভারতবিজয়ী আফগান ও তুর্কী মুসলমানেরাও ঠিক সেই হিসাবে যাযাবর ছিলেন। তাঁহাদের দেশে দেশে বিজয়-পতাকা বহিয়া বেড়াইবার প্রবৃত্তিতেই যাযাবরত্ব অধিকপরিমাণে ফুটিয়া উঠিত। ভিন্ন দেশ লুঠতরাজ করিয়া বিধ্বস্ত করিবার স্পৃহা, বাণিজ্য ও শান্তি না থাকার দরুণ দেশের লোকের উগ্রতার অভাব না থাকা ও দেশ-বিজয়ের দারুণ আকাঙ্ক্ষাই মুসলমান-দিগকে ভারতবর্ষের সমতল ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছিল। কোনও কোনও ঐতিহাসিক মুসলমান রাজাদের নিযুক্ত ঐতিহাসিকদের পরে লিখিত বিবরণী প্রভৃতি হইতে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, এই সকল মুসলমান-আক্রমণ, বিশেষতঃ গজনীর মামুদের আক্রমণ শুধু দেশ-আক্রমণ নহে। ইহার সর্ব্বপ্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্ম্মের প্রচার। কিন্তু এই সকল আক্রমণকারীদের চরিত্র ও তাঁহাদের কার্য্যপরম্পরা লক্ষ্য করিলেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ধর্ম্ম-প্রচার তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং তাঁহাদের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইতে ধর্ম্ম সভয়ে পলায়ন করেন। 'আল-উটবি'তে লিখিত হইয়াছে,—'সাবক্তগীন বহুবার জেহাদ করিয়াছেন। তিনি বহু পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার করিয়া দুর্গবাসী সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া বহু ধন রত্ন অধিকার করেন। ইহা ছাড়া আরও যত রকম দ্রব্য থাকিত, সবই তাঁহার অধিকারে আসিত। তিনি ভারতবর্ষের বহু নগর দখল করিয়াছিলেন।' ইহাই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের প্রশংসাপত্র। অনেক সময় মুসলমান সুলতানেরা তাঁহাদের অধীন লোকদিগের পারিবারিক বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতেন। কোনও দেশ বিজিত হইবার পর প্রথম প্রথম সে দেশ সুলতানদের কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা শাসিত হইত। তাঁহাদের স্বজাতি ও স্বধর্ম্মী এই কর্ম্মচারীরা বিজয়গর্ব্বে বিজিতদের উপরে যথেচ্ছাচারের চূড়ান্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই যথেচ্ছাচারিতা, অত্যাচার-প্রিয়তাটা শেষে সুলতানদের মধ্যেও প্রবেশলাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে এই হইয়াছিল যে, হিন্দুদের উপর কর্ম্মচারীরা যে অত্যাচার, অবিচার করিত, সুলতান আবার তাহাদের উপরও সেইরূপ অত্যাচার যথেচ্ছাচার করিতেন। যেমন দেশের সম্ভ্রান্ত আমীর ও ওমরাহ-

ইতস্ততঃ সরান যায়। ছুড়িবার সময় স্প্রিং কিংবা ওইরূপ অন্য কিছুর সাহায্যে সজোরে ছুড়িতে হয়। জলে পড়িয়া ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিল। চোরা জাহাজ আহত হইল না বটে, কিন্তু জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে বাধ্য হইল। কাপ্তান ও তাঁহার লোকজন যুগপৎ ধৃত হইলেন। চোরাবোটও অবরোধ করা হইল। ইহা 'পলিনেসিয়ান' জাহাজ টর্পেডো করে। কতকগুলি জাহাজ তাহার নির্ম্মম আক্রমণে সমুদ্রজলতলগত হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলেন, 'আমি যা করেছি, তাতে দেশে ফিরিলেই লক্ষপতি হব', এবং জলের বদলে স্থলে কাজ করবার ছয় মাস ছুটী পাব।'

দিন গুণিতে গুণিতে এক মাস হইল; আমাদের যাওয়া আর হয় না। শেষে এক দিন Oceania নামক জাহাজে চড়িলাম, কিন্তু প্রহরী-জাহাজের অভাবে সে দিন রওনা হওয়া হইল না। জাহাজ মার্সেল হইতে আসিয়াছে— বিস্ফোরকে বোঝাই। বন্দরে জাহাজে এক পক্ষ কাটিল—বৈচিত্র্যহীন জীবন; বিশেষ ভাল লাগিল না। প্রত্যহ লোক আসে; জাহাজ ডুবি হইয়াছে— চোরা-বোটের মরণ-কবল এড়ান দুঃসাধ্য; যাহারা আসিত, তাহারা কোনও রকমে প্রাণ বাঁচাইয়া রক্ষা পাইত। প্রাতরাশ সম্পন্ন হইয়াছে; প্রাতঃকাল; বন্দর হইতে জাহাজ নির্গত হইল। এক মাইল যায় নাই—চারি দিকে চারিটি 'পেরিস্‌কোপ' দৃষ্ট হইল; সহসা বজ্রপাতেও মানুষকে এত আশ্চর্য্য করে না। মুহূর্ত্তের জন্য কি করিতে হইবে কাপ্তান তাহার কিছু ঠিক করিতে পারিল না। পশ্চাতের 'সবমেরিণ' নিকটে ছিল—কাপ্তেন জাহাজ দক্ষিণে দ্রুত ফিরাইল— জাহাজের ৬ মিটার দূর দিয়া বিক্ষিপ্ত জলে ছুটিয়া গেল। ত্বরিতে জাহাজ সম্মুখে আগান হইল; এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত নির্ম্মিত net-workএর ভিতর প্রবেশ করিয়া আমরা নিরাপদ হইলাম—দুই ঘণ্টা যাবৎ সেখানে আমাদের অবস্থিতি হইল। পুনরায় যাত্রা সুরু হইল; এক ঘণ্টাও হয় নাই, উপকূল-সন্নিকটে প্রায় আটশত গজ দূরে ক্ষুদ্র শিশুর মস্তকের মত অস্পষ্ট কি দেখা গেল, চাহিয়া দেখিলে সহসা মনে হয়, কোনও শিশু network জলে ভাসাইয়া রাখিতে প্রয়াস পাইতেছে, আমাদের ভ্রান্তি শীঘ্র দূর হইল; প্রথমে যাহাকে শিশু-মস্তক বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা মস্তক নয়; জলের উপর প্রায় দুই ফিট উচ্চ চোরা বোটের একটি দণ্ড। তাহা নিশ্চল; ইতস্ততঃ একটুকুও সঞ্চলিত হয় না। এই কারণে ইহাকে 'সবমেরিন' বলিয়া কেহ মনে করে নাই। ইহার পাঁচ মিনিট পরে দাণ্ডাটি জলে ডুব দিল, এবং কাৎনার মত কিছু দূরে গিয়া

আবার উঠিল। আসল ব্যাপার কিঞ্চিৎ গুরুতর বুঝিতে পারিয়া উল্‌টা দিকে ফিরিয়া net-workএর ভিতর দ্রুত প্রবেশ করিলাম।

চারি দিন এই ভাবে কাটিল; সন্ধ্যার সময় আবার সমুদ্রে বাহির হওয়া গেল। এবার সঙ্গে আরও দু'টি জাহাজ ও ভোজপুরী-পালোয়ান-প্রতিম চারিটি ডেস্‌ট্রয়ার ছিল। তৃতীয় দিন প্রত্যূষে ফ্রেঞ্চ ডেসট্রয়ার তারবিহীন বার্ত্তা পাইল, ...স্থানে একটি জাহাজ টর্পেডো হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ডেস্‌ট্রয়ার একটি সব্‌মেরিন ধরিয়াছিল। আহত জাহাজের সাহায্য করিতে ইহাকে দারদানেলিসের দিকে ছুটিতে হইল। আমরা যেমন যাইতেছিলাম, তেমনই চলিলাম; সারা দিন কোনও অঘটন ঘটিল না। বেলা ৩টা; আমরা ঘুমাইতেছিলাম। ডেকের উপর কম্বল খাটাইয়া তাঁবুর মত করি, গ্রীষ্মের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার আওতায় শয়ন করি। চার চারিটা দিন তাস পিটিয়া কাটিয়াছে—ব্রিজ, হুইষ্ট, মনি, ৩০৪, ২৮ পিকেট ও রুসাইট—একে একে কত খেলাই খেলা হইল। কত আমোদ, কত কৌতুক! কারণ, জানিতাম, দুঃখ কাহাকে বলে তাহা না জানিলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি নাই। দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, তবু আমার কি দুঃখ, এই কথা অযথা নিয়ত ভাবিয়া অনেকে দুঃখ পায়! এ যেন অতি সতর্ক রাজকর্ম্মচারীর মনে অহরহঃ পীতাতঙ্ক, কিংবা ইউরোপের পীতাতঙ্ক। আমাদের প্রতি সর্ব্বদা 'লাইফ-বেল্‌ট' পরিয়া থাকিবার আদেশ ছিল; এমন কি, ঘুমাইবার সময়েও। ইহা ব্যতীত আমরা প্রত্যেক দুই ঘণ্টা করিয়া বিপদ হয় কি না তাহা দেখিবার জন্য প্রহরী থাকিতাম। বিপদের আশঙ্কা কেহ করে নাই—বিশেষ-ভাবে সতর্কও কেহ থাকিত না। দিবসে আমরা এক ভাবে এক পথে চলিতাম—সাধারণতঃ ঘুরান পথ অবলম্বন করিয়া; রাত্রে আমাদের গতি আর এক ভাবের ছিল—সর্ব্বাপেক্ষা সোজা পথ ধরিয়া চলিতাম। অদ্য আমাদের ভাগ্যে বিষম বিপদ ছিল—আমরা পূর্ব্ব হইতে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। সকলে নিদ্রামগ্ন—কি এক বিকট শব্দ শুনিয়া উত্থিত হইলাম। দক্ষিণ কান ডেকের উপর চাপিয়া শুইয়াছিলাম; লাফাইয়া উঠিয়া জাহাজের অতি পুরো-ভাগে উপস্থিত; ইচ্ছা, তেমন কিছু ঘটিলে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িব। যে সকল অফিসরের উপর জাহাজ-পরিচালনার ভার ছিল, তাহারা বেণ্ট পাড়িতেছে; অধরযুগল দৃঢ়বদ্ধ;—চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত; যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। মুখে কথা নাই; যাহা করিবার, যন্ত্রের মত তাহা নিষ্পন্ন হইতেছে, যদিও দেখিলে তাহাদের ভীতিবিহ্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একটি ইংরাজ

ছিল—একটুও বিচলিত হয় নাই; তাহার আশ্চর্য্য ধৈর্য্য! ব্রিটিশ-চরিত্রের এইটাই বিশেষত্ব। ইংরাজ বিপদসূচক রক্তনিশান তুলিয়া দিতে ছুটিল। নিম্নে ডেকে পুরুষ, রমণী, শিশু, এবং সৈন্য, অফিসার সকলেই ভয়প্রযুক্ত ইতস্ততঃ দৌড়িতেছিল—উদ্দেশ্য র‍্যাফ্‌ট অবলম্বন করিবে। আমার বন্ধুরা ব্যাপার কি কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা ভাবিল, জার্ম্মণ মস্তিষ্ক উদ্ভট নূতন বিপদের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে বিব্রত করিতেছে। পূর্ব্বে এরূপ অবস্থায় পড়ায় ব্যাপার কি হইয়াছে বুঝিতে বিলম্ব হইল না; বিপদ কতখানি,তাহাও বুঝিলাম। দুই এক সেকেণ্ড পরে কিছু ফাটার বিকট শব্দ শোনা গেল; সহসা জাহাজের চোঙ দিয়া অনর্গল ধূম নির্গত হইতে লাগিল। ইহা 'বয়লার' ফাটার শব্দ নয় উপলব্ধি করিয়া 'প্রভু, ত্বম ধন্য' এ কথা বলিলাম; কারণ, তাহা যদি হইত, তাহা হইলে জাহাজ চূর্ণ হইয়া অতল জলে মিশাইয়া যাইত; পরন্তু যে সব বিস্ফোরক ছিল, তাহা অধিকতর মারাত্মক বিপদ ঘটাইত। এরূপ বিপদ ঘটিলেও ঘটিতে পারে, এ কথা স্মরণ থাকায়, কি হইলে কি করিতে হইবে, তাহা মনে মনে পূর্ব্বেই ঠিক করা হইল। যেমন দেখা যেমন শোনা, তদনুযায়ী বিচার করিয়া কাজ করা, এ অতি সোজা কথা; শুধু এইটুকু সতর্ক থাকা যে, নির্ব্বোধের মত অযথা যেন মারা না পড়ি। বড় ভগবৎ-করুণা—safety valve আটকাইয়া যন্ত্রের খানিকটা উড়িয়া যায়; 'বয়লার' অক্ষত ছিল। এই হেতু দুরূহ বিপদ সহজেই কাটিয়া গেল। প্রচুর বিস্ফোরক ছিল; তাহারও কোনও ক্ষতি হয় নাই। তখন উল্লসিতমনে অফিসারেরা আসিয়া করমর্দ্দন করিলেন। আসল ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়, তা জানিবামাত্র convoy জাহাজ দুইটী ডেসট্রয়ার লইয়া চলিয়া গেল—আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একটী রাখিল। চোরাবোট সে দিন কোনও গতিকে আমাদের লক্ষ্য করিলে সাত পীরের নাম আমাদিগকে সমুদ্রকবল হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। আমরা যে শুধু টর্পেডোড্‌ হইতাম, তা নয়; 'মেসিনগানে'র গুলিতে বিদ্ধ হইয়া ছটফট্‌ করিয়া মরিতে হইত। কিন্তু কোনও অজানিত তৃতীয় হস্ত আমাদিগকে রক্ষা করিতেছিল—সে দিন আমাদের মরিবার দিন নয়। বার ঘণ্টা অপেক্ষার পর একটী ইংরাজ ডেসট্রয়ার আসিল; প্রহরীর সংখ্যা প্রথমে দ্বিগুণ, পরে ত্রিগুণ করা হইল। সন্ধ্যার সময় সহস্র চক্ষু দূর তরঙ্গ অনিমেষদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, যদি কিছু দেখা যায়।

রাত্রি তিনটা; একটী ছোট ক্রুইজার উপস্থিত—আমাদের পথ দেখাইতে

দেখাইতে চলিল; জাহাজ অচল—টানিয়া লইতে হইল। সন্ধ্যা হয় হয়; আলেকজান্দ্রিয়ের তীরভূমি দৃষ্ট হইল; ক্রমে জাহাজ বিপুল বন্দরে প্রবেশ করিল। সেখানে দুই দিন থাকিতে হয়। জাহাজ বন্দরে ঢুকিলে সেই দিনই রজ্জু দিয়া জলে নামি, এবং সন্তরণ দিয়া কূলে উঠি। শক্ত মাটীর উপর নিরাপদ পদক্ষেপ করিতে কি আনন্দ, স্বর্গসুখেরও তখন বোধ হয় ইহার সহিত তুলনা হইত না। দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে বলা যাইত না, কূলে উঠিতে পারিব কি না।—এ কথা ভাবিতেও সর্ব্বশরীর পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিল। রেলে চড়িয়া পর দিন পোর্টসেডে উপস্থিত। সেখান হইতে Paul le ghat জাহাজে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভারত সাগর শান্ত সমাহিত। এখানে বিপদ নাই, এবং বিপদের তেমন আশঙ্কাও নাই; দেশে ফিরিলাম—জলধি-সংপৃক্ত ভারতভূমি সাদরে আমায় ক্রোড়ে স্থান দিল; শুধু মাটী পর্ব্বত লইয়া দেশ নয়; সে জন্য মাতৃভূমির স্নেহকরস্পর্শ এত মধুর লাগিল। সে করদ্বয় দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিতে আমিও হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলাম; ভগবান, এ হস্ত যেন কখন ফিরাইতে না হয়, ভারতের আত্মার কত বড় ক্ষুধা, তা কি জানি না—সে ক্ষুধা আমারও ত।

## উপসংহার।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়াছি—যুদ্ধও শেষ হইয়াছে। কত ঘটনা—কত কথা, কত রকমে জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া আজ আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছে। পিছনে চাহিলে মনে হয়—ওই দূরে ছোট ছোট ধূম্রাকৃতি পর্ব্বতমালা; শ্যামল বন প্রান্তর—দুর্গ পরিখারেখা—দেখিতে কত স্পষ্ট; সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য ব্যূহ—জীবন-মৃত্যুর সন্ধি-পথ ওই আমাদের সীমান্তরাল, ওই কৃষ্ণ রক্তনিশান লক্ লক্ উড্ডীন—কার সগর্ব্ব পদস্পর্শে শ্যামল প্রান্তর ছিন্ন ভিন্ন—বন উপবন রক্তরঞ্জিত—গ্রাম পল্লী কলঙ্কিত; আমাদের কুটীর ধূলাশায়ী; তবু আমাদিগকে লজ্জা দিয়া কার সহস্র কণ্ঠের বজ্র-রব আকাশ মুখরিত করিয়া তুলিতেছে? বিজয়ী হইয়াও জয়-ভেরীর অপূর্ব্ব নিনাদ কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে না কেন? ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে পড়িতেছে, ১৯১৮ খৃঃ জার্ম্মাণীর রুদ্র অভিযান;—আমরা আক্রান্ত, প্রতিহত, এবং পরাজিত; শত্রুর নিপীড়নে আমাদের কণ্ঠদেশ রুদ্ধ—সমগ্র রক্তস্রোতও যেন স্তব্ধ—ফ্রান্সের সকল সন্তান এক হইয়াও এ অমিত বেগ প্রতিরোধ করিতে অক্ষম। এক পদ এক পদ করিয়া পিছু হটিতেছি। আর কতদূর হটিব—এ যে প্যারিস, সৌন্দর্য্যবিলাসিনী, আজ আর

তোমায় রক্ষা করিব না; তোমায় রাখিতে গেলে ফ্রান্সের আত্মা,—ফ্রান্সের লক্ষ সন্তান রক্ষা পায় না। তোমায় রাখিতে গেলেই তোমায় রাখিতে পারিব, তারও কোনও সম্ভাবনা নাই; তুমি পৃথিবীতে অদ্বিতীয়—মানবের সুখতৃপ্তির নন্দনকানন, তাও জানি; কিন্তু আজ তোমারই উপর তাণ্ডব-নৃত্যের আয়োজন করিতেছি। ফ্রান্সকে বাঁচাইতে গেলে তিন রকমের পরিখা কাটিয়া যুদ্ধ করা যাইতে পারে। প্রথম স্তরের সীমান্তরাল নির্ম্মিত হইবে প্যারিসকে সম্মুখে রাখিয়া; ভূগর্ভ হইতে আকাশের শেষ উচ্চতা পর্য্যন্ত আমাদের রক্ত, মাংস, অস্থি, লৌহ, প্রস্তর দিয়া অনন্ত-বিস্তৃত—অনন্ত-দীর্ঘ এক মহাপ্রাচীর—এক মহা বর্ম্ম নির্ম্মাণ করিব। সেই সীমান্তে রক্তের নদী বহিবে—নরমুণ্ডের পর্ব্বত হইবে—কঙ্কালের অরণ্য মাংসের স্তূপ মাথা নাড়া দিয়া উঠিবে। তাহার পশ্চাতে দ্বিতীয় স্তরের পরিখা সেখানে আমি মুক্ত-কৃপাণ-হস্তে থাকিব—এই অরক্ষিত সীমান্তে প্রাণ দিতে—মহাজড়কে সচল করিতে বিদ্যুৎবেগে শত্রুব্যূহে ঝাঁপাইতে —তাহাদের মর্দ্দিত করিতে, দলিত করিতে—তাহাদের বিতাড়িত করিতে। যদি এ মহা ব্যূহও ভেদ হইয়া যায়—যদি এ মহা বর্ম্ম ছিন্ন হয়, তবে জানিব, ফ্রান্সের আর উপায় নাই। জানি না, বিধাতার মনে কি আছে, কিন্তু তখনও আমি মরিব না। আমি তখন লুকাইব সকলের অন্তরের অন্তরতলে—জীবনের নিভৃত কন্দরে। সেইখানে আমার তৃতীয় স্তরের পরিখা খনন করিব—নূতন গিরি, নূতন দুর্গ, নূতন প্রান্তর, নূতন অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া এক মহাযুদ্ধ বাধাইয়া দিব। কঠোর তপস্যা করিব অন্তর হইতে বাহিরকে উদ্ধার করিতে—সে পরিখা হইতে কোন শত্রু আমায় বিতাড়িত করিবে? আর সময় আসিলে উল্লম্ফনে ঝঞ্ঝার মত, অগ্ন্যুদগমের মত সকলের সামনে বাহির হইব, আমার স্বরূপকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করিব; নব প্রেরণায় মানবাত্মার বিজয়গীতি পৃথিবীতে ঘোষিত হইবে, তখন ফ্রান্সের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা সত্য-রূপ লইয়া মানুষের নিকট মূর্ত্ত হইবে।

এই যে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে—ইহা বাহিরের যুদ্ধ; একটা পৃথিবীকে যেন ধ্বংস করিয়া গেল। এই স্থূল যুদ্ধ রক্ত-মাংসের সহিত রক্ত-মাংসের—তাই গোলাগুলি ফাটিল, মেসিনগান ছুটিল। কিন্তু যে নূতন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহা হইবে মানস জগতে; এই যুদ্ধ করিতে মানুষ বুঝিবে তৃতীয় স্তরের পরিখাটা কি। কামান বোমা এখানে বড় কিছু করিতে পারিবে না—মানুষ Organisation করিবে, এবং আত্মা কি, তাহা না বুঝিলেও, তাহার আভাস পাইবে; এই

আশঙ্কা, এই প্রচেষ্টা—বস্তুসর্ব্বস্ব Economical সভ্যতার মূলে আঘাত করিবে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই এই কথা স্বতঃ মনে আসিবে—যুদ্ধের রিনি-ঝিনির ভিতর দিয়া কোন্ শক্তি আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে? এবং আমরাই বা কোন্ শক্তির অঙ্গুলিসঙ্কেতে পরিচালিত হইব? হিরণ্ময়-দ্যুতি-বিভাসিত রত্ন-সিংহাসনে কোন্ দেবতার অভিষেক করিব?

শুধু মতবাদের যুদ্ধের কোনও মূল্য নাই—যদি তাহা আমাদের অন্তরের সত্য-ধারা পরিস্ফুট করিবার যত্ন না পায়। আমাদের মত—আমাদের বাসনা তাহার পিছনে যদি কিছু না থাকে, তবে মনুষ্যজীবন অর্থহীন ঘটনাস্তূপে পরিণত হইবে, এবং বাহিরের যাহা কিছু, তাহা আপনার মুহূর্ত্তের কার্য্য শেষ করিয়া নিশ্চিহ্ন হইবে। আজিকার যুগসন্ধিক্ষণে ইউরোপের একান্ত স্থূল সভ্যতার মৃত্যুডঙ্কা বাজিয়াছে—মানবের আত্মা সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া শ্মশানকাষ্ঠে তাহার সৎকার দেখিতেছে—এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনার উপশম করিতেছে। সত্যযুগের নবপ্রভাতে সামঞ্জস্যের মঙ্গল-রাগিণী ধ্বনিত হইবে। বাহিরের যে উপায় অবলম্বন করিব, তাহার উপর ততখানি নির্ভর করিয়া অন্তরের সত্য-ধারাটী যদি না ধরি, তাহা হইলে সবখানি পণ্ড হইতে পারে।

চতুর্দ্দিকে ধ্বংসস্তূপের উপর রুদ্রের উল্লাস-নৃত্যের পদচিহ্ন লক্ষিত হয়। ইহার ফলে অনেক মিথ্যা ধরা পড়িয়াছে, এবং মানুষের প্রাণে উন্নত-জীবন-লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে; মুক্তি এবং ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিবার বলবতী ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ তিনটীর উপর নির্ভর করিতেছে—প্রথমতঃ, মুক্তি এবং ঐক্য স্পষ্ট করিয়া বুঝিব; দ্বিতীয়তঃ, জীবনে অকপটভাবে ইহার প্রতিষ্ঠা করিব; তৃতীয়তঃ, অন্তরের অন্তরদেশে ইহা উপলব্ধি করিব। ভবিষ্যতের সমস্ত নির্ম্মাণ এই আত্মোপলব্ধির তারতম্যের উপর নির্ভর করিবে। বাহিরের দিক দিয়া মানব জাতির যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, তাহা কোনও দিন সফল হইতে পারে না, পরস্পরের অন্তরের মধ্যে মিলনের রাগিণী যদি না খুঁজিয়া পাওয়া যায়। নিজের সুবিধার উপর ষোল আনা লোলুপ দৃষ্টি রাখিয়া শুধু বাহিরের শাসনতন্ত্র নির্ম্মাণ করিলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে বিপ্লব এবং এনার্কি। বাহিরের নিয়ম কানুনই বল, আর শাসনতন্ত্রই বল, তাহা কোনও দিন মানুষকে সংসারমুক্ত করিয়া পূর্ণ জীবন দিবে না—আমরা পরিপূর্ণতার মধ্যেও রুদ্ধ বেদনা চাই না; তাই ভবিষ্যৎকে শান্তিপূর্ণ নিরাপদ করিতে হইলে মানুষকে অন্তর হইতেই অন্তরতম পুরুষকে উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং অন্তরের দৈব ঐশ্বর্য্য দিয়া বাহিরের সম্পদ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সমাপ্ত।

শ্রীহারাধন বক্সী।

# দ্বিতীয় পক্ষ।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

'হাঁ রে ভব!'

'কেন গা ছোড় দি?'

'আজ কাল কি সে সব কথা ভুলে গেছিস?'

'কি সব?'

'সেই সব গান—যাত্রার বক্তিমে।'

ভব হাসিয়া বলিল, 'সে সব এখনও তোমার মনে আছে ছোড় দি?'

ছোট বৌ বলিল, 'মনে নাই? তুই বলিস কি রে, তোর বক্তিমে শুনে ছ' জায়ে যে হেসে গড়াগড়ি দিয়েছি।'

গম্ভীরমুখে ভব বলিল, 'এখন কিন্তু তোমাকে একা হাসতে হবে, তা জান?'

ছোট বৌ একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'সেই ভয়েই বুঝি আজ কাল চুপ ক'রে আছিস?'

'কতকটা তাই বটে' বলিয়া ভব মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। ছোট বৌ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ম্লানহাস্যসহকারে বলিল, 'তা হোক, তুই একবার বক্তিমে কর্, নতুন বোয়ের শুনতে সাধ গিয়েছে!'

ঈষৎ হাসিয়া ভব বলিল, 'সত্যি নাকি?'

ছোট বৌ বলিল, 'আমি কি মিছে বলছি রে? আমার কাছে শুনে ওর বড্ড শুনতে ইচ্ছে হ'য়েছে।'

বলিয়া সে অদূরে দণ্ডায়মানা মাতঙ্গিনীর দিকে সহাস্যে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। ভব বলিল, 'আচ্ছা, সন্ধ্যার পর শোনাব।'

ছোট বৌ বলিল, 'সন্ধ্যার পর কেন, এখনই একটু বল্ না।'

ভব মৃদু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া ঈষৎ নাকি সুরে বলিতে আরম্ভ করিল,—'সখি রে, প্রাণকান্তের অদর্শনে পঞ্চশর পঞ্চশরের আঘাতে আমার হৃদয়-কমলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে, দুরন্ত বসন্তে বিরহের অনলে আমার তাপিত প্রাণ দাবানলে দগ্ধ হচ্ছে—'

ছোট বৌ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং মাতঙ্গিনীকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, 'শুনছিস নতুন বৌ?'

মাতঙ্গিনী হাসিল না, কোনও কথাও বলিল না। ভব তাহার দিকে উৎফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উৎসাহসহকারে বলিতে লাগিল—'ঐ দেখ সখি, সুবিমল শশধরের বিমল কিরণে আমোদিনী কুমুদিনী প্রফুল্লবদনে কুমুদিনীকান্তের সহিত প্রেমালাপে নিমগ্ন হ'য়েছে, আর আমার হৃদয়নলিনী প্রাণনাথ-রূপ দিননাথের বিরহে বিমলিনী হ'য়ে—'

'ও কি, চলে যাস্ যে নতুন বৌ?'

মাতঙ্গিনী নিরুত্তরে ভবতারণের দিকে একটা সকোপ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। ছোট বৌ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভবতারণ অর্দ্ধসমাপ্ত বক্তৃতা শেষ না করিয়াই স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। ছোট বৌ একটু লজ্জিতভাবে বলিল, 'ওর রকমই ঐ। কখন্ যে কি মেজাজে থাকে, বলা যায় না।'

ম্লান হাসি হাসিয়া ভব বলিল, 'সে কথা ঠিক ছোড় দি।'

ছোট বৌ বলিল, 'তা যাক্, তুই আমাকে শোনা।'

'এখন থাক্' বলিয়া ভবতারণ কোঁচাটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে সেখান হইতে চলিয়া আসিল। মাতঙ্গিনীর উপেক্ষাটা তাহাকে এমনই লজ্জার কশাঘাত করিয়াছিল যে, সে আর ছোট বোয়ের সম্মুখে পর্য্যন্ত থাকিতে পারিল না। কেবল ভবতারণ নহে, ছোট বৌ পর্য্যন্ত যেন অনেকটা লজ্জা অনুভব করিয়াছিল। যাহাকে শোনাইবার জন্য সে এতটা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, সে যে এমন আকস্মিকভাবে চলিয়া গিয়া তাহার মাত্রাটাকে নিষ্ফল করিয়া দিল। ইহাতে মাতঙ্গিনীর উপর তাহার কতকটা রাগও যে না হইল, এমন নহে। সে স্থির করিল, এমন অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়েটার সঙ্গে আর কথা পর্য্যন্ত কহিবে না।

মাতঙ্গিনীরও যে রাগ হয় নাই, তাহা নহে। সে ছোট বৌ ও ভব দুই জনের উপরেই খুব রাগিয়া উঠিয়াছিল। সে না হয় ভবর গান বা বক্তৃতা শুনিবার জন্য দিদির কাছে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু ভবর কাছে সেই কথাটা প্রকাশ করা দিদির কি উচিত হইয়াছে? আর, সে শুনিতে চাহিয়াছে বলিয়াই ভব যে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার আগ্রহপূরণে উদ্যত হইবে, ইহাই বা কেমন কথা! সে যদি আকাশের চাঁদ ধরিতে চায়? চাহিলেই কি তাহার জন্য চাঁদ ধরিতে হইবে? কেন, সে কে? তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য উহার এত আগ্রহ কেন? ভবতারিণের এই অস্বাভাবিক আগ্রহটা মাতঙ্গিনীর যেন নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়াই মনে হইল। ইহার উপর সে যখন দেখিল যে, তাহার প্রসন্নতা-

টুকু লক্ষ্য করিবার জন্যই ভব উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, তখন সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। যেন নিতান্ত বিরক্তির সহিত সে স্থান ত্যাগ করিল।

ঘরে আসিয়া মাতঙ্গিনী দেখিল, বিশ্বনাথ দিবানিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া হুঁকা কলিকা লইয়া বসিয়াছেন। মাতঙ্গিনী তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে নতুন বৌ?'

ঝঙ্কার দিয়া মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, 'চুলোয়।'

বিশ্বনাথ মুখের কাছ হইতে হুঁকাটা সরাইয়া হাঁ করিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। তীব্রকণ্ঠে মাতঙ্গিনী বলিল, 'কোথায় ছিলে, কেন গিয়েছিলে, কি কচ্চো, দিন রাত এত কৈফিয়ৎ দিতে আমি পারবো না।'

মৃদু হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, 'তুমি বড্ড রেগেছ নতুন বৌ, না?'

রাগে মুখ ঘুরাইয়া মাতঙ্গিনী বলিল, 'হাঁ, রেগেছি! রেগে তোমার কি কচ্চি বল তো?'

সহাস্যে বিশ্বনাথ বলিলেন, 'বুড়ো বামুনের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়চো।'

মাতঙ্গিনী দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া স্বামীর মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বিশ্বনাথ নিঃশব্দে তামাক টানিতে লাগিলেন। মাতঙ্গিনী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থানোদ্যত হইল। বিশ্বনাথ বলিলেন, 'পান একটা দিতে পার?'

'পারি' বলিয়া মাতঙ্গিনী দ্রুতপদে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। বিশ্বনাথ ঈষৎ-উচ্চ-কণ্ঠে বলিলেন, 'চূণ খয়ের বেশ সমান দিয়ে পান সাজবে। ভাত খাবার পর যে পানটা দিয়েছিলে—'

একটু জোর গলায় মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'সেটা কি খারাপ হ'য়েছিল?'

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন, 'খুব ভাল হয় নি। চূণ একটু বেশী হ'য়েছিল। গালটা পুড়ে গিয়েছে।'

মাতঙ্গিনী রাগে পানের বাটার ঝন্ ঝন্ শব্দ করিতে করিতে পান সাজিতে লাগিল, এবং একটা পান সাজিয়া আনিয়া স্বামীর সম্মুখে ধরিল। বিশ্বনাথ পান লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বেশী চূণ হয় নি তো?'

কঠোরস্বরে মাতঙ্গিনী বলিল, 'আমি খেয়ে দেখি নি।'

বিশ্বনাথ বলিলেন, 'সে কিন্তু চমৎকার পান সাজতো। সেও তো খেয়ে দেখতো না, অথচ—'

মাতঙ্গিনীর রোষস্ফীত মুখের দিকে চাহিয়াই বিশ্বনাথ থামিয়া গেলেন। মাতঙ্গিনী পানটা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জোরে জোরে পা ফেলিতে ফেলিতে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। নিজের উক্তিতে নিজে লজ্জা অনুভব করিয়া বিশ্বনাথ স্তব্ধভাবে হুঁকা হাতে বসিয়া রহিলেন।

এমন সময় শ্রীপতি ডাকিল, 'দাদা!'

বিশ্বনাথ মুখের কাছে হুঁকা ধরিয়া ফিরিয়া চাহিলেন।

শ্রীপতি বলিল, 'নীলু ঘোষের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করলে হয় না, দাদা?'

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিসের বন্দোবস্ত?'

'দেনার।'

'দেনা আছে, সুদ আসল দিতে হবে; না দিতে পারি, জমী জায়গা বেচে আদায় করবে। তার আবার বন্দোবস্তটা কি শুনি?'

'জমী জায়গা বেচে নেবে, সেটা কি দেখতে শুনতে ভাল?'

'দেখতে শুনতে ভাল কোন্‌টা?'

'নালিস দরবার হ'লে লোক-হাসাহাসি হবে। তার চাইতে একটা রফা-নিষ্পত্তি করলে ভাল হয় না?'

'খুব ভাল হয়। কিন্তু রফা-নিষ্পত্তিটা কি রকমে হবে? নীলু কি পাওনা ছেড়ে দেবে?'

'পাওনা কি কেউ কখনও ছাড়ে? তবে—'

'তবে আমি সুদ আসল সব ফেলে দিলেই মিটে যায়, এই তো?'

জ্যেষ্ঠের বিরক্তিপূর্ণ উক্তিতে শ্রীপতি মনে মনে বিরক্ত হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া বেশ নম্রভাবেই বলিল, 'তা হ'লে তো সকল গোল চুকে যায় দাদা, কিন্তু সে উপায় তো নাই। কাজেই কতক টাকা দিয়ে একটা কিস্তীবন্দী করলে মন্দ হয় না।'

গম্ভীরভাবে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কতক টাকাটা কত, তাই খুলে বল।'

শ্রীপতি বলিল, 'অন্ততঃ এক শো।'

বিশ্বনাথ বলিলেন, 'এক শো টাকা আমি পাব কোথায়?'

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া শ্রীপতি চুপ করিয়া রহিল। রুক্ষস্বরে বিশ্বনাথ বলিলেন, 'তুমি বুঝি মনে কর, টাকা পুঁজি করে রেখে আমি দেনা দিচ্ছি না?'

শ্রীপতি এবার একটু রাগতভাবে বলিল, 'এমন মনে ক'রবার আমার কোনও দরকার নাই, দাদা।'

মুখ বিকৃত করিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, 'তবে দাদাকে শুধু উপদেশ দিয়ে বাহাদুরী নিতে এসেছ বুঝি ?'

শ্রীপতি বলিল, 'আমি ভাল কথাই বলতে এসেছি, দাদা। তোমার নামে নালিশ হ'লে তাতে আমার মাথা উঁচু হবে না।'

বিশ্বনাথ বলিলেন, 'নীচুও হবে না। কেন না 'ভিন্ন ভাতে বাপ পড়সী।'

'তা হ'লে আমার অন্যায় হয়েছে দাদা।' বলিয়া শ্রীপতি উঠিয়া গেল। বিশ্বনাথ তাহার দিকে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাতের হুঁকায় জোরে একটা টান দিলেন। কিন্তু কলিকার আগুন ও তামাক উভয়ই তখন নিঃশেষ হইয়াছিল, সুতরাং ধূম বাহির না হওয়ায় বিশ্বনাথ বিরক্তভাবে হুঁকাটা রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন, এবং গামছা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন।

হঠাৎ মাতঙ্গিনী ঝড়ের মত সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন আবার কোথায় যাচ্ছো ?'

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন, 'বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।'

'বাইরে গিয়ে কি হবে ?'

'এখানে বসেই বা হবে কি ?'

'ঠাকুরপোর সঙ্গে এতক্ষণ ঝগড়া করলে, আমার সঙ্গে খানিকটা ঝগড়া করবে না ?'

বিশ্বনাথ হাসিয়া উঠিলেন ; হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ঠাকুরপোর সঙ্গে ঝগড়া করেছি বলে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি ? তুমি হলে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।'

তীব্রকণ্ঠে মাতঙ্গিনী বলিল, 'শুধু বুড়ো নও, তোমার ভীমরথী হ'য়েছে।'

বিশ্বনাথ নীরবে মৃদু হাস্য করিলেন। মাতঙ্গিনী বলিল, 'ঠাকুরপো তোমাকে মন্দ কথা বলছিল কি ?'

বিশ্বনাথ বলিলেন, 'খুব ভাল কথাও নয়।'

মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, 'তোমার পক্ষে ভাল কথা নয় বটে, কিন্তু বুড়ো বয়সে দেনা ক'রে বিয়ে করেছ, সে দেনা কি শোধ করতে হবে না ?'

সহসা যেন তীব্র কশাঘাতে বিশ্বনাথের মুখের হাসি নিবিয়া গেল।

মাতঙ্গিনী বলিল, 'তুমি শোধ করতে না চাইলেও মহাজন তো ছেড়ে দেবে না; শেষে ঢোল বাজিয়ে ঘর ভিটে বেচে নেবে। তার চাইতে ঠাকুরপো যা বলছিল, সে রকম করলে ক্ষতি কি?'

ম্লানমুখে বিশ্বনাথ বলিলেন, 'ক্ষতি কিছু নাই, কিন্তু এক শো টাকা পাব কোথায়?'

মাত। ঘরের ঘটী বাটী বেচে যোগাড় কর।

বিশ্ব। ঘটী বাটী বেচলে পঁচিশটা টাকাও হবে না।

মাত। না হয়, আমার তো দু' একখানা গয়না আছে, তাই বেচে দেনা শোধ কর।

বিশ্ব। তার পর?

মাত। তার পর—পার আবার দেবে।

বিশ্ব। সে আর ঘটে উঠবে না নতুন বৌ।

মাত। না ঘটে, নাই ঘটবে। গয়নার তরে আমি তোমার কাছে কাঁদতে যাব না।

বিশ্ব। কিন্তু আমি—আমি বুড়ো বয়সে বিয়ে ক'রে তোমাকে পথে বসিয়ে যাব?

রোষতীব্রকণ্ঠে মাতঙ্গিনী বলিল, 'আর মহাজনে ঘর ভিটে বেচে নিলে আমাকে অট্টালিকায় বসাবে।'

বিশ্বনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মস্তক নত করিলেন।

মাতঙ্গিনী নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'গয়নাও তো ভারী! পেতলের মত দু'গাছা বালা, আর প্যাতপেতে তাবিজ্ঝ চুড়ী—আজ কাল কি আর রূপোর কদর আছে? আমার তো পরতেই লজ্জা করে।'

ম্লানমুখে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে বিশ্বনাথ বলিলেন, 'তবু অসময়ের সংস্থান। তুমি বুঝছো না নতুন বৌ, কাল যদি আমি চোখ বুঝি—'

বাধা দিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, 'আমিই যে কাল চোখ বুজবো না, এমন কোনও লেখাপড়া আছে?'

একটু ভাবিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। মোদ্দা, তোমার গয়না বেচে দেনা শোধ করতে পারবো না। লোকে কি বলবে?'

'গায়ে ধুলো দেবে!' বলিয়া মাতঙ্গিনী স্বামীর মুখের উপর তীব্র কটাক্ষ

নিক্ষেপ করিল। বিশ্বনাথ আর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীর-মন্থর-পদে বাহিরে চলিয়া গেলেন। মাতঙ্গিনী দাঁতে দাঁতে চাপিয়া খুঁটীটা জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফটিক আসিয়া ডাকিল, 'জেথি মা!'

মাতঙ্গিনী একবার তাহার দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। ফটিক এক পা এক পা করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া আবদারের সুরে বলিল, 'কি কাব জেথি মা?'

জেঠী মা কিন্তু তাহার আবদারে কর্ণপাত করিল না দেখিয়া ফটিক তাহার কাপড় চাপিয়া ধরিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, 'কি কাবো জেথি মা, কিদে পেয়েতে।'

বিরক্তি-সহকারে 'আচ্ছা' বলিয়া মাতঙ্গিনী তাহার হাত হইতে কাপড় ছাড়াইয়া লইল, এবং রান্নাঘরের দাবা হইতে কলসীটা তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে খিড়কীর দিকে চলিয়া গেল। জেঠীমার এই অস্বাভাবিক উপেক্ষায় ব্যথিত হইয়া ফটিক কাঁদিয়া উঠিলেও মাতঙ্গিনী ফিরিয়া চাহিল না।

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

# গায়ক পাখী—দয়েল।

দয়েল গায়ক পাখীগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাখী। ইহারা চড়ুই অপেক্ষা একটু বড়। বেশ মোটাসোটা গোলগাল গড়ন।

দয়েলের দেহের সমগ্র উপরিভাগ মিশ কালো। বুকের নীচের উপরের তৃতীয়াংশ কালো। নিম্নাংশ ধবধবে শাদা। লেজেরও উপর দিক কালো, তাহার দুই পার্শ্ব ও নিম্ন দিক শাদা। এই শাদা কালোর সংমিশ্রণে দয়েলকে বড়ই সুন্দর দেখায়। দয়েল লম্বে ৮।৯ ইঞ্চির বেশী হয় না। ইহার প্রত্যেক অঙ্গ দৃঢ়। দয়েলের ডানা দুটী ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা, মজবুত। ইহারা অনেকক্ষণ উড়িতে পারে। ডানার পালকগুলি কালো, এবং অতি সুন্দররূপে সাজান। উভয় ডানারই মধ্যস্থলে কয়েকটি শাদা পালক আছে। তাহাতে ঐ কালোর উপর প্রায় আধ ইঞ্চি স্থান শাদা দেখায়। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের দুই পাশে দুইটী আধ ইঞ্চি প্রস্থ শাদা রেখা থাকায় পাখীর সৌন্দর্য্য খুব

বাড়িয়াছে। পাখা বিস্তার করিয়া উড়িবার সময় শাদা স্থানটী প্রায় দেড় ইঞ্চি হয়। দয়েল অনেক সময় পুচ্ছ নাচায়, বিস্তৃত করে, এবং পরস্পরে যুদ্ধ করিবার সময় লেজ বিস্তৃত করিয়াই আক্রমণ করে। তখন লেজের উভয় দিকের শাদা পালকগুলি বড়ই সুন্দর দেখায়।

দয়েলের ঠোঁট আধ ইঞ্চি লম্বা, সরু ও তীক্ষ্ণ। ঠোঁটের প্রান্তদ্বয় সামান্য ধারাল। ঠোঁটের উপরে নাকের দুটী ছিদ্র। ঠোঁটের ভিতর দিক্‌টাও ঈষৎ কালো; কিন্তু জিহ্বা লাল। মুখের ভিতরটাও লালাভ। পাখীর জিভে একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। জিভের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, এবং পশ্চাদ্দিক দুই দিকেই একটু বিস্তৃত। দয়েলের গলা বেঁটে রকমের। পালকশূন্য কণ্ঠনালীর বেড় আধ ইঞ্চির বেশী নহে। দয়েলের পা দুটীও মেটে কালো, সরু, কিন্তু মজবুত। তিনটী আঙ্গুল সম্মুখভাগে, এবং একটী পিছন দিকে। প্রত্যেক আঙ্গুলে চারিটী পর্ব্ব আছে। এই জন্য ইহারা ডালে বসিতে পারে। প্রত্যেক আঙ্গুলের মাথায় ধানের মত বড় নখ আছে। নখগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ঈষৎ বাঁকানো।

দয়েল অনুচ্চ স্থানে, ঝোপে, গাছের ফাটালে বা কোটরে, বাঁশের সঙ্গে, কিংবা হাঁড়ির ভিতরে, বা দালানের ফাটালে বাসা তৈয়ার করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খড় কুটা, ঘাস পাতা ইত্যাদি দিয়া ইহারা বাসা প্রস্তুত করে। বাসার মধ্যস্থলটী গর্ত্তের মত করিয়া তৈয়ার করে। এইখানে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়িবার সময় হইলেই ইহাদের বাসা তৈয়ারের দরকার পড়ে। নতুবা 'যেন তেন প্রকারেণ' দিন গুজরান করাই পাখীর অভ্যাস। ঘর গৃহস্থালী সবই সন্তানের জন্য,—নহিলে পাখীর মত অনেক 'বুড়া বুড়ীই' এক রকম করিয়া দিন কাটাইয়া দিতে পারিত।

বর্ষাকাল পাখীর নিরানন্দের সময়। 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' মেঘদর্শনে নরনারীর বিরহব্যথা মাথা তুলিতে পারে, কিন্তু পাখীর তখন বড় দুর্দ্দিন। এ সময় তাহারা বিরহ-বিচ্ছেদের ভাবনা ভাবে না। 'খেয়ে দেয়ে জীয়ে থাকা'র মতন এ সময় পাখীরা বাদলের বারিধারা মাথায় বহন করে। প্রায় সকল গায়ক পাখীরই এ সময় 'ডাক পড়িয়া' যায়। অর্থাৎ, বর্ষাগমে ইহাদের গান বন্ধ হয়। প্রকৃতির ব্যবস্থা। আমি কিন্তু কোকিলের কুহুধ্বনি বার মাসই শুনিয়াছি। বর্ষাকালে কম—মাঝে মাঝে দুই একটা কোকিলের গান শোনা যায়। দয়েল তখন আদৌ গান করে না। দয়েল, ঘুঘু, ময়না, শ্যামা, অলিরাজ, বহুরাজ প্রভৃতির সঙ্গীতচর্চ্চা বর্ষার দুই মাস ও শরৎ কালেরও পুরা একটা মাস বন্ধ থাকে। শরতের শেষ অংশ হইতেই পাখীর আনন্দের

দিন আগে। (১) বর্ষায় ইহাদের পালক একটু বিশ্রী হইয়া যায়; শরৎ কালের শেষে ও হেমন্ত কালে পাখীমাত্রই 'পালক বদলায়'। পুরাতন জীর্ণ খোলস ফেলিয়া দিয়া ইহারা নূতন পালকে সজ্জিত হয়। এই সময় পাখীর বর্ণ খুব চক্‌চকে হয়। পাখীর মধুর সঙ্গীতে বনভূমি আনন্দময় হইয়া উঠে। বর্ষায় পাখীর ডাক বন্ধ হয়;—এই সময়ে তাহাদের 'গলা খুলিয়া' যায়। এই সময় পুং-পক্ষিগণের চাকচিক্যই বেশী বৃদ্ধি পায়। তাহারা যথাসম্ভব যত্নপূর্ব্বক আপনাদের দেহের প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন করে, এবং সময়ে অসময়ে সঙ্গীত জুড়িয়া দেয়। কেবল নারী ভুলাইবার জন্য এই সকল বন্দোবস্ত। স্ত্রী পক্ষী ইহাদের স্বর-লালিত্যে ও দৈহিক সৌন্দর্য্য দর্শনে আকৃষ্ট হয়। যে সকল পক্ষী আগে হইতেই 'যোড়া মিল' করিয়া বসবাস করিতেছে, তাহাদের বাসা বানাইবার ধুম পড়িয়া যায়। খড় কুটা, কোমল পালক, বিবিধ শুক্‌না পাতা দিয়া পাখীরা বাসা তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে। ভবিষ্যতে এইখানেই তাহাদিগকে ডিম পাড়িতে হইবে, তাই উপযোগী বাসা বানাইতে আরম্ভ করে। এই প্রচেষ্টা বিধাতার কি আশ্চর্য্য প্রেরণা! অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে কাক, চিল, শালিক প্রভৃতি পাখী বাসা তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে। দেশে প্রবাদ আছে, —কাক সর্ব্বাগ্রে বাসা বানায়। ইহা সত্য নহে। (২)

পাখীর উদরের নিম্নভাগে একটী তৈলকোষ আছে। এখানে পর্য্যাপ্ত-পরিমাণ তৈল আছে। পাখীর এই তৈলাধার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পাখী প্রয়োজন অনুসারে ঐ স্থানটী ঠোঁট দিয়া চাপিয়া তৈল বাহির করে, এবং সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া পাখী আপন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। এই তৈলকোষটীও 'দীনবন্ধু দাদার ভাণ্ড'—কলুবাড়ী ফরমাইস না দিয়াও ইহা সতত পূর্ণ থাকে। শীতের সময় তৈল বেশী না দিলে মানুষেরই চলে না—সুতরাং পাখীর কি করিয়া চলিবে? পাখীরা শীতের সময় বেশী করিয়া তেল মাখে, এবং স্নান করে। কখনও কখনও ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়া ইহারা আনন্দ করে। এই 'ধূলট' শুধু আনন্দের জন্য নহে।

---

(১) অনেক দিন আগে আমার বিশ্বাস ছিল, শীতকালে পাখীরা শ্রীহীন হইয়া যায়, কিন্তু সে ধারণা পরে সংশোধন করিয়াছি। প্রয়োজনবোধে এ কথা এই স্থলে উল্লেখ করিলাম।

(২) 'বিহঙ্গমের কথা' প্রবন্ধে এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিব।

পাখীরা এই ধূলটে গায়ে সাবান মাখার কাজ সারিয়া লয়। গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উকুন হইলে ধূলটের বেশী দরকার হয়। তা ছাড়াও ধূলা মাটীতে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া পাখী নির্ম্মল জলে অনেকক্ষণ স্নান করে। ইহাতে শরীরের ময়লা কাটিয়া যায়।

স্ত্রী-দয়েল অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন, এমন কি, চৈত্র মাসেও গর্ভধারণ করিয়া থাকে। ইহারা আড়াই মাস তিন মাস গর্ভ ধারণ করে। একেবারে দুইটী হইতে চারিটী (পাঁচটীও কদাচিৎ) ডিম পাড়ে। ডিমগুলি নীলবর্ণ। দেশী কুলের চাইতে বড় নহে। গড়ন হাঁসের ডিমের মত। এক দিক একটু লম্বা, এবং সরু। ডিমের চোকলার ভিতর দিক নীলাভ শাদা। পাখী ১০।১৫ দিন ডিমে তা দিলে পর উদরসর্ব্বস্ব ছানা বাহির হয়। তা দেওয়ার কষ্ট অধিকাংশ সময় পক্ষিণীই সহ্য করে। স্বামী তখন তাহার আহার যোগাইতে যত্নের ত্রুটী করে না, এবং নিকটে থাকিয়া পাহারা দিয়া থাকে। ছানা হইলে স্বামী স্ত্রী ছানাগুলির আহার সংগ্রহ করে। পোকা, ফড়িং প্রভৃতিই ইহাদের খাদ্য।

প্রথম প্রথম ছানাগুলির গায়ে হলুদ বর্ণ অতি কোমল ও ক্ষুদ্র পালক থাকে। সেগুলি মূল্যবান ধুনিত তুলার চেয়েও হালকা। ক্রমে দিন যায়, এবং পালকের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। হলদে রঙ্গের ঠোঁটগুলি ক্রমে ছাইএর মত রঙ্গ হয়। অবশেষে স্বাভাবিক বর্ণে পরিণত হইয়া যায়। শৈশবে পাখীর ডানা দু'টি ক্ষুদ্র ও পালকশূন্য থাকে। ক্রমে কোমল লোম, এবং ক্রমশঃ পালক জন্মে। ৮।৯ দিন পর্য্যন্ত চক্ষু ফোটে না। চক্ষুর উপর শাদা একখানি পাতলা পর্দ্দা থাকে। মাতা পিতা আহার্য্য লইয়া আসিবামাত্র ছানাগুলি ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসী হাঁ করিয়া চিঁ চিঁ করিয়া ক্ষুধার পরিমাণ জানায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, মাতা পিতা এক একবার সংগৃহীত খাদ্য পর্য্যায়ক্রমে এক একটি সন্তানকে দিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করে।

প্রায় এক মাস বয়সে দয়েল ডানায় বল পায়, এবং বাসা হইতে মুখ বাড়াইয়া খাবার লয়। এ সময় কখনও কখনও পাখী বাসা হইতে পড়িয়া যায়। তখন পিতা মাতার দুঃখের সীমা থাকে না। দয়েল-মিথুন ভূপতিত শাবকটিকে পুনরায় বাসায় উঠাইবার জন্য বহু চেষ্টা করে। উভয়েই কাতরস্বরে চীৎকার করে। কিন্তু অনেক সময়ই ছানাটি বাজ, চিল, কাক প্রভৃতির উদরসাৎ হয়।

পাখীর শত্রু অনেক। ডিম হইতে উড়িবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অপর পাখী,

সাপ, নেউল প্রভৃতির ভয় থাকে। সুযোগ পাইলেই ঐ সকল শত্রু গিয়া ছানাগুলি খাইয়া ফেলে। ছানাগুলি উড়িতে শিখিলে কয়েক দিন পর্য্যন্ত মাতা পিতা ইহাদিগকে একডাল দুই ডাল করিয়া একই গাছে বেড়াইতে শিখায়। তার পর ডানার বলবৃদ্ধি হইলে একটু একটু করিয়া দূরে যাইতে অভ্যাস করে। এ সময় যাহাতে কোনও শিকারী পাখীর দৃষ্টিতে না পড়ে,সে জন্য প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করে। কখনও কখনও দেখা যায়, বিষধর সর্প পাখীর বাসায় গিয়া ধাড়ী বাচ্ছা সবগুলি শেষ করিয়া আরও শিকারের আশায় বাসার ভিতর বসিয়া থাকে। এই কার্য্যে কেউটে ও গোখরোই বেশী ওস্তাদ। অনেক সময় পাখীর ছানা আনিতে গিয়া মানুষও সাপের কামড়ে প্রাণ হারায়। আমারই এক জ্ঞাতি ঠাকুরদাদা টিয়া পাখীর ছানা পাড়িতে গিয়া একটি ৫৷৷০ হাত লম্বা কেউটে সাপ গলায় ধরিয়া বাহির করিয়াছিলেন। ভগবানের কৃপায় কেউটে তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই, তিনি নির্ভীকভাবে সেই মহাভুজঙ্গমের গলা টিপিয়া ধরিলেন। সাপ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিলেও তিনি তাহাকে ছাড়েন নাই। পরে অন্যের চেষ্টায় সাপের জীবলীলার শেষ হইয়াছিল।

শাবক উড়িতে সমর্থ হইলেই দয়েল নিশ্চিন্তচিত্তে আনন্দ করিবার অবসর পায়। তখন তাহার আয়েস করিবার প্রচুর সুযোগ ঘটে, আর মধুর সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করে। দয়েল সময় সময় এত সুন্দর গান করে যে, আত্মহারা হইয়া শুনিতে হয়। ইহারা অতি প্রত্যূষে জাগিয়াই গান আরম্ভ করিয়া দেয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহাদের গানের সময়। প্রথম রাত্রিতে দয়েলের গান শুনি নাই। শেষরাত্রে জ্যোৎস্না থাকিলে কখনও কখনও ইহারা গান করে। বিপন্ন না হইলে অন্ধকার রাত্রিতে কোনরূপ শব্দই করে না। ইহাদের সাধারণ আওয়াজ গলা ভাঙ্গা টেঁ চেঁ মাত্র।

দয়েল সহজে পোষ মানে,এবং তখন পূরা মাত্রায় জ্ঞাতি-হিংসক হয়। প্রতি-পালক অপর দয়েল দেখিবামাত্র খাঁচার দরজা খুলিয়া দেয়, আর পালিত দয়েল তীরবেগে গিয়া সেই জ্ঞাতির উপর অতর্কিতে পতিত হয়। তার পর লড়াই লাগিয়া যায়। পালিত দয়েল ধূর্ত্ত। সে দুই পায়ে জ্ঞাতির দুই পা ছাঁদিয়া ধরে, এবং উভয়ে একত্র টিপ করিয়া মাটীতে পড়িয়া যায়। তখন শিকারী ইহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। দয়েলের মাংস নাকি খুব তৈলাক্ত। এ দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এ সকল পাখী খায়। কাক ব্যতীত অনেক পাখীই জ্ঞাতিহিংসায় পটু।

শিকারীরা নিম্ন লিখিত উপায়ে দয়েল ধরিয়া থাকে।

( ১ ) পালিত পাখী দিয়া শিকার।

( ২ ) কাম্‌তি দিয়া শিকার।—৮৷১০ ইঞ্চি লম্বা একখানি সরু বাঁশের কাঠী। তাহার এক দিক ত্রিধা বিভক্ত তিন অংশেই কাঁঠালে আঠা মাখান থাকে। মধ্যের কাঠীতে একটি ফড়িং বা উই পোকা আটকাইয়া দেওয়া হয়। ঐ পোকা পাখা উড়াইয়া মুক্ত হইবার জন্য ধড়্‌ফড়্‌ করিতে থাকে। দয়েল, বুলবুল (১) প্রভৃতি ফড়িং খাইতে আইসে, এবং আঠায় পাখা জড়াইয়া ভূতলে পড়ে। কাম্‌তি দিয়া শিকারীরা ছোট পাখী বংশ ধ্বংস করিতেছে।

(৩) পাটশোলা দিয়া খাঁচা তৈয়ারী করিয়া তাহার এক দিকে এক ক্ষুদ্র দরজা রাখা হয়। ভিতরে একটা আরসুলা বা কোনও পোকা ঝুলাইয়া রাখা হয়। উহার সহিত এক খণ্ড বাখারী সংলগ্ন থাকে। বাখারীর মাথায় এক সুতার দরজা বাঁধা হয়। ভিতরের পোকায় পাখী ঠোকর দিবামাত্র বাখারী সোজা হইয়া দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে দরজাটি বন্ধ হয়, পাখী আটক পড়ে।

উষাগমে ও অপরাহ্ণেই দয়েলের সঙ্গীত সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট বোধ হয়। দয়েল আমাদের বাড়ীর আশে পাশেও বাসা করে। গভীর জঙ্গলে ইহাদের যাতায়াত যেন কম বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ শিকারী পাখীর অত্যাচারই ইহার কারণ। দেশ ক্রমশঃ আবাদ হইতেছে ; সঙ্গে সঙ্গে পাখীকুল নির্ম্মূল হইতেছে। ছেলেবেলায় আমরা যত অধিকসংখ্যক ও বিবিধ রকমের পাখী দেখিয়াছি, এখন তাহাদের সিকিও নাই। সুধু 'গায়ক' পাখী নয়, কাক, ফিঙ্গা, মাছরাঙ্গা, কাঠঠোকরা প্রভৃতি বহুজাতীয় পক্ষীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। (২) পাখী-রক্ষার কি কোনও উপায় হয় না ?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

# সংগ্রহ।

## 'সে কাল এ কাল'।

'সে কাল এ কাল'—শ্রীচন্দ্রশেখর কর প্রণীত। পয়ারে লিখিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা। মূল্য চারি আনা। কিন্তু গ্রন্থখানি দেশ-কাল-পাত্রের হিসাবে অমূল্য।

---

( ১ ) বুলবুল সম্বন্ধে 'প্রতিভা'য় লিখিয়াছি।

( ২ ) 'বনের বাউল' প্রবন্ধে আমরা কতিপয় 'অসঙ্গীতজ্ঞ' পাখীর সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

'সে কাল এ কালে'র রচনা সুন্দর। রচনার উদ্দেশ্য আরও সুন্দর। যে সম্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সজ্জয় কর মহাশয় সে কালের সহিত এ কালের তুলনা করিয়া সে কালের পবিত্র স্মৃতির উদ্বোধন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।

গ্রন্থের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকারের ছবি মনে পড়িতেছে। চন্দ্রশেখর বাবু এ কালের লোক, কিন্তু সে কালের ছাঁচে ঢালা। চন্দ্রশেখর কর নামে 'বাবু', কিন্তু মনে সেকেলে 'পণ্ডিত'। চন্দ্রশেখর বাবু এ কালের শিক্ষায় শিক্ষিত, কিন্তু সে কালের দীক্ষায় দীক্ষিত। তিনি ধর্ম্মভীরু, দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ, 'সেকেলে' হিন্দু। চন্দ্রশেখর বাবু হাকিম ছিলেন, কিন্তু চিরজীবন ধর্ম্মের, নীতির, শাস্ত্রের, সংস্কারের ও বাঙ্গালীর সামাজিক বিশ্বাসের 'হুকুম' মানিয়া আসিয়াছেন। সে কাল তাঁহাকে এ কালে জীবিত রাখিয়াছে। এ কালেও তাঁহার জীবনের, তাঁহার সাহিত্যের অবলম্বন—সে কালের সুখস্মৃতি। তিনি সে কালের ভাবে ভোর। এ কালে চন্দ্রশেখর করের—গ্রাজুয়েট্‌, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট চন্দ্রশেখর করের আবির্ভাব, এবং তাঁহার সে কালের ভাবে ভোরপুর সাহিত্যের অভ্যুদয় anomaly বলিয়াই মনে হয়। anomaly বটে, কিন্তু ঈশ্বরের দান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চন্দ্রশেখর বাবু সে কালের উকীল, নজীর, পৌরাণিক ও ব্যাখ্যাতা। এ সমাজে চন্দ্রশেখর বাবুর উপযোগিতাও আছে, আবশ্যকতাও আছে। আমাদের সৌভাগ্য, নবভাবপ্লাবিত বঙ্গে চন্দ্রশেখর বাবু স্রোতে ভাসিয়া যান নাই। বিলাসিনী বঙ্গভামিনীদিগের 'ড্রেসিং-টেবিলে' সজ্জিত এ কালের 'বিশুদ্ধ' টপ্পা-সাহিত্যের সঙ্গে রোজ-পমেড-পাউডারের পার্শ্বে চন্দ্রশেখরের 'অনাথ বালক' ঠাঁই পায় না বটে, কিন্তু আমাদের সমাজে তাহার স্থানাভাব হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। চন্দ্রশেখর বাবুর সাহিত্য বহুপ্রচারিত না হউক, তাহা বহুল-সমাদৃত বটে। তাহার বিস্তৃতি অল্প, কিন্তু প্রভাব গভীর। ইহাই স্বাভাবিক। খাসা মোণ্ডা বাতাসার মত বিকাইতে পারে না। তাহার কারণ সুস্পষ্ট। খাসা মোণ্ডার স্থান স্বতন্ত্র। মানুষ গুণের আদর করে, কিন্তু অনেক সময়ে 'চটকে'র আদর গুণের ভাগ্যে ঘটে না। ইহাতে গুণের লাঘব হয় না; গুণগ্রাহীর অল্পতাই সূচিত হয়। চন্দ্রশেখর বাবুর গ্রন্থাবলী—বাঙ্গালীর নিজস্ব রত্নমঞ্জুষা—বাঙ্গালা দেশে সেরূপ সার্ব্বজনীন সমাদর লাভ করে নাই, ইহাতে জাতির মানসিক দৈন্যই সূচিত হয়। ইহাও—এই ঔষধে বিতৃষ্ণা, এই পথ্যে বিরাগ, এই অমৃতে অরুচিও এ কালের লক্ষণ। এই জন্যই এ কালকে—নানাবিধ উন্নতির আশাপ্রদ আভাসের আভায় সমুজ্জ্বল এ কালকেও ভয় করিতে হয়। অন্ততঃ আমরা ভয় করি। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির অভ্যুদয়েই জাতির উপচয়। বাঙ্গালা সেই অভ্যুদয়ের অরুণাভায় উদ্ভাসিত—আশার কথা বটে। কিন্তু এই অভ্যুদয়ের ভিত্তি কি?

যে মনুষ্যত্ব জাতির ভিত্তি, সে মনুষ্যত্ব কি আমাদের বর্ত্তমান উন্নতির সহিত সমবেগে অগ্রসর হইতে পারিতেছে? অতীতের অবদান ও স্মৃতি জাতির নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস। সে অতীতের স্বরূপকে আমরা কি বর্ত্তমানের অবলম্বন করিয়াছি?

অতীতের সব ভাল, এবং বর্ত্তমানের সকলই মন্দ নহে। অতীতেও যুগ-ধর্ম্মের বিরোধী, অনুপযোগী, সুতরাং বর্জ্জনীয় বিষয়ের অভাব ছিল না। অতীতের পাপেই বর্ত্তমানের দুর্দ্দশা।

কিন্তু অতীতের পুণ্যেই বর্ত্তমানের জীবন ও সত্তা, তাহাও স্মরণীয়। অতীতকে অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমানের পারম্পর্য্য রক্ষিত হয়। পূর্ব্বপুরুষ অতীতের ভাব ও সংস্কারের আধার। আর, পূর্ব্বপুরুষের পরিণতিই উত্তর-পুরুষ। অতীতের উদ্বোধন জাতির উদ্বোধনের জন্যই আবশ্যক। বিজিত, পরতন্ত্র, দেশাত্মবোধহীন জাতির পক্ষে অতীতের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন কেবল আবশ্যক নয়, অপরিহার্য্য।

এই জন্য আমরা 'সে কাল এ কাল' নামক ষোল পৃষ্ঠার পুস্তিকার প্রসঙ্গে ষোল কাহন কথার অবতারণায় কুণ্ঠিত নহি। বাঙ্গালায় 'বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি' লইয়াই ত অনেকে কারবার করেন। যাহা 'হিতং মনোহারি চ', তাহার প্রচারের জন্য আমরা সেই মহাজন-পন্থার পথিক হইয়াছি।

'সে কাল এ কালে' বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ছবি আছে। সে কাল তাহার আলো; এ কাল তাহার ছায়া। আলোও সত্য, ছায়াও প্রত্যক্ষ। ছায়া বলিয়াই তাহা মায়া নহে। এ কাল সম্মুখে জাজ্বল্যমান। সে কাল তত্ত্বাব-ভাবুকের মনশ্চক্ষে দেদীপ্যমান। 'সে কাল ও এ কালে'র প্রণেতা সে কালের পক্ষপাতী; ভক্ত। বোধ করি, দুইটী বিশেষণই পর্য্যাপ্ত হইল না। তিনি সে কালের উপাসক। চন্দ্রশেখর এই নব্য বঙ্গে নবভাবপ্রবুদ্ধ নবপথের পথিক নব্য বাঙ্গালীর সমবায়ে ও রুচির-লীলা-বিহ্বল নবসাহিত্যে এক জন সেকাল-পন্থী। তিনি পয়ারে সে কালের জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। ইহাই স্বাভাবিক।

সে কাল পয়ারেই আপনার ছবি রাখিয়া গিয়াছে। ত্রিপদী, ত্রোটক প্রভৃতি পয়ারের সাহচর্য্য করিয়াছে। কিন্তু পয়ারই বাঙ্গালীর অনুরূপ। পয়ারই কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, ঘনরাম প্রভৃতির ভাবের বাহন। সে কালে পয়ারই বাঙ্গালীর মানস-ভাবের মুকুর ছিল। পয়ারই বাঙ্গালীর প্রতিবিম্ব ধরিয়া রাখিয়াছে। সেকাল-পন্থী চন্দ্রশেখরও সে কালের স্মরণে পয়ারকেই বাহন করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহাই স্বাভাবিক। এ কালের পয়ারে অরুচি সেকাল-পন্থীতে থাকিতে পারে না। আবার

'পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী,
বিশ্ব মাঝে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!'

এই অতুলনীয় ছন্দের ঝঙ্কারেও চন্দ্রশেখরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। যে ছন্দে কৃত্তিবাস কাশীদাস বাঙ্গালীকে মনের অমৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন, যে ছন্দে ঘনরাম লিখিয়াছিলেন,—

'ধুম্‌সীর ধমকেতে ধূলো উড়ে যায়',

এবং যে ছন্দে কবিকঙ্কণ লিখিয়াছিলেন—

'তুমি খাও ঘটে জল, আমি খাই ভাঁড়ে',

সেই ছন্দই চন্দ্রশেখর বাবু বাছিয়া লইয়াছেন। নব-যুগের অনেক বরেণ্য কবি এ ছন্দকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। প্রাচীন পয়ার নবীনের উপহাসে হাসিয়া থাকিবে, কিন্তু মরিয়া যায় নাই। জীবনীশক্তি ছিল, তাই বাঁচিয়া আছে, এবং নব-সাহিত্যেও আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মেঘদূতের মন্দাক্রান্তায় যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে, 'বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময়ী বেণী'তে পয়ার তাহারই কতকটা ধরিয়া রাখিয়াছে। নব্য বাঙ্গালার মহাকবির কাব্যে পয়ার উদাত্ত ভাবে জোর হইয়া ধ্বনিত করিয়াছে—

'মনে হয় সুখ অতি সহজ সরল।'

চন্দ্রশেখরের পয়ার সে পর্য্যায়ের আত্মবিস্মৃত ও বিবর্ত্তিত পয়ার নহে। তাহা বাঙ্গালীর জীবন-কথার অত্যন্ত 'সেকেলে' পয়ার। আমাদের মনে হয়, এই জন্যই চন্দ্রশেখরের পয়ার সে কালের স্মরণে এত উপযোগী হইয়াছে।

এক জন সমালোচক চন্দ্রশেখরের এই পয়ার পড়িয়া বলিয়াছেন—'কৃত্তিবাসকে মনে পড়ে।' প্রশংসা বটে, কিন্তু ভিত্তিহীন। কৃত্তিবাস প্রধানতঃ পয়ারে রামায়ণ গান করিয়া পয়ারকে ও বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু পরে তাঁহার পরবর্ত্তী কবিকঙ্কণের কাব্যে তাঁহার পয়ারেরও বিবর্ত্ত হইয়াছিল। কৃত্তিবাসে যাহার উন্মেষ, ভারতচন্দ্রে তাহার বিকাশ। কৃত্তিবাসের পয়ার ছন্দঃশাস্ত্রের নিগড়ে সর্ব্বত্র নিয়মিত নহে। তাহা কতকটা আদিম, সুতরাং আদিমতার চিহ্ন-বর্জ্জিত নহে। চন্দ্রশেখরের পয়ার কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী কবি-গণের পয়ারের মত বিষয়ানুগত; তাহাতে স্বৈরাচার নাই। যাঁহারা সে কালের ভক্ত, চন্দ্র-শেখরের পয়ার তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারিবে।

চন্দ্রশেখর বাবু সে কালের বড় কথার সহিত ছোট কথাও স্মরণ করিয়াছেন। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে ম্যালেরিয়া-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া এক শ্রেণীর উপহাস উপহার পাইয়াছিলেন; চন্দ্রশেখরের 'সে কাল এ কাল' তাঁহাদিগকে নাসিকা-কুঞ্চনের অবকাশ দিবে। ইহাও আমরা লাভ বলিয়া মনে করি। দেশ ম্যালেরিয়ায় মুমূর্ষু, এবং দিব্য-চক্ষে দেখিয়েছি, সাহিত্যেও ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ বর্ত্তমান। কিন্তু এই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত সাহিত্যেও ম্যালেরিয়ার উল্লেখ করিবার উপায় নাই! সে সাহিত্যে সর্ব্বত্র জোছনা, চাঁদিনী, পীরিতি, স্মিরিতি, কিন্তু তাহার ধাতু-প্রকৃতি ম্যালেরিয়ার বিষে জর্জ্জরিত। সে সাহিত্য কঙ্কাল-সার, জীবনীশক্তিশূন্য। ম্যালেরিয়ার জীর্ণ দেশের সাহিত্যেও কারণগুণে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অবশ্যম্ভাবী। তথাপি সে সাহিত্যে যদি কেহ সিন্‌কোনার চাষ করে, নব্যবাঙ্গালী তাহাকে উপহাস করে। ইহাও এ কালের ধর্ম্ম। কিন্তু যাঁহারা দেশের কল্যাণ-কামনায় সে উপহাসকে শিরোধার্য্য করেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য।

'সে কাল এ কাল' প্রাচীন যুগের 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্' এই লক্ষণে উপেত মহাকাব্য নহে; খণ্ডকাব্যও নহে। ইহা পয়ারে রচিত, সুকৌশলে কথিত 'তথ্যবিবৃতি'। সে তথ্য বাঙ্গালীর অবশ্যজ্ঞাতব্য। তাহা বার বার বাঙ্গালীকে শুনাইলে ভাল হয়। গদ্যে, পদ্যে, যেমন ভাবে ও ভাষায় হউক, আমরা বাঙ্গালীকে তাহা শুনাইতে চাহি। চন্দ্রশেখর বাবু তাহাই করিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে গ্রাম্য কবিরা পয়ারে এইরূপ অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেন। চন্দ্রশেখর বাবু সেই পথের পথিক হইয়াছেন। কবিত্বের বিভায় বঙ্গ বিভাসিত করিবার জন্য 'সে কাল এ কালে'র সৃষ্টি হয় নাই। দরদী গ্রন্থকার সে কালের মামুলী প্রথায় বাঙ্গালীর শোচনীয় অবস্থাটা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এই পুস্তিকায় 'আদ্যন্তে চ মধ্যে চ' তাহার প্রমাণ সুস্পষ্ট।

'সে কাল এ কালে' যদি কেহ কমলবিলাসী কবির কমনীয় কবিতার বা মেঘদূতের মেঘ-

মন্ত্রের আশা করেন, নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন। সে কালের পাঁচালীকার কবিরা এক ক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেন, চন্দ্রশেখর বাবুও সেই পথে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্ত পয়ারের রেখাপাতে এই ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

আমাদের সাহিত্য বড় বড় কথায় পূর্ণ। কিন্তু সমাজে ছোট ছোট কথারও প্রয়োজন আছে। আপাততঃ আমাদের বড় বড় কথার শ্রীধর কথকেরা যাহাকে অত্যন্ত ছোট মনে করিয়া উপেক্ষা করিতেছেন, তাহা অনেক বড় কথা অপেক্ষাও বড়, ইহা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে। সে সকল কথা অত্যন্ত ছোট বটে, কিন্তু তাহার সমষ্টিতেই জাতির ব্যষ্টি গঠিত হয়। আর সেই ব্যষ্টির সমষ্টিই জাতি, ইহা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই। ছায়ার ঢাকা পাখীডাকা পল্লীবাটে গীতিকবিতার ঝঙ্কার আছে, কিন্তু পল্লীর দারিদ্র্য সুকোমল গীতি-কাব্য নহে, কঠোর 'ট্রাজিডী'। শুধু 'সোনার বাঙ্গালা'ই কবিত্বের একমাত্র উপজীব্য বা উদ্দীপক নহে। তাহাতে তথ্যেরও অধিকার আছে। আমরা তাহা ভুলিয়া যাইতেছি। চন্দ্রশেখর—ঔপন্যাসিক চন্দ্রশেখর তাহা বিস্মৃত হন নাই। তিনি উপন্যাসে, প্রবন্ধে, এবং সেকেলে পয়ারে বাঙ্গালীকে তাহা স্মরণ করিবার জন্ত উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। 'সে কাল এ কাল' তাঁহার এই ব্রতের অন্যতম উপকরণ—'কুচো-নৈবেদ্য।' 'সে কাল এ কালে' যাহা বিবৃত হইয়াছে, চন্দ্রশেখরের সাহিত্য-সৃষ্টির তাহাই প্রাণ। 'সে কাল এ কাল' সেই ভাব-প্রবাহের একটী ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি, কিন্তু উপেক্ষণীয় নহে।

(১) 'সে কালের পল্লীবাসী খেত দুধ ভাত,
অনেকে দুবেলা এবে পাতে না'ক পাত।'—সে কাল এ কাল; ৭ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালার কোনও কাব্যপ্রকাশে কোনও অলঙ্কারের উদাহরণস্বরূপ উদাহৃত না হউক, উদ্ধৃত দুই পংক্তির যুগল তথ্য অত্যন্ত সত্য। সে কালের সহিত এ কালের এই অসাদৃশ্যটুকু পয়ারের ভাষায় পল্লীবাসীর মনে যদি মুদ্রিত হইয়া যায়, তাহা হইলে জাতির লাভ আছে। সে কালের সহজলভ্য দুধ-ভাত কোথায় গেল? কেন গেল? এ কালে যাহারা দু'বেলা পাত পাতিতে পায় না, তাহাদের দুর্ভাগ্যের কারণ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসাই জাতীয়-মুক্তির জননী।

(২) 'বেচিত না ভদ্রলোক বাগানের ফল,
খেত, আর বিলাইত দরিদ্রে সকল।
এবে যদি কেহ কারো পাড়ে দুটী কুল,
চোর বলি ধরি দিয়া করে হুলস্থূল!'

ইহাও অত্যন্ত সত্য। যে বাঙ্গালী বাগানের ফল লুটাইয়া দিত, সেই বাঙ্গালী কেন কুল চুরী করে, সেই বাঙ্গালী কেন কুল-চোরকে জেলে পাঠায়? এ প্রশ্ন উচ্চ-সাহিত্যের অঙ্গ না হইতে পারে, বাঙ্গালার খাস বিশ্বসাহিত্যেও তাহার স্থান না থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এ প্রশ্নের যথেষ্ট অবকাশ আছে, ইহা ত অস্বীকার করিতে পারি না।

'সে কাল এ কাল' বর্ত্তমান যুগের পাঁচালী। পাঁচালী সর্ব্বসাধারণের সাহিত্য; সৌখীন সাহিত্য নহে। যাহা সৌখীন নয়, তাহাই যদি সাহিত্য না হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার।

(৩) 'জলো দুধ খেয়ে মলো শিশু ছেলে যত,
সাজ পোষাকের ব্যয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত।'

শিশু 'জলো' দুধ খাইয়া সত্যই মরে, অথচ সাজ-পোষাকের ব্যয়ে গৃহস্থের প্রাণ ওষ্ঠাগত,— সমাজগত এই দারুণ দুর্দ্দশা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ উক্তি কবিত্ব নয়, সহজ, সরল, খাঁটী সত্য। এই সত্য, এই পরস্পর-বিরোধী দুইটী সত্যকে এক সূত্রে গাঁথিয়া 'সে কাল এ কালে'র রাঁধনদার আমাদের বুদ্ধির উপর যে কটাক্ষ করিয়াছেন, আশা করি, আমরা তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া লাভবান হইতে পারিব।

'সে কালের মুচী শুচি শ্রীকৃষ্ণে ভজিলে,
এ কালে মেথর মান্য পয়সা থাকিলে।'—১৩ পৃষ্ঠা।

ইহা রস-রচনায় Epigramatic; সে কালের সহিত এ কালের সমস্ত সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট প্রভেদের হস্তামলক। 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি' যে দেশের উপদেশ, সে দেশে 'পতিত জাতির উদ্ধার' করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইতেছে, ইহা সত্যই শোচনীয়। কিন্তু কাঞ্চনকৌলীন্য যে দরিদ্র মহাকুলীনকেও পতিত করিতেছে, সমৃদ্ধ অকুলীনকে কুলীন করিতেছে! মুচী শ্রীকৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম, যাহাকেই হউক, এক জনকে ভজুক, শুচি হউক, তাহাকে মাথায় করিয়া রাখিব। কিন্তু 'অখণ্ডমণ্ডলাকার' স্বর্ণ-রজত সঞ্চয় করিয়া যে সকল মুচী কোনও দেবতাকে না ভজিয়াই সমাজে সিংহ হইয়া হুঙ্কারে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে, তাহাদের ক্রীতদাস হইয়া আমরা কি এ কালের সাম্যের গৌরব উজ্জ্বল করিতেছি? সে কাল যতই মন্দ হউক, তাহার অচল-আয়তনে 'ম্যামনে'র প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেকেলে লোক এমন একনিষ্ঠভাবে তাহার উপাসনা করিত না।

'পূজা বিনা উপবাসী পৈতৃক ঠাকুর,
রুটী মাংস খায় সুখে পালিত কুকুর।'—১৫ পৃষ্ঠা।

কি মর্ম্মান্তিক! ইহাও অত্যুক্তি নহে। কঠোর সত্য। এক দিনের কথা মনে হইতেছে। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে কোনও মাসিকপত্রের কার্য্যালয়ে বসিয়া নবীন সম্পাদকের সঙ্গে গল্প করিতেছি। এক জন ঔপন্যাসিক—তিনি এখন বঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ—সেই গরীবখানায় উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে একটী খেঁকী কুকুর। আমাদের স্বদেশী কুকুর—'কালো কুচ্‌কুচে' রঙ্গ; বেশ হৃষ্টপুষ্ট। কিন্তু খেঁকী কুকুর! প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিকের পোষা, পেয়ারের কুকুর—দেশী ও খেঁকী! বিলাতী টেরিয়ার নহে, কলী নহে, শেফার্ড নহে, বুল নহে, স্প্যানিয়াল নহে, গ্রেহাউণ্ড নহে, জাপানী পুডুল নহে, চীনের চাউ নহে। এমন কি, নেপালের—ভুটানের ঝাঁকড়া-লোমওয়ালা 'কুত্তা'ও নহে। খাঁটী স্বদেশী খেঁকী কুকুর! শুধু কবির—'বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' মনে পড়িল। শুনিলাম, কুকুরটী মানুষের ভাড়া দিয়া সুদূর সাগরপারে গিয়াছিল, আবার প্রভুর সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে এইরূপ যাতায়াত করে? শুনিলাম, সে প্রত্যহ দু'টাকার খাবার খায়; সন্দেশ, রসগোল্লা, গজা, খাজা; আবার চপ, কাট্‌লেট, কোপ্তা ইত্যাদিতেও তাহার অরুচি নাই। মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিলাম। নীতিশাস্ত্রে পড়িয়াছিলাম, কাহাকেও হিংসা করিতে নাই। 'বুকে হাত দিয়া' বলিতে পারি, তখন সেই প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিকের সৌভাগ্যশালী কুকুরকে ঘুণাক্ষরেও হিংসা করি নাই।

তাহার পর সারমেয়-স্বামী খরাৎ করিয়া টেবিলের উপর একটা টাকা ফেলিয়া দিলেন।

সন্নিহিত হোটেল হইতে চপ্, কাট্‌লেট্ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই খেঁকী কুকুর নীরবে নিশ্চিন্তচিত্তে এক টাকার চপ্ কাট্‌লেট্ উদরস্থ করিল। আনন্দে একবারও লাঙ্গুল নাড়িল না। বুঝিলাম, এইরূপ ভোজেই সে অভ্যস্ত। তখন—তখন ত্রিকলাকাথ-বিনিন্দী চা পান করিতে করিতে সেই ভাগ্যবান কুকুরকে একটু হিংসা করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

কুকুরের চপ্-ভক্ষণ দেখিতে দেখিতে শুনিতেছিলাম, নিম্নে, রাজপথে কে কাতরকণ্ঠে হাঁকিতেছে—'দুঃখী কাণাকে একটী পয়সা দাও বাবা—দুঃখী কাণা—' ভাবিলাম সে দুঃখী, অন্ধ, ভিখারী বটে, কিন্তু কোনও সৌখীন প্রভুর কুকুর নহে। সে কাহারও পালিত ও প্রিয় নহে সে শুধু দুঃখী, অন্ধ, ভিখারী। মানব-সমাজে এমন বিড়ম্বনার সংখ্যা হয় না। এ বিড়ম্বনা সার্ব্বভৌমিক। ইহা নিশ্চয়ই বঙ্গের নিজস্ব বা বাঙ্গালীর একচেটে নহে। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় কুকুরেরও পেট ভরিত; ভিখারীও উপবাসী থাকিত না। পৈতৃক ঠাকুরের কথা আর না তুলিলেও চলে। অতএব, উল্লিখিত শ্লোকটী কবির কল্পনা বা পাঁচালীর জল্পনা নহে; খাঁটী সত্য, ধ্রুব সত্য, দ্বিজেন্দ্র বাবুর ভাষায় সার-সত্য, এবং আমার চাক্ষুষ সত্য। 'সেকেলে' চন্দ্রশেখর বাবু এই সত্য epirgramatic ভাষায় পয়ারে ব্যক্ত করিয়াছেন।

'সে কাল এ কালে' পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহার পরিচয় আছে। তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া পরে যাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারও পরিচয় আছে। পল্লবিত ও পুষ্পিত ভাষায় কোমল-কান্ত পদাবলীতে কবিত্বের সৌরভ মাখাইয়া সে তালিকা রচিত হয় নাই সত্য, তাহা নবগীতিকাব্যের ধারা, রস ও রীতির অনুগামী নহে, তাহাও সত্য। কিন্তু তাহাতে বৈশিষ্ট্য আছে। সে বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা স্মৃতির উদ্দীপক, পৃচ্ছার প্রবর্ত্তক, চিন্তার জনক। তাহাতে রচয়িতার সহৃদয়তা ও জাতির প্রতি মমতার পরিচয় আছে। বৃন্তের উপর যেমন ফুল ফুটিয়া থাকে, 'সে কাল এ কালে'র শ্লোকের বৃন্তেও তেমনই চিন্তাশীল ভাবুকের মনোরম ভাবনায় ফুল ফুটিয়া আছে। সে ফুলে মার পূজা চলিতে পারে। কবিত্বের যদি ঈশ্বর ভিন্ন অন্য অবলম্বন না থাকে, তাহা হইলে কবিত্ব কখনও এই সকল মর্ম্মান্তিক ও সাংঘাতিক তথ্যের আশ্রয় হইতে পারিবে না। কিন্তু যাহা আবশ্যক, সুষমাসৌরভে হীন হইলেও তাহা বরণীয়। 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।' কিন্তু সে কালের স্মরণ, এ কালের সহিত তাহার তুলনায় সমালোচন 'হিত'ও বটে, এবং দেশের কথা, মর্ম্মের কথা বলিয়া 'মনোহারী'ও বটে। 'সেকেলে' চন্দ্রশেখর বাঙ্গালীকে এই সকল কথা ভাবিবার অবকাশ দিয়া ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। সমাজের সকল স্তরের জন্যই সাহিত্য চাই। 'অনাথ বালকে'র রচয়িতা পাঁচালীছন্দে দেশের কথা গাইয়া দেশী লোক-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। সোনার তরীর সহিত এই দেশী তাল-কাঠের ডোঙ্গা যদি বাঙ্গালীর ঘাটে লাগে, তাহা হইলে, বিশ্বসাহিত্য না হউক, বাঙ্গালী কল্যাণ লাভ করিবে। তথাকথিত 'ছোট কথা' আর না ভাবিলে নয়। তাই চন্দ্রশেখরের সে-কাল-ব্রতের এই অসম্পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমরা আদার ব্যাপারী। জাহাজের খবর রাখি না। এই উপলক্ষে আমি যাহা বলিলাম, তাহাও আমাদের সমশ্রেণীর ব্যাপারীদের জন্য; জাহাজে বোঝাই দিয়া ইয়ুরোপে পাঠাইবার জন্য নয়। ইহাই আমার কৈফিয়ৎ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি। *

* প্রতিভা; শ্রাবণ; ১৩২৭।

# হিপ্‌নটিজম্

## (Hypnotism)

হিপ্‌নটিজম্‌কে কেহ কেহ 'সম্মোহন বিদ্যা' বলিয়া থাকেন। কিন্তু মোহ হইলে জ্ঞান থাকে না। হিপ্‌নটিজম হইলে জ্ঞান থাকিতে পারে। মোহ-সময়ে আত্মবোধ লুপ্ত হয়; কিন্তু হিপ্‌নটিজমে তাহার লোপ না হইতেও পারে। এই সকল ও অন্যান্য কারণে 'সম্মোহন বিদ্যা' কথাটা আমার ভাল লাগে না। আমি 'নিদ্রাভাণ' শব্দ ব্যবহার করিতে চাই।

হিপ্‌নটিজম্ আজি কালি অনেকে বুঝেন। হিপ্‌নটাইজ করা অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু উহাকে হয় ত ভেল্কীবাজি, হয় ত দুষ্টামী বিবেচনা করেন। বাজিকর এতদ্দেশে নানারূপ ভেল্কী বহু কাল দেখাইতেছে। হিপ্‌নটিজম্‌কেও তেমনই একটা ভেল্কী বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমি এক দিন একটী প্রক্রিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহা এই:—এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে চেয়ারে বসাইয়া হিপ্‌নটাইজ করিল। তৎপর সে তাহাকে সরবৎ খাইতে দিয়া বলিল, 'বড় তিত।' তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তি সরবৎ মুখে দিয়া 'তিত' বলিয়া মুখভঙ্গী করিয়া ফেলিয়া দিল। ইহার একটু পরে কতকগুলি ছেঁড়া কাগজ তাহার গায়ে ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'তোমাকে বোল্‌তায় কামড়াইল।' সে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি করিতে লাগিল। ইহার কিছু কাল পরে তাহাকে অজ্ঞান করিল, সে ব্যক্তি ঘুমন্তের মত শুইয়া রহিল। তখন তাহাকে বলিল, 'তুমি জাগিয়া উঠিয়া ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত গণনা কর।' বাস্তবিকও সে তাহাই করিল।

এই সকল দৃষ্টান্ত প্রথমে ভেল্কি বাজি বলিয়া বোধ হয়। অথবা দুই ব্যক্তি দুষ্টামী করিয়া পরস্পরের সহিত যোগে ঐরূপ করিতেছে বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু আমরা নানাপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, দুষ্টামী বোধ হয় নাই। উহা ভেল্কীও নহে; সত্য ঘটনা। জগতের অন্য ঘটনার মত উহাও সত্য। অধিকাংশ স্থলেই সত্য।

যখন ইহা স্বীকার করিতেই হইল, তখন বুঝিবার চেষ্টাও করিতে হইবে। এ সকল মানসিক ঘটনা। দার্শনিকরা মনকে যাহা ভাবেন, বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক তাহা ভাবেন না। মনের যেরূপ অর্থই গ্রহণ করি, এ সকল কার্য্যকে মানসিক অবস্থার ফল বলিতেই হইবে। মিষ্ট সরবতের তিক্ত আস্বাদ পাওয়া; কাগজের

টুকরা স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ করা; অজ্ঞান অবস্থায় অন্যের আদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুসারে গণনা করা; এ সকল যদি দুষ্টামী না হইল, তবে কি? তাহা বলা কঠিন। এ সকলকে বুঝিতে হইলে আমাদিগের জানা-ঘটনার সহিত মিলাইয়া বুঝিতে হইবে। যাহা সকলেই জানেন, এবং বুঝেন বলিয়া বিবেচনা করেন, তদ্রূপ ঘটনার সহিত এ সকলের সাদৃশ্য দেখাইয়া দিতে পারিলে একরূপ বুঝা যায়। এই প্রণালীতেই বুঝিবার চেষ্টা করা সহজ। নতুবা কারণ অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার। মনে করুন, এক ব্যক্তি হঠাৎ মারা গেল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা কঠিন। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, ব্যক্তি কেন মারা গেল, তাহা হয় ত বলিতে পারিব না। কিন্তু যদি বলি, ঐরূপ অকস্মাৎ মৃত্যু অনেকের হইয়া থাকে; উহা সন্ন্যাস রোগ; তাহা হইলে, প্রশ্নকারীও তৃপ্ত হইল, আমিও ভাবিলাম যে, বিষয়টা আর দুর্ব্বোধ থাকিল না। ইহা কার্য্য-কারণ-নির্ণয় নহে; কিন্তু ইহাকেও একরূপ 'বুঝা' বলা যায়। বহু ব্যক্তি ঐরূপে মরে; এ ব্যক্তিরও তাহাই হইল। সুতরাং কথাটা ঐ ভাবে বুঝা গেল।

উপরের বর্ণিত হিপ্‌নটিজমের ঘটনা কয়েকটীর সহিত পূর্ব্ব-পরিজ্ঞাত ঘটনার এই ভাবে সাদৃশ্য দেখাইতে পারিলেও, উহাদিগকে 'বুঝা' যাইতে পারে। আমরা আপাততঃ এই উপায়েই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

মানব-মনের একটা নিয়মই এই যে, সকল কথা বিচার করিয়া গ্রহণ করে না। যাহার উপর বিশ্বাস আছে, অথবা যাহার সংসর্গে সর্ব্বদা থাকে, কিংবা যাহাকে ভালবাসে, অথবা যে কথা পুনঃপুনঃ শুনে, তাহা মানব-মন বিনা বিচারেই গ্রহণ করে। আমাদিগের বিশ্বাসগুলির সমষ্টি করিলে দেখা যাইবে, তাহার অধিকাংশ বিনা বিচারে, বিনা প্রমাণে গৃহীত হইয়াছে। শিক্ষকের বাক্য, গুরু পুরোহিতের বাক্য মানব স্বতঃই বিশ্বাস করে। যাহাদিগের সংসর্গে থাকি, তাহাদিগের মতই হইয়া উঠি; অথচ সেইরূপ হইলে ভাল কি মন্দ হইব, তাহার প্রমাণও লই না, বিচারও করি না। বহু ব্যক্তি তাহাদিগের প্রণয়িনীর বাক্য শ্রবণমাত্রই বিশ্বাস করে। অসত্য কথাও যদি পুনঃপুনঃ উক্ত হয়, তবে তাহা অনেকে বিনা প্রমাণেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। 'বাঙ্গালী চিরদিনই ভীরু, কখনই সমরকুশল নহে, অতি অযোগ্য'—ইত্যাকার বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়ায় যাহাদিগের স্বার্থ আছে, তাহারা পুনঃপুনঃ আমাদিগের কর্ণে ঐ কথা বলায় আমরা অনেকেই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি। অথচ এই জাতি

আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল; বহু যুদ্ধে পশ্চিমদেশীয়গণকে পরাজিত করিয়াছিল; সে দিনও পলাশীর যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়াছে। যাহা হউক, বিনা প্রমাণে, বিনা বিচারে বহু বিষয় বিশ্বাস করা মনের একটা স্বভাব। বস্তুতঃ সমস্ত বিষয়েই প্রমাণ লইয়া বিশ্বাস করিতে হইলে সংসারযাত্রা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিত।

এই কথা যদি একবার বুঝিয়া লই, তবে হিপ্‌নটিজম্ অনেকাংশে বুঝা যাইতে পারে। জাগরিত অবস্থায় আমাদিগের আত্মবোধ ও চৈতন্য যেরূপ থাকে, হিপ্‌নটিক অবস্থাতে ঠিক তদ্রূপ থাকে না; তথাপি চৈতন্য ও আত্মবোধ সকল সময়ে লুপ্ত হয় না। হিপ্‌নটিক অবস্থায় যখন মৃত্যু হয় না, তখন চৈতন্য থাকিবেই। কিন্তু আত্মবোধ গাঢ় হিপ্‌নটিক্ অবস্থায় বিশেষ থাকে না; অল্প হিপ্‌নটিক অবস্থায় আত্মবোধ থাকে। স্বপ্নে যেমন চৈতন্য ও আত্মবোধ উভয়ই থাকে, তদ্রূপ।

এক্ষণে বিবেচনা করুন, যে ব্যক্তি হিপনটাইজ করিতেছে, তাহার শক্তি ও কৌশল আমি বিশ্বাস করি। আমি অল্প হিপনটিক অবস্থায় সে বিশ্বাসের প্রতিকূল বিচার করিতে সমর্থ হই না। যেমন সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থাতেও, যে স্থলে বিশ্বাস থাকে, সে স্থলে বিচার করিবার আবশ্যকতা থাকে না, তদ্রূপ হিপনটিক অবস্থাতেও বিচার করিবার অথবা প্রমাণ লইবার আবশ্যকতা থাকে না। যিনি হিপ্‌নটাইজ করিতেছেন, তাঁহার কথা কর্ণে প্রবেশ করিয়া মস্তিষ্কে নীত হয়। তৎপরে বিনা বিচারে বিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়। তখনই সরবৎকেও তিক্ত এবং কাগজের টুকরাকেও বোলতা বলিয়া ধারণা হয়। কারণ, বিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হইলে সকল ইন্দ্রিয়ই * অনেক সময় ঐ বিশ্বাসের উপযোগী অনুভূতি লাভ করে। শ্মশানে প্রেত থাকে, এই বিশ্বাসবশতঃ চক্ষু তদনুরূপ মূর্ত্তি দর্শন করে। আমি এক ব্যক্তিকে জানিতাম, তিনি কখনও ওল খাইতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ওলে তাঁহার গলার মধ্যে প্রদাহ জন্মায়। এক দিবস তাঁহাকে আলুর ডালনা খাওয়াইবার পর এক জন বলিল যে, তিনি ওল খাইলেন। অমনই সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহার গলায় প্রদাহ উপস্থিত হইল। আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু আফিম্ খাইতেন, তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে খয়েরের বড়ীতে আফিংএর গন্ধ করিয়া খাইতে দিতেন। উদ্দেশ্য ছিল যে, ক্রমে স্বামীকে আফিং খাওয়া ছাড়াইবেন। এক দিন তাঁহার স্ত্রী ঐ বড়ী বন্ধ

* আমরা এ স্থলে চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কথা বলিতেছি।

করিলে তিনি পুনঃপুনঃ বড়ী চাহিতে থাকিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া কেলিলেন। অমনই তিনি বলিয়া উঠিলেন 'আমি কি এত দিন আফিং খাই নাই?' এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার পেট ফাঁপিয়া উঠিল। বিশ্বাসের এ শক্তি আছে। জাগরিত অবস্থায়ও আছে, হিপ্‌নটিক অবস্থাতেও আছে। সরবতের তিক্ত আস্বাদ, কাগজের টুকরাকে বোলতা জ্ঞান করা, এ সকল বিচারহীন বিশ্বাসের কর্ম্ম। ইহা হিপনটিক অবস্থার বিশেষত্ব নহে।

হিপনটিক অবস্থার আদেশ ঐ অবস্থা অবগত হইলেও প্রতিপালিত হয় কেন? উপরে যে ব্যক্তির কথা বলিয়াছি, তিনি ঐ অবস্থা হইতে জাগরিত হইয়া ১ হইতে ১০ গণনা করিলেন কেন? এ কথা বুঝা কঠিন। কিন্তু ইহার অনুরূপ ঘটনা নিদ্রাতেও দেখা যায়। আমি এক দিন রাত্রি ১২টার সময় নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু শেষ রাত্রি ৩টার গাড়ীতে রেলওয়ে-যোগে অন্যত্র যাইব; এই চিন্তায় নিজেকেই নিজে আদেশ করিলাম, অর্থাৎ সংকল্প করিলাম যে,—৩টার আগে জাগিতে হইবে। তৎপরে ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমার নিদ্রিত অবস্থায় মস্তিষ্ক এ আদেশ আমার অজ্ঞাতসারে প্রতিপালন করিল। বস্তুতঃই আমি ২॥০টা রাত্রির সময় জাগিয়া উঠিলাম এবং ৩টার গাড়ীতে চলিয়া গেলাম। পরীক্ষার কিছু পূর্ব্বে ছাত্রগণ ঈদৃশ ঘটনা অনেক বার দেখিয়াছেন; আমিও পঠদ্দশায় এরূপ দেখিয়াছি, মনে হয়। উপরের উল্লিখিত ব্যক্তি হিপনটিক অবস্থায় যে আদেশ পাইয়াছিল, বিনা বিচারে তাহার মস্তিষ্ক সেই আদেশ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। জাগরিত হইলে সেই আদেশের মত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইল। আমার ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক নিদ্রিত অবস্থায় নিজের আদেশ প্রতিপালন করিল, ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহার মস্তিষ্ক অপরের আদেশ প্রতিপালন করিল, এইমাত্র প্রভেদ।

এই সকল উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, হিপনটিক্‌ অবস্থায় যে সকল কর্ম্ম আমরা ভেল্কী অথবা দুষ্টামী মনে করি, বাস্তবিক সকল ক্ষেত্রে তাহা নহে। আমরা প্রত্যহ যে সকল কর্ম্ম করি, সেই সকলের মধ্যে অনেক কর্ম্ম হিপনটিক অবস্থার অনুরূপ। নিদ্রিত অনিদ্রিত উভয় অবস্থাতেই আমরা এই সকলের অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকি।

বিনা বিচারে, শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যখন আমরা কোনও বিষয় স্বীকার করিয়া লই, অথবা সত্য বলিয়া বিবেচনা করি, তখন মস্তিষ্ক পদার্থের কোনও কোনও কেন্দ্র ন্যূনাধিক ক্রিয়াহীন থাকে। এই ক্রিয়াহীন অবস্থা অথবা

দুর্ব্বলতা নানা কারণে উপস্থিত হয়। পূর্ব্বের বিশ্বাস,আশা, অভ্যাস, প্রেম, ভক্তি, বিদ্বেষ ইত্যাদি কারণে মস্তিষ্কের কেন্দ্রবিশেষের দুর্ব্বলতা অথবা ক্রিয়াহীনতা জন্মাইতে পারে; আমি পুনঃপুনঃ দেখিয়া অথবা শুনিয়া অথবা অন্য কোনও প্রকারে যে রূপ বিশ্বাস পোষণ করিতেছি, তাহার অনুকূল ঘটনা আমি বিনা বিচারে বিনা প্রমাণে স্বীকার করিয়া থাকি; তেমনই আমরা যাহা আগ্রহের সহিত আশা করি, তাহা অতি সহজেই বিশ্বাস করি। মস্তিষ্ক প্রমাণ চাহে না। প্রমাণ বিচার করিবার যোগ্য সবলতাও মস্তিষ্কের থাকে না। অভ্যাসের এই ফল। পুনঃপুনঃ অভ্যাসে মস্তিষ্ক ও স্নায়ু এরূপ ভাবাপন্ন হয় যে, বিচার-শক্তি থাকে না। এ সকলের বহু দৃষ্টান্ত বহু ব্যক্তি জ্ঞাত আছেন; সুতরাং উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপে অনায়াসে উপলব্ধ হইবে যে, উপরে যে ছয়টি কারণের উল্লেখ করিয়াছি,তাহাদিগের মানসিক দুর্ব্বলতা অথবা অবসাদ জন্মাইবার শক্তি আছে। তাহারা মস্তিষ্কের এক অথবা একাধিক কেন্দ্রের দুর্ব্বলতা উৎপাদন করিয়া প্রমাণ অথবা বিচারের আবশ্যকতাই লুপ্ত করিয়া ফেলে।

ইহা মানসিক ফল। কিন্তু বিশ্বাসের দৈহিক ফলও অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। উহা হিপ্‌নটিজমের অনুরূপ ত বটেই, পরন্তু তাহা অপেক্ষা কম আশ্চর্য্যজনক নহে। বিশ্বাসের ফলে অনেক রোগী রোগমুক্ত হয়, ইহা সকলেই জানেন। ঠিক এই কারণেই সময়বিশেষে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয়, ইহাও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিকটস্থ গৃহে আগুন লাগিলে যদি এরূপ বিশ্বাস হয় যে, আমার গৃহও পুড়িয়া যাইতে পারে, তখন যে সকল গুরুভার বস্তু একা গৃহ হইতে বাহির করিতে পারি, অগ্নি নিবিয়া গেলে তাহা একা তুলিতেই পারি না। এই সকল দৈহিক পরিবর্ত্তন বিশ্বাস হইতে জাত হইয়া থাকে।

সুতরাং হিপনটিক অবস্থাতেও মস্তিষ্কে যে ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়, তাহাতে [ উপযুক্ত বিশ্বাস জন্মিবার কোনও বাধা না থাকিলে ] অনেক সময় দৈহিক পরিবর্ত্তন উৎপাদন করে। আমি দেখিয়াছি, হিপ্‌নটিক অবস্থায় এক জনের দক্ষিণ হস্ত হিপনটাইজারের আদেশক্রমে এরূপ শক্ত হইয়াছিল যে, আমরা টিপিয়া নরম করিতে পারি নাই। অথচ সেই ব্যক্তির তখন দৃশ্যতঃ বাহ্য-জ্ঞান না থাকাই বোধ হইয়াছিল। এ স্থলে হিপ্‌নটিক অবস্থাতেও যে পরিমাণ ক্রিয়া মস্তিষ্কমধ্যে হইতেছিল, তাহাতেই হিপনটাইজারের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস জাত হইয়াছিল; এবং তাহারই ফলে দৈহিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া-

ছিল। হিপনটিক অবস্থাতেও মানুষ সকল সময় সম্পূর্ণ অচেতন হয় না। মস্তিষ্ক পদার্থের অনেক অংশ তখনও ক্রিয়াশীল থাকে।

মস্তিষ্ক পদার্থের তিনটা স্তর কল্পনা করিলে সকলের উপরের স্তরের ধূসর বর্ণের পদার্থগুলিই বিচারকার্য্যে ও চিন্তার কার্য্যে বিশেষভাবে আবশ্যক হয়। এই সর্ব্বোচ্চ স্তরই মানবকে মানব-নামের অধিকারী করিয়াছে। তাহার বুদ্ধি বিবেচনা ও উন্নত ভাব সকল এই ধূসরবর্ণের কোষগুলির কর্ম্ম। জাগরিত অবস্থায়ও যেমন, হিপনটিক অবস্থাতেও তেমনই; যে সকল স্থলে বিচার-বুদ্ধির গুরুতর হ্রস্বতা অথবা লোপ দেখা যায়, এবং বিনা বিচারে বিশ্বাস করিবার প্রবণতার অত্যন্ত বৃদ্ধি দেখা যায়, সেই সকল স্থলে অনুমান করিতে হয় যে, মস্তিষ্কের সর্ব্বোচ্চ স্তরের বহু কোষ ক্রিয়াহীন হইয়াছে, অথবা অধিকমাত্রায় দুর্ব্বল হইয়াছে। সকল কোষ ক্রিয়াহীন অথবা দুর্ব্বল নাও হইতে পারে। উপস্থিত বিষয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় কতিপয় কোষ অথবা কেন্দ্র ঐরূপ ভাবাপন্ন হইলেই সেই বিষয়ের বিচার-শক্তির হানি হইবে। সে সময়েও অন্যান্য কোষ অথবা কেন্দ্র সকল ক্রিয়াশীল থাকিতে পারে। যে মাননীয় বিচারপতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে প্রমাণাদির তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া ন্যায়বিচার ও সত্য নির্ণয় করিয়া অশেষ ফল লাভ করিতেছেন, তিনিও প্রিয়তমা ভার্য্যার কথায় নিতান্ত অবিশ্বাস্য বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া সহোদর ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন; পূর্ব্বপক্ষের পুত্রকন্যাকে নিদারুণ ক্লেশ দিতে পারেন; পূজনীয়া মাতৃদেবীর সহিত দুর্ব্যবহার করিতে পারেন। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেকেই অবগত আছেন। ঈদৃশ স্থলে প্রণয়জনিত বিশ্বাস সেই তীক্ষ্ণধী বিচারপতির মস্তিষ্কের কতিপয় কেন্দ্রমাত্র ক্রিয়াহীন অথবা গুরুতরভাবে দুর্ব্বল করিয়াছিল; তাহাতেই তিনি নিতান্ত অবিশ্বাস্য কথাও বিনা প্রমাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাহ্যতঃ সকলেই দেখিতেছে, তাঁহার চৈতন্য ও আত্মবোধ পূর্ণমাত্রায় আছে; কিন্তু তাঁহার অভ্যন্তরভাগ বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, ঐ উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার চৈতন্য ও আত্মবোধের অনেক হ্রাস হইয়াছে। সুতরাং উহাদিগের অভাবে তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ পূর্ণ অথবা অখণ্ডিত মানুষ বলা যায় না। তাঁহার চৈতন্য ও আত্মবোধ যে পরিমাণে লোপ পাইয়াছে, তিনিও সেই পরিমাণে চৈতন্যহীন ও আত্মবোধ-হীন [ অর্থাৎ মৃতবৎ ] হইয়াছেন। মৃতবৎ অথচ মৃত নহেন, চৈতন্যহীন অথচ অচেতন নহেন। সুতরাং মস্তিষ্কের ঐ ধূসরবর্ণ কোষগুলির অতিমাত্র দুর্ব্বলতা-বশতঃ বিনা বিচারে ঐ উপস্থিত বিষয় জড়বৎ গ্রহণ করিলেন। এইরূপ অনেক

সময় হিপনটাইজড্ ব্যক্তিও পূর্ণ চৈতন্য হারাইয়া ফেলে। তখন তাহারও মস্তিষ্কের ঐ ধূসরবর্ণ স্তর দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সেও বিনা বিচারে জড়বৎ [ অর্থাৎ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় ] ব্যবহার করে। ইহাকে অস্বাভাবিক, অথবা অপ্রাকৃত বলা যায় না। ইহা দৃশ্যতঃ সুস্থ ও জাগরিত [ উপরের লিখিত বিচারপতির অথবা তদ্রূপ অবস্থাপন্ন অন্য ] ব্যক্তির ব্যবহার হইতে অধিক বিভিন্ন নহে। অন্ততঃ তাহার অনুরূপ বলা যাইতে পারে।

এই ভাবেই আমরা সর্ব্বজনবিদিত স্বাভাবিক ও সুস্থ ব্যক্তিগণের ব্যবহারের সহিত হিপনটাইজড ব্যক্তির আচরণের সাদৃশ্য দেখিয়া ঐ আচরণ কতক পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হই। উহা তখন আর অস্বাভাবিক জ্ঞান হয় না, বরং স্বাভাবিক নিয়মের অধীন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। হিপনটিজম্ বর্ত্তমান কালে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইতেছে; উহা শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত।

শ্রীশশধর রায়।

---

# ন্যায়রত্নের নিয়তি।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্নের চিকিৎসার জন্য কবিরাজের সহিত বলরামের কি বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা ন্যায়রত্ন বা সুমতি কোনও দিন জানিতে পারেন নাই, তবে কবিরাজ যে নিঃস্বার্থভাবে প্রত্যহ পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ভিন্ন গ্রামের এই নিঃস্ব রোগীর চিকিৎসা করিতে আসিতেন, ইহা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কবিরাজ প্রতিদিনই ন্যায়রত্নকে দেখিতে আসিতেন; যে দিন সকালে আসিতে না পারিতেন, সে দিন অপরাহ্নে আসিতেন; সযত্নে তাঁহার রোগের অবস্থা পরীক্ষা করিতেন; ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন; তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আগ্রহসহকারে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। কবিরাজ মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, সাহিত্যরসজ্ঞ ও ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি; ন্যায়রত্নের সহিত কথাবার্ত্তায় কয়েক দিনেই তিনি ন্যায়রত্নের পাণ্ডিত্য, উদারতা, নিষ্ঠা ও গভীর ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাইলেন; ন্যায়রত্নের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। কোনও দিন কোনও কারণে তিনি ন্যায়রত্নকে দেখিতে আসিতে না পারিলে, সে দিনটি তাঁহার বৃথা গেল বলিয়া মনে করিতেন।

ন্যায়রত্ন তাঁহার পল্লী-ভবন হইতে নির্ব্বাসিত হইবার পর এ পর্য্যন্ত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিবার লোক পান নাই। তাঁহার অন্তর্বেদনা বুঝিতে পারে, এবং সহানুভূতি প্রকাশ করে, এরূপ কোনও লোকের সহিত আত্মীয়তা স্থাপিত না হওয়ায় তাঁহার মনের সকল কথা মনের মধ্যেই গোপন ছিল; কবিরাজের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা স্থাপিত হইলেও তিনি যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনাইবেন, ন্যায়রত্ন এরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। এক দিন অপরাহ্ণে কবিরাজ ন্যায়রত্নের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন, 'কয়েক দিন হইতে আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াও সঙ্কোচবশতঃ তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই, কিন্তু কথাটা জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'এমন কি কথা কবিরাজ? তোমাকে গোপন করিতে হয়, এমন কথা আমার কিছুই নাই, তুমি অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতে পার।'

কবিরাজ বলিলেন, 'আপনার ন্যায় মহাপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন ব্রাহ্মণ কন্যা সঙ্গে লইয়া এই সুদূর পল্লীতে কতকগুলি অশিক্ষিত নিরক্ষর চাষী গৃহস্থের মধ্যে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন, ইহার কারণ কি, তাহা আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও স্থির করিতে পারি নাই।'

ন্যায়রত্ন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'এই কথা?—দেখ কবিরাজ, আমি দৈব বিড়ম্বনায় আমার বাসগ্রাম ত্যাগ করিবার পর এই দীর্ঘ কালের মধ্যে এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। যে কথা আমার নিজের কথা, যাহার সহিত সংসারের অন্য কোনও লোকের সুখ দুঃখের কোনও সংস্রব নাই, সেই তুচ্ছ ব্যক্তিগত কথার আলোচনা করিয়া অন্যের সময় নষ্ট করিবার আগ্রহও আমার নাই। তবে তুমি আমার হিতৈষী সুহৃদ, তুমি তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ বলিয়াই আজ তোমাকে আমার এই সুখ শান্তিহীন ব্যর্থ জীবনের কাহিনী বলিতেছি শোন—'

এইরূপ ভূমিকা করিয়া ন্যায়রত্ন তাঁহার পূর্ব্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রবলপ্রতাপ তালুকদার বিজয় দত্ত কাজি সাহেবের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার ঘর বাড়ী ও যে কয়েক বিঘা লাখরাজ জমী ছিল, তাহা কাড়িয়া লইয়া মিথ্যা অভিযোগে তাঁহাকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, এবং তিনি নিরাশ্রয়ভাবে একবস্ত্রে পথে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে কিরূপে সদাশয় বলরামের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ কবিরাজের গোচর করিলেন। কবিরাজ

কৌতুহলপ্রদীপ্তহৃদয়ে নিস্তব্ধভাবে ন্যায়রত্নের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের করুণ কাহিনী শ্রবণ করিলেন। সমস্ত ঘটনা তাঁহার উপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুত বোধ হইল। সকল কথা শুনিয়া কবিরাজের হৃদয় সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'কি পৈশাচিক অত্যাচার! এই অত্যাচারের প্রতীকারের কি কোনও ব্যবস্থা হইতে পারে না?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'প্রতীকারের ব্যবস্থা আর কি হইবে? দরিদ্রের প্রতি সবলের অত্যাচারের প্রতীকার সহজ নহে। আমাদের দেশের দরিদ্রেরা প্রবলের শত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহাই তাহাদের নিয়তি।'

কবিরাজ বলিলেন, 'কিন্তু এইরূপ নিশ্চেষ্টতা কি পুরুষকারের ব্যভিচার নহে? এই অত্যাচারের কথা নবাব বাহাদুরের গোচর করিলে কি কিছুই ফল পাওয়া যাইত না?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আমার কর্ম্মফল আমি ভোগ করিলাম।'

কবিরাজ ঈষৎ উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, 'বিলক্ষণ! এক জন অন্যায় অত্যাচার করিয়া আপনার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল, আপনার অপমান করিয়া, মিথ্যা কলঙ্কের ডালি আপনার মাথায় চাপাইয়া, আপনাকে বাসগ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করিল, আর আপনি কর্ম্মফল ভোগ করিলেন ভাবিয়া নিয়তির ঘাড়ে সকল দায়িত্ব চাপাইয়া নিশ্চিন্তমনে নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিতেছেন! অপূর্ব্ব যুক্তি বটে! কিন্তু আপনার এই যুক্তি মানিতে হইলে ত নরপিশাচেরা যথেচ্ছ অপরাধ করিয়া শাস্তি পায় না!'

ন্যায়রত্ন মৃদু হাসিয়া কবিরাজের মুখের দিকে প্রশান্তনয়নে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'এত ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই কবিরাজ! তুমি স্থিরচিত্তে একটু ভাবিয়া বল দেখি, বাড়ী ঘর কি আমার? যদি আমার হইত তাহা হইলে তাহা আমারই থাকিত, কেহই তাহা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিত না।'

কবিরাজ বলিলেন, 'আপনি সংসারী; সংসারবিরাগী উদাসীন, যোগী তপস্বী নহেন; আপনি গার্হস্থ্যাশ্রমে আছেন, এখনও ঘর বাঁধিয়া সংসারে বাস করিতেছেন, অতএব সংসারীর মত কথা বলুন। বিজয় দত্ত তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, এই অধিকারে সে কি আপনার বাড়ী ঘর, আপনার পৈতৃক লাখেরাজ সম্পত্তি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে পারে?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'সংসারী সাজিয়া সংসারে বাস করিতেছি বলিয়া', যে সত্যের উপর সমস্ত সংসার নির্ভর করিতেছে, মোহের ঘোরে তাহা ত মিথ্যা বলিয়া উড়াইতে দিতে পারি না। তুমি যে অধিকারের কথা বলিতেছ, সে অধিকার তালুকদার বিজয়দত্তের নাই, তালুকদারের প্রজা আমারও নাই। বাড়ী বল, ঘর বল, বিষয় সম্পত্তি বল, আমার বলিতে এ সংসারে আমাদের কিছুই নাই। আমার পরিধানের এই বস্ত্র, আমার গাত্রের এই নামাবলীখানি, ইহাতে আমার কোনও অধিকার নাই। আমি নিজের কর্ম্মের দ্বারা যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি, আমার বলিতে সেই ক্ষেত্র আছে। আমার কর্ম্মফলে কেহ আমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, তদ্ভিন্ন আমার বলিতে আর কি আছে? কিছুই নাই। মাঠের ক্ষুদ্র তৃণগাছটি হইতে জোত জমা, বিষয় সম্পত্তি, তালুক মুলুক সমস্তই মা জগদম্বার। আমরা তাঁহার 'রাখালী' বা জিম্বাদার। আমার ঘর, আমার বাড়ী, আমার জমীদারী, আমার রাজ্য—বলিয়া দীনতম প্রজা হইতে বহুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত, চারি দিকে কেবল আমার আমার রব! কিন্তু মা যে দিন জবাব দিবেন—সে দিন এই আমার আমার ধ্বনি চির নীরব হইবে, ঘড় বাড়ী, বিষয় সম্পত্তি রাজ্য সমস্তই ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় যাইতে হইবে জানি না, কিন্তু তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিবার অবসর হইবে না! সত্য যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত কত রাজার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, কত মহাপরাক্রান্ত বাদশাহের উত্থান পতন হইয়াছে, কিন্তু রাজ্য যাঁহার—তাঁহারই আছে, কেবল হাতফের, কেবল 'রাখালী'র বদল হইয়াছে মাত্র। এই সনাতন সত্য তুমিও জান, আমিও জানি; এমন কি, ঐ যে ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া দেহতত্ত্বের গান গাহিতেছে, সে-ও জানে। ঐ ভিক্ষুক মুখে বলিতেছে বটে—'মুদলে আঁখি, সকল ফাঁকি, মায়ায় বদ্ধ এ সংসার!'—কিন্তু ভিক্ষার ঝুলিটি সে অসার বলিয়া ত্যাগ করিতে পারে নাই। শুকদেব গোস্বামী ত্যাগীর আদর্শ হইয়াও কৌপীনখানি পাছে আগুনে পুড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিলেন! ত্যাগের আদর্শই ভারতের সনাতন আদর্শ। ভোগের ভিতর দিয়া ত্যাগের যে শিক্ষা, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা; এই জন্য পৌরাণিক যুগে জনক রাজা হইয়াও ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং ঐতিহাসিক যুগে কপিলবস্তুর রাজনন্দন সোনার সিংহাসনে পদাঘাত করিয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই পৃথিবীর কোটী কোটী মানবের নিকট মোক্ষের পথ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তোতার মত কেবল 'বুলি আওড়াইয়া'

কোনও ফল নাই ; হৃদয়ে আমরা যে সত্য উপলব্ধি করিব, কার্য্যে তাহা প্রয়োগ করিব, কথায় ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনিয়া এ কথা মনে করিও না যে, আমি সংসারের সকল লোককে ঘর বাড়ী বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া কৌপীন আঁটিয়া বনবাসী হইতে বলিতেছি। সংসারে থাকিয়া সংসারের নশ্বরতা ভুলিয়া ইহসর্ব্বস্ব হইলে আমাদের আত্মার অধঃপতন অনিবার্য্য '

ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া কবিরাজ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। এই মহতী বাণী দৈববাণীর ন্যায় তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তিনি মনে মনে ন্যায়রত্নকে শতবার প্রণাম করিলেন. এবং তাঁহার ধর্ম্মভাব, উৎপীড়ককে ক্ষমা করিবার শক্তি, তাহার উদারতা ও আদর্শ চরিত্রের কথা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কবিরাজ প্রস্থান করিলে ন্যায়রত্ন সুমতিকে ডাকিলেন। তিনি রোগ-শয্যায় পতিত থাকিয়া কোনও দিন এত অধিক কথা বলেন নাই, কথায় কথায় তাঁহার ভাবের উৎস মুখ যেন খুলিয়া গিয়াছিল, তাই তিনি প্রাণের আবেগে কবিরাজকে এত কথা বলিতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহাতে তিনি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুমতি তাঁহার আহ্বানে তাঁহার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বসিলে তিনি চক্ষু মুদিয়া কিছুকাল নীরব রহিলেন। তাহা দেখিয়া সুমতি উৎকণ্ঠিতা হইয়া বলিল, 'বাবা, আমাকে ডেকেছো ? এখন শরীর কেমন বুঝছো ?'

ন্যায়রত্ন তাঁহার শীর্ণ হাতখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া অবনতমুখী সুমতির মাথায় রাখিয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ব'লিলেন, 'আমি কেমন আছি, তাই জিজ্ঞাসা করছো মা! সেই কথা বলতেই তোমাকে ডেকেছি। সুমতি, তুমি মনে কষ্ট পাবে ভেবে এত দিন বলি বলি করেও তোমাকে বলা হয় নি। কিন্তু আর তা না ব'লে থাকা যায় না। তোমার মা আমাকে ডেকেছেন, আমাকে শীঘ্রই তাঁর কাছে যেতে হবে। তাঁর ডাক শুনেছি, বুঝেছি—আমার আর বেশী বিলম্ব নেই।'

সুমতি পিতার কথা শুনিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। সে বাষ্পরুদ্ধ-স্বরে বলিল, 'বাবা, তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে ? তুমি আমাকে ফেলে গেলে আমি কার কাছে থাকবো ?'

ন্যায়রত্ন কন্যাকে বিচলিত দেখিয়া কাতর হইলেন, তাহাকে সান্ত্বনা-দানের

জন্য বলিলেন, 'মা, আমার অভাবে তোমার কষ্ট হবে ভেবে কাঁদছো; কিন্তু কেঁদে ত নিয়তির গতিরোধ করা যায় না, মা! জন্ম হ'লেই মৃত্যুও হবে; জন্মের সঙ্গে মৃত্যুর নিত্য-সম্বন্ধ। কারও অল্প বয়সে মৃত্যু হয়, কেহ প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে, কিন্তু কাল পূর্ণ হ'লে কাহাকেও ধরে রাখবার উপায় নেই। আমার কাল পূর্ণ হয়েছে, শীঘ্রই আমাকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হবে। তুমি কিছু দিনের জন্য সংসারে একা পড়বে, তোমার কিছু কষ্ট হবে, তা বুঝতে পারছি, কিন্তু সে কত দিনের জন্য? তার পর সেখানে তোমার মা গিয়েছেন, আমিও যাচ্ছি, সেইখানে তোমাকেও যেতে হবে। সেখানে আবার আমরা একত্র হব। এক সঙ্গে থাকব। তখন তোমাকে দুঃখ যন্ত্রণা কিছুই সহ্য করতে হ'বে না। তুমি দুঃখ করো না মা!'

কিন্তু সুমতি তাঁহার কথায় সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিল না; তাহার মন বুঝিল না; সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল,কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পিতাকে বলিল, 'আমার দশা কি হবে বাবা! আমি যে তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানিনে বাবা! এ সংসারে আর যে আমার কেহই নেই!'

ন্যায়রত্ন কিছু কাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'আমাকে ভিন্ন তুমি আর কাহাকেও জান না, তা আমি জানি; কিন্তু তোমার ভয় কি? তোমার মা জগদম্বাই আছেন; বিপদে আপদে তাঁকেই প্রাণ ভরে ডেকো; কাতর-প্রাণে তাঁকে ডাক্‌লে তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন।'

সুমতি বলিল, "আমি মাকে জানিনে, আমি জানি তুমি বাবা, তুমিই মা। আমি ধর্ম্ম জানিনে অধর্ম্মও জানিনে; আমি জানি তুমি ধর্ম্ম, তুমিই স্বর্গ। আমি দেবতা জানিনে, আমি জানি তুমিই আমার জীবন্ত দেবতা। তোমার সেবা করতে হয়, তাই জানি। এত দিন তোমারই সেবা করে এসেছি। তুমি চলে গেলে আমি কার কাছে দাঁড়াব, কার সেবা করব?'

ন্যায়রত্নের হৃদয় কন্যার কথায় বিচলিত হইল। পুনর্ব্বার তিনি মায়া-মোহে আচ্ছন্ন হইলেন, বুঝিলেন, এই মায়া-পাশ ছিন্ন করা কত কঠিন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর অতিকষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া ধীর-স্বরে বলিলেন, 'দেখ মা, শোক দুঃখ ছায়ার মত সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। পৃথিবীতে এমন লোক নেই, যাকে কখনও কোনও রকম শোক দুঃখ পেতে না হয়। এমন কোনও পরিবার নাই, যেখানে মৃত্যু এসে ভক্তি স্নেহের

পাত্রকে কেড়ে নিয়ে না গিয়েছে। দুঃখ দুর্দ্দিনে ভগবানের উপর আত্ম-সমর্পণ করা ভিন্ন শান্তিলাভের কোনই উপায় নাই মা! আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, বেলা শেষ হ'লে, সূর্য্য পাটে বস্‌লে যেমন তাঁকে ধরে রাখা যায় না, সেই রকম আমার এই জীবন-সন্ধ্যায় আমাকে ধরে রাখা আমার এই জরাজীর্ণ দেহের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমাকে বিদায় দিতেই হবে। আমি তোমাকে একা এ সংসারে রেখে যাচ্ছি। তোমার কি দশা হবে, তা জানিনে; কিন্তু এ কথা মা স্থির জেনো যে, এখন যেমন তোমার কাছেই আছি, তোমাকে ছেড়ে গেলেও তেমনই তোমার কাছেই থাক্‌বো, কেবল আমার এই জড় দেহ তোমাকে ছেড়ে যাবে, তাই আমাকে তুমি দেখ্‌তে পাবে না, কিন্তু আমি তোমাকে সর্ব্বক্ষণই দেখতে পাব, এখন তুমি কোনও অপ্রীতিকর কাজ করলে যেমন আমি মনে বেদনা পাই, তখনও সেই রকম বেদনা পাব। আমার এই কথাগুলি মনে রেখে তুমি জীবনের পথে চল্‌বে।'

রোগের কোনও প্রতীকার হইল না। কবিরাজ পূর্ব্বে যেমন প্রতি দিন আসিতেছিলেন, সেইরূপ প্রতি দিন আসিয়া সযত্নে তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাঁহার দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতালব্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ প্রয়োগে ন্যায়রত্নের রোগক্লান্ত জীর্ণ দেহে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও রোগের উপশম না হইয়া প্রতিদিন তাহা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত হইল; তাঁহার জীর্ণ দেহ যেন শয্যায় মিশিয়া গেল। সুমতির উদরে অন্ন নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, সে দিবারাত্রি পিতার রোগ-শয্যায় বসিয়া অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কখনও দুধ, কখনও সরবৎ, কখনও একটু পেঁপে, কখনও বা এক টুকরা আক তাঁহার মুখে তুলিয়া দেয়। পিতা কিসে একটু সুস্থ থাকেন, তাহাই যেন তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। এই ভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। ন্যায়রত্ন বুঝিলেন, তাঁহার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই; আসন্ন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

# উৎকলে সূর্য্যপূজা।

সূর্য্য এক সময়ে আর্য্যদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে মধ্য-এসিয়ার সমতল ক্ষেত্রে আর্য্যদিগের আদিপুরুষগণ গললগ্নীকৃতবাসে সবিতার পূজা করিতেন। ঊষা নামে আর্য্যদিগের আর একটী দেবতা ছিলেন। অরুণোদয়ের সহিত পূর্ব্ব দিকে যে রঙ্গের ছটা ফুটিয়া উঠে, তাহাকে আর্য্যজাতির আদিপুরুষগণ ঊষা নামে অভিহিত করিতেন, এবং বোধ হয় সবিতার পরেই তাঁহার আসন ছিল। ভারতবর্ষে আসিয়াও আর্য্য জাতি আদিম দেবতা সবিতাকে ভুলেন নাই। যাঁহার হৃদয়-কন্দর হইতে পৃথিবী এবং গ্রহনিচয় উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার মাধ্যাকর্ষণের বলে সৌরজগৎ চলিতেছে,সেই সবিতার পূজায় পৌত্তলিকতার লেশ নাই। যে অনন্ত শক্তি এবং অনন্তবীর্য্য সৌরজগৎকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করিতেছে, তাহার উপমা নাই, তুলনা নাই, কেহই তাহার প্রতিভূস্বরূপ হইতে পারে না। সূর্য্য হইতেই বৃষ্টি হয়, এবং বৃষ্টি হইতেই শস্য তৃণ গুল্ম লতা বৃক্ষ এবং ওষধিনিচয়ের উৎপত্তি। সূর্য্য না থাকিলে নিবিড় অন্ধকারে উদ্ভিদ ও প্রাণিনিচয় মরিয়া যাইত। তাই সবিতার পূজা—শক্তি-পূজা। সবিতা প্রত্যক্ষ দেবতা। তাঁহার কিরণমালায় উত্তাপ থাকিলেও সে উত্তাপে লোকের হিত ভিন্ন অহিত হয় না। তাই শক্তি পূজার প্রথম স্তরে যে ভয়জড়িত ভক্তি দেখা যায়, তাহা সবিতার উপাসনায় ছিল বলিয়া মনে হয় না। সূর্য্যের শক্তিনিচয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে কল্পনার বিকাশ আবশ্যক। সৌর জগতের দিকে চাহিয়া দেখিলে গ্রহ উপগ্রহ মণ্ডলীর আবর্ত্তন বুঝিতে যতটুকু বুদ্ধিমত্তার আবশ্যক হয়, তাহা একান্ত বর্ব্বর জাতির নাই। আর্য্যগণের সূর্য্যপূজা যে ভয়ত্রাণের কাকুতি মিনতি ছিল না, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদে রহিয়াছে। ঋগ্বেদ ভারতবর্ষে রচিত হয় নাই। মনীষীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদে যে ঊষার বর্ণনা আছে, তাহা ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে সম্ভবপর নয়। মেরুপ্রদেশে, যেখানে ছয় মাস দিন, এবং ছয় মাস রাত, সেখানে ঊষার ক্রম-প্রকাশের সহিত অন্ধকারের হ্রাস হয়, এবং বহুকালব্যাপী ঊষালোক থাকে। সূর্য্য ফুটিয়াও ফুটেন না। মন্থরগতিতে সূর্য্যের রথ ধীরে ধীরে দিগ্বলয় অতিক্রম করিয়া আকাশে উঠিতে থাকে। মহাত্মা তিলক 'মেরুদেশে আর্য্যজাতি' নামক গ্রন্থে নানা যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন

যে, ঋগ্বেদে যে উষার বর্ণনা আছে, তাহা মেরুপ্রদেশের সূর্য্যের ক্রমোত্থান ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। ঐ সকল যুক্তি তর্কের অবতারণা এ স্থানে অবান্তর হইবে। যদি আমরা মানিয়া লই যে, আর্য্য জাতি উত্তর মেরুর সন্নিকটে বসবাস করিবার সময় হইতে সূর্য্যের উপাসনা করিতেন, তাহা হইলে সূর্য্যপূজায় যে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না, তাহা বেশ জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। ছয় মাসব্যাপী অন্ধকার এবং শীতে জড়সড় হইয়া আর্য্যজাতির আদিপুরুষগণ একান্ত অনুরাগ এবং ভক্তির সহিত সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেন। আমার বোধ হয়, আর্য্যজাতির সূর্য্যপূজা যেরূপ আন্তরিক অনুরাগব্যঞ্জক, এরূপ অন্য কোনও দেবতার পূজা আদিম যুগে ছিল কি না সন্দেহ; কারণ, অন্য কোনও প্রাকৃতিক বিকাশের জন্য লোকে এত আকাঙ্ক্ষা এবং আগ্রহের সহিত পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিত না। কত কাল ভারতবর্ষে সূর্য্যের পূজা অতি-প্রচলিত ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। কি কারণে সূর্য্যের পূজা দেশ হইতে উঠিয়া যায়, তাহার কারণনির্দ্দেশও একান্ত দুরূহ।

বর্ত্তমান কালে প্রায় সকল পূজাতেই নবগ্রহের পূজা আছে। সেই সময় সূর্য্যের পূজা হইয়া থাকে। অর্থাৎ, উপদেবতা বলিয়া প্রায় সকল পূজায় সূর্য্যের পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রধান দেবতা বলিয়া সূর্য্যের পূজা আজ কাল আর দেখা যায় না। রামায়ণের সময় পর্য্যন্ত সবিতা যে প্রধান দেবতা বলিয়া গণ্য হইতেন, তাহার প্রমাণ আছে। শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের সময় আদিত্যহৃদয় দেবতার স্তব করিয়াছিলেন, বাল্মীকির রামায়ণে এ কথার উল্লেখ আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে দেবীর পূজার উল্লেখ আছে, তাহা পরবর্ত্তী শাক্ত যুগে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। কালিকা পুরাণের মতে, রাম রাবণবধের পর দুর্গার বিশেষ পূজা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বাল্মীকি-কথিত আদিত্যের উপাসনার সহিত দেবীপূজার কোনও বৈষম্য নাই। কারণ, বাল্মীকির মতে, রাম রাবণবধের পূর্ব্বে সূর্য্যের স্তব করিয়াছিলেন, এবং কালিকা পুরাণের মতে, রাবণবধের পর রাম দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণ পড়িলে আদিত্যের প্রসাদে রাম রাবণবধ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং রামায়ণের সময় পর্য্যন্ত সূর্য্য যে আর্য্যদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায় যে, সূর্য্য সূর্য্যবংশীয়দিগের আদিপুরুষ ছিলেন। যে সূর্য্যবংশের প্রতাপে ভারতভূমি এত কাল টলমল করিয়া আসিয়াছে, এবং যাহার বংশধরগণ আজিও

সামন্ত-রাজরূপে ভারতের দেশীয় রাজ্যনিচয় শাসন করিয়া আসিতেছেন, তাহার আদিপুরুষ সূর্য্য যে এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পূজা পাইবেন, তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য কি?

বৈদিক যুগের অবসানে যখন নানা দেবদেবীর রূপ কল্পিত হইল, এবং তাঁহাদিগের পূজা বিধিবদ্ধ হইয়া দেশে প্রচারিত হইল, তখন হইতেই বোধ হয় সূর্য্যপূজার বহুল প্রচলন উঠিয়া যাইতে লাগিল। তবে লোকে রোগ শোক এবং দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য রবিবার দিন সূর্য্যের মানসিক পূজা করিতেন। এইরূপ পূজার আজিও প্রচলন আছে। নিত্য নৈমিত্তিক পূজার বাঁধাবাঁধি নিয়ম এ পূজায় নাই। সূর্য্যের কবচ ধারণ করিলে কি হয়, তাহা ব্রহ্মযামল তন্ত্রে উল্লেখ আছে। সূর্য্যের কবচের মাহাত্ম্য শিব দুর্গাকে বলিতেছেন;—'ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভম্। শ্রীপদং কান্তিদং নিত্যং ধনারোগ্যবিবর্দ্ধনম্। কুষ্ঠাদিরোগশমনং মহাব্যাধি-বিনাশনম্। ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যমরোগী বলবান্ ভবেৎ। বহুনা কিমি-হোক্তেন যদ্‌যন্মনসি বর্ত্ততে। তত্তৎ সর্ব্বং ভবত্যেব কবচস্য চ ধারণাৎ॥ ভূত-প্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ। ব্রহ্মরাক্ষসবেতালা নৈব দ্রষ্টুমপি ক্ষমাঃ। দূরাদেব পলায়ন্তে তস্ত সংকীর্ত্তনাদপি॥' সপ্তমী সংক্রান্তি এবং রবিবার সূর্য্য-পূজার পক্ষে প্রশস্ত। রোগ, শোক এবং দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য লোকে সূর্য্যপূজা করিয়া থাকে। সেরূপ পূজা বঙ্গদেশে এবং উড়িষ্যায় প্রচলিত আছে। তবে সর্ব্ব রোগের উপশমকর্ত্তা সূর্য্যদেবের পূজোপলক্ষে বঙ্গদেশে কুত্রাপি জাতীয় উৎসব বা সম্মিলন হয় না। আজিও উড়িষ্যায় সূর্য্য-পূজার দিনে একটী বৃহৎ উৎসব হইয়া থাকে। কোণার্কের কথা কে না জানেন? যে মন্দিরের তক্ষণশিল্প আজিও বহু দূর দেশ হইতে কলাবিদ্যাবিশারদদিগকে উড়িষ্যায় আকৃষ্ট করিতেছে, তাহার খ্যাতি ভারতে সীমাবদ্ধ নয়। কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব দুর্ব্বাসার শাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন, এবং তাঁহার পিতার পরামর্শে মিত্রবনে চন্দ্রভাগানদীতটে সূর্য্যেরই আরাধনা করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করেন। ভবিষ্য পুরাণে এই উপাখ্যানের উল্লেখ আছে। শাম্বপুরাণ নামক উপপুরাণে এই আখ্যায়িকা সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। কোণার্কের নিকটবর্ত্তী চন্দ্রভাগা নামে একটী স্বল্প-তোয়া নদী ছিল। বর্ত্তমান কালে তাহার স্রোত সাগর-সৈকত-বালুকায় নিবদ্ধ হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। কেশরী রাজবংশীয় নরসিংহদেব এই নদীতীরে নয় শত শতাব্দীতে উড়িষ্যা রাজ্যের বার বৎসরের রাজস্ব ব্যয় করিয়া যে সূর্য্যের

মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহার শিল্পকলা আজিও দেশবিদেশের শিল্পবিদদিগকে চমৎকৃত করিতেছে। উড়িষ্যায় যে পাঁচটি প্রধান ক্ষেত্র আছে, অর্কক্ষেত্র বা কোণার্ক তাহার মধ্যে অন্যতম। শিল্পকলার দিক দিয়া দেখিলে পুরীর মন্দির অপেক্ষা কোণার্কের মন্দির অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। যদি উড়িষ্যার তক্ষণশিল্পের চরম বিকাশ দেখিতে চান, তাহা হইলে কোণার্কের ভগ্নাবশেষের প্রস্তর স্তূপ এক একটী মূর্ত্তি বা মন্দিরগাত্রের প্রস্তরের ভগ্নাবশেষ খুঁজিয়া দেখুন। এই মন্দিরের সন্নিকটে চন্দ্রভাগাতীরে মাঘী সপ্তমীর দিনে এখনও বহু-সংখ্যক নরনারী সমবেত হইয়া সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুরাণ, কপিল-সংহিতা, প্রাচীমাহাত্ম্য, এবং মাদলা পাঞ্জীতে চন্দ্রভাগা-স্নানের ফল বিবৃত হইয়াছে। এক সময় সমবেত নরনারী চন্দ্রভাগায় স্নান করিয়া শুদ্ধ-চিত্তে, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত মন্দিরস্থিত সূর্য্য দেবতার উপাসনা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত। কিন্তু কালক্রমে কোণার্কের মন্দির ভগ্ন-স্তূপে পরিণত হইয়াছে, এবং সূর্য্য দেবতার চারু সিংহাসন এখন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। এখন লোকে মন্দিরপার্শ্বস্থিত নবগ্রহমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। সংবৎসর নির্জ্জনে অবহেলায় পড়িয়া থাকিয়া নবগ্রহমূর্ত্তিরা মাঘী সপ্তমীর দিন শত শত ভক্তের স্তুতিগানে মুখরিত প্রান্তরের দিকে নির্নিমেশনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া যেন পূর্ব্বগরিমার স্পন্দনে প্রকৃতই উল্লসিত হন।

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥
দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্॥

ইত্যাদি স্তোত্রপাঠে নির্জ্জন প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠে। পাঁচ সাত ঘণ্টা-ব্যাপী সমাগমে যে ভক্তির তরঙ্গ উঠে, অম্বুনিধি সংবৎসরে নানা তরঙ্গভঙ্গে সে তরঙ্গের অনুকরণ করিতে পারে না। জনসাধারণের বিশ্বাস, অর্কক্ষেত্রে মাঘী সপ্তমীতে স্নান এবং সূর্য্যোদয় দর্শন করিলে সর্ব্ব প্রকার পাপমুক্ত হওয়া যায়, এবং তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হয়। মাঘী সপ্তমীতে অর্কক্ষেত্রে যে সূর্য্যপূজার বিধি আছে, তাহা কোণার্কে শিবপূজায় সমগ্র উড়িষ্যা দেশে, এমন কি গড়জাত মহলের অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশেও ঐ দিনং সূর্য্যের বিশেষ পূজা হইয়া থাকে। উড়িষ্যার বিষ্ণু এবং শিবের পূজায় যেরূপ অন্ন ভোগের ব্যবস্থা আছে, সূর্য্যপূজায়ও সেইরূপ অন্নভোগ হইয়া থাকে। সূর্য্যের কোনও

মূর্ত্তি পূজা দেখা যায় না। হরিদ্রাময় জল রাখিয়া সেই পাত্রটিকে একটি বেদীর উপর বসান হয়। সূর্য্যে যে প্রতিবিম্ব জলে প্রতিফলিত হয়, সেই প্রতিবিম্বকে উপলক্ষ্য করিয়া পূজা করা হয়। পরে খেচরান্ন এবং নানা প্রকার মিষ্টান্ন নিবেদন করা হয়। সূর্য্যের পূজায় মন্দার বা জবা ফুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই বিশেষ পূজা করিলে শরীর নীরোগ হয়, এবং ধনাগমের পথ সুপ্রশস্ত হয়। উড়িষ্যায় মাঘী সপ্তমীতে যে সূর্য্যের বিশেষ পূজার প্রচলন আছে, তাহা অনেকেই জানেন না। তাঁহারা মনে করেন, উড়িষ্যার কোনও রাজা উৎকটব্যাধিমুক্ত হইয়া বা অন্য কোনও বিশেষ দায় হইতে উদ্ধার পাইয়া প্রতিশ্রুতির প্রতিদানস্বরূপ বহু অর্থব্যয়ে কোণার্কের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অথবা, কেশরীবংশে কোনও এক রাজা দৈবযোগে সূর্য্যোপাসক হইয়াছিলেন বলিয়া অর্ক-ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এরূপ ধারণা একান্ত ভ্রান্তিমূলক। কারণ, নিরবচ্ছিন্ন সূর্য্যোপাসক বা বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া কোনও হিন্দু সম্প্রদায় ছিল না। যাজপুরের শাক্তক্ষেত্রে, দর্পণের গাণপত্য ক্ষেত্রে, পুরীর বৈষ্ণবক্ষেত্রে, ভুবনেশ্বরের শৈবক্ষেত্রে, এবং কোণার্কের সূর্য্যক্ষেত্রে অন্যান্য দেবদেবী বহু কাল হইতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। শৈবরাজগণ ভুবনেশ্বরের শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা যে শক্তি কিংবা বিষ্ণুর অনাদর করিতেন, এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুত বিশ্বস্বরূপ তাঁহার 'কোণার্ক' নামক গ্রন্থে অর্কক্ষেত্রে যে সকল দেবদেবী পূজা পাইতেন, তাহার তালিকা দিয়াছেন। সূর্য্য এবং নবগ্রহ ভিন্ন মায়াদেবী, বামদেব, অষ্টশম্ভু, অষ্টচণ্ডী, এবং অরুণ অর্কক্ষেত্রে পূজিত হইতেন, এবং মাদলা পাঞ্জীতে তাঁহাদিগের ভোগের পরিমাণ পর্য্যন্ত উল্লিখিত আছে। অর্কক্ষেত্রে মাঘী সপ্তমীতে যে মেলা বসে, তাহা যদি সর্ব্বপ্রথমে রাজার আহ্বানে বসিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রায় সমগ্র উড়িষ্যায় মাঘী সপ্তমীতে সূর্য্যের উৎসব কিরূপে এখনও চলিয়া আসিতে পারে, তাহার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, শক্তি বিষ্ণু এবং শিবের উপাসনার সহিত বহু কাল হইতে সূর্য্যের উপাসনা এ দেশে চলিয়া আসিতেছে। যে সময় কোণার্কের মন্দির হয়, তখন সূর্য্য প্রধান দেবতা বলিয়া গণ্য হইতেন। সেই জন্যই নৃসিংহ দেব বহু ব্যয় করিয়া সূর্য্যের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে সূর্য্যপূজার প্রচলন কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশে সূর্য্যপূজা যেরূপ লোপ পাইয়াছে, উড়িষ্যায় আজিও সেরূপ হয় নাই। পূর্ব্বের চালচলন এখনও উড়িষ্যার কোনও কোনও স্থানে রক্ষিত

হইয়াছে, তাই অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে উড়িষ্যার বন জঙ্গলে অনেক লুপ্তরত্ন লুকায়িত রহিয়াছে। তাহাদিগের পুনরুদ্ধার করিলে ইতিহাসের ধারা প্রকাশিত হইবে।* এবং সেই ধারার অবলম্বনে বঙ্গদেশের কেন, সমগ্র ভারতের পূর্ব্ব-গাথা গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। মাঘী সপ্তমীতে যাঁহারা বিধিমত সূর্য্যের পূজা করিতে না পারেন, তাঁহারাও এক প্রকার উৎসব করিয়া থাকেন। প্রত্যুষে প্রাতঃস্নান করিয়া নদী কিংবা পুষ্করিণীর তীরে সাত মুষ্টি বালি দিয়া সাতটি ছোট ছোট মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর অপামার্গের শীর্ষ এবং নানা পুষ্প দিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে পূজা করা হয়। সূর্য্যপূজার পর বাড়ী বাড়ী ভূরি ভোজনের আয়োজন হয়। মাঘী সপ্তমী উড়িষ্যায় বালকবালিকাদিগের একটী আনন্দের দিন।

পৌষ মাসের শুক্লাদশমীর দিন সূর্য্যের আর একটী বিশেষ পূজা হইয়া থাকে। এই পূজা উৎকলে প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই হইয়া থাকে। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় হরিদ্রামিশ্রিত জলে সূর্য্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই প্রতিবিম্বের কোনও কোনও স্থানে পূজা হইয়া থাকে। আবার শালগ্রাম বা সূর্য্যনারায়ণকে বসাইয়া এই পূজা করিবারও বিধি আছে। সর্ষপ পুষ্প এই পূজার প্রধান উপাদান। পূজান্তে 'কাকরা', 'চকুলী' প্রভৃতি নানা প্রকার পিষ্টক, মিষ্টান্ন, এবং খিচুড়া সূর্য্যদেবতাকে নিবেদন করা হয়। এই উৎসবের নাম শম্বর-দশমী। প্রবাদ আছে, শম্বর নামে এক অসুরকে সূর্য্য পরাস্ত করিয়া নিহত করেন। মৃত্যুকালে অসুর এই বর চাহিয়াছিল যে, বৎসরের মধ্যে একদিন সূর্য্যপূজার সহিত অসুরের নাম সংশ্লিষ্ট থাকে। তাই পৌষ মাসের শুক্লাদশমীর উৎসবের নাম শম্বর-দশমী। এই পূজায় শম্বরাসুরকে ভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে। পুরাণে শম্বরাসুরের নাম আছে। কিন্তু সূর্য্য যে তাহাকে বধ করিয়াছিলেন, এ কথার উল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন বা মদন শম্বরাসুরের নিহন্তা হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শম্বরাসুর সে কথা জানিতে পারিয়া সূতিকাগৃহ হইতে প্রদ্যুম্নকে চুরী করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। বিধির নির্ব্বন্ধে এক মৎস্য তাঁহাকে গিলিয়া ফেলে, এবং সেই মৎস্যের উদরে প্রদ্যুম্ন বাঁচিয়া থাকেন। পরে মৎস্য ধৃত হইয়া শম্বরের গৃহে নীত হয়। রতিদেবী মায়াবতী নামে অসুরের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি মৎস্যোদরে পতিকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অতি যত্নে লালন পালন করেন, এবং সমস্ত আসুরিক মায়া শিক্ষা দেন। অনন্তর প্রদ্যুম্ন ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে মায়াবতী তাঁহাকে তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। তখন প্রদ্যুম্ন শম্বরের প্রাণনাশ করেন। অতএব

দেখা যাইতেছে, পৌরাণিক আখ্যানের সহিত লৌকিক প্রবাদের বিশেষ অমিল আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ ও জাম্ববতীর পুত্র শাম্ব উৎকটরোগগ্রস্ত হইয়া সূর্য্যের প্রসাদে রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশাম্বর পুরাণে রোগোপনয়ন-পরিচ্ছেদে ইহা স্পষ্ট লেখা আছে, যথা :—

> এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ।
> আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তরধীয়তে॥
> শাম্বোপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনম্।
> পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাংস্তস্মাদ্রোগাদ্বিমুক্তবান্॥

আমার মনে হয়, লোকমুখে শাম্বদশমী—শম্বর-দশমী হইয়াছে। আর, লোকমত দেবাসুরের দ্বন্দ্বেই দেবতার শৌর্য্যবীর্য্যের প্রমাণ খুঁজিয়া থাকে। আর, শম্বরাসুরের নিহন্তা প্রদ্যুম্নের নাম অল্প লোকেই জানে, তাই উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া সূর্য্যপূজার সহিত শম্বরাসুরের বধ মিলাইয়া দিয়াছে।

রবিনারায়ণ বা সূর্য্যনারায়ণ ব্রত বলিয়া একটী ব্রত আছে। সধবা স্ত্রীলোকেরাই এই ব্রত করিয়া থাকেন। বৎসরের মধ্যে যে কোনও রবিবারে একাদশী পড়িলে এই ব্রত হয়। ব্রতের দিন সধবা স্ত্রীলোকেরা উপবাস করিয়া থাকেন। সূর্য্যাস্তের সময় পূজা আরম্ভ হয়। চাল ভাজা চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত চিনি দধি সর এবং ছানা মিশ্রিত করিয়া সাতটী লাড়ু তৈয়ার করা হয়। এই সাতটী লাড়ু এবং অন্যান্য উপকরণ সূর্য্যকে নিবেদন করিয়া স্ত্রীলোকেরা অর্ঘ্য প্রদান করেন। পরে এই সাতটী লাড়ুর মধ্যে দুইটী লাড়ু খাইয়া তাঁহারা রাত কাটান। বাকী পাঁচটী লাড়ু নদী কিংবা পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন দিতে হয়। অন্যান্য মিষ্টান্ন ভোগ উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। রবিনারায়ণ ব্রত করিলে সন্তান সন্ততির মঙ্গল হয়। রবিনারায়ণ ব্রত উৎকলের অনেক কুলললনা করিয়া থাকেন। আমি যতদূর জানি, বঙ্গদেশে এরূপ কোনও ব্রত নাই। নারায়ণ বা বিষ্ণুর পূজা বোধ হয় সূর্য্যপূজা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার প্রমাণ বিষ্ণুর ধ্যানে আছে। বিষ্ণুর ধ্যানে সূর্য্য-মণ্ডলবর্ত্তী পুরুষের উল্লেখ আছে।

> ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
> কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সূর্য্যদেবতা বোধ হয় কালক্রমে জগৎপালক নারায়ণ

রূপে পরিচিত হন। প্রত্যেক পূজার প্রথমে গণেশের পূজা করিতে হয়। তার পর সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার পূজা করিলে পূজক পূজার অধিকারী হন।

"গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাং।
সম্পূজ্য দেবষট্কঞ্চ সোঽধিকারী চ পূজনে॥

সূর্য্যপূজা হইতে যে বিষ্ণুপূজার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সেই সকল প্রমাণ এখানে দেখাইবার আবশ্যক নাই। প্রত্যেক পূজার প্রথমে যে ছয়টী দেবতার পূজার বিধি আছে, তাঁহারাই বোধ হয় আর্য্য-দিগের পুরাতন দেবতা। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া কোনও পূজা সুসম্পন্ন হইতে পারে না। তবে যে সকল নূতন দেবতা আমাদিগের পূজা পাইতেছেন, তাঁহারাই এখন প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু নূতনের উপাসনায় আমরা পুরাতনকে ভুলি নাই। আমাদিগের পূজাপদ্ধতিতেও বোধ হয় একটী ঐতিহাসিক ধারা আছে। আজ কাল আমরা সে ধারাটী ভুলিয়া যাইতেছি। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম পরম্পরাবিহীন নয়। সকল বিষয়েই পুরাতনের সূত্র আছে। কোন কর্ম্মই বিচ্ছিন্ন বা অসংবদ্ধ নহে।

সূর্য্যের পূজা যে এক সময়ে উড়িষ্যায় অতিপ্রচলিত ছিল, তাহার আর একটী নিদর্শন আছে। এ দেশে শবর বলিয়া একটী জাতি আছে। তাহারা আচারে ব্যবহারে বর্ব্বর জাতির শ্রেণীভুক্ত। লোকে তাহাদিগের হাতে জল পর্য্যন্ত খায় না। কিন্তু এই বর্ব্বর জাতির মধ্যেও সূর্য্যপূজা বহু কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। শবরগণ আজ কাল চাষ করিয়া থাকে। কিন্তু মৃগয়া তাহাদিগের জাতিগত ব্যবসায়। আজিও বহুসংখ্যক শবর উড়িষ্যার বন জঙ্গলে মৃগয়ার দ্বারা জীবনধারণ করিতেছে। সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতির মত শবরগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সত্যনিষ্ঠ। তাহারা মিথ্যাচার জানে না। লোক-দেখান হিসাবে কোনও কাজ করিতে পারে না। কোথা হইতে তাহারা সূর্য্যের পূজা শিক্ষা করে, তাহা বলা কঠিন; তবে আজ কাল সূর্য্যের পূজা ত সচরাচর দেখা যায় না। আর বনজঙ্গলে যে সকল শবর বাস করে, তাহারা এ দেশের উচ্চ জাতির সংস্পর্শে আসে না। কদাচিৎ গ্রামের ভিতরে আসে। আজ কাল যে সকল দেবতা সচরাচর পূজা পান, তাঁহাদিগকে শবরগণ মানে না। তবে শবরগণ কোথা হইতে সূর্য্যপূজা শিখিল? হয় ত সুদূর অতীতে উড়িষ্যায় সূর্য্যপূজার বিশেষ প্রচলন ছিল, এবং শবরগণ দেশব্যাপ্ত উপাসনার ছায়া অবলম্বন করিয়া নিজেদের ধর্ম্মজীবন গড়িয়া তুলিয়াছিল। অথবা জগৎপিতার

চক্ষুঃস্বরূপ সূর্য্যকে শবরগণ আদিকাল হইতেই পূজা করিয়া আসিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত উড়িষ্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু শবরকুল সে সকল ধর্ম্মমতের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পিতা প্রপিতামহের দেবতাকেই হৃদয়-সিংহাসনে জুড়িয়া রাখিয়াছে। পরে যাহা বলিব, তাহা হইতে দ্বিতীয় অনুমান যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কোনও অনার্য্যজাতি যে ঋগ্বেদের আমলে সূর্য্যো-পাসনা করিত, তাহার প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই না। মাঘ মাসের পূর্ণিমার দিন শবরগণ সূর্য্যের উৎসব করিয়া থাকে। ঐ দিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্ত্রী-পুরুষ, বালকবালিকা, সকলেই নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে ফল মূল অন্বেষণ করিতে যায়, এবং সেই ফল মূলের কিয়দংশ খাইয়া সে দিন কাটায়। সন্ধ্যার সময় শবর-পল্লীর রাস্তার উপর কাষ্ঠের স্তূপে অগ্নি সংযোগ করিয়া একটী বৃহৎ অগ্নিস্তম্ভ করা হয়। সকাল বেলায় যে সকল ফল মূল আহরণ করা হইয়াছিল, তাহা ঐ অগ্নি-স্তম্ভে সূর্য্যের নামে সমর্পণ করা হয়। শবরগণ হাত ধরাধরি করিয়া বৃত্তাকারে সেই প্রজ্জলিত অগ্নিস্তম্ভের চারি দিকে নৃত্য করে, এবং সূর্য্যকে সত্য নিরঞ্জন নামে সম্ভাষণ করিয়া তাহাদিগের ভাষায় নানা স্তবস্তুতি করিতে থাকে। এই মাঘী পূর্ণিমার উৎসবই শবরদিগের প্রধান পূজা। শবরদিগের বিশ্বাস, মাঘী পূর্ণিমার দিন সূর্য্যের পূজা করিলে সংবৎসর বন্য ফল মূলের অপ্রতুল হয় না এবং শবরপল্লী মহামারী প্রভৃতি দৈব দুর্ব্বিপাক হইতে রক্ষা পায়। বাহ্য পূজা-বাহুল্য না থাকিলেও সূর্য্যের প্রতি শবরদিগের আন্তরিক ভক্তি ও অনুরাগের অনেক লক্ষণ দেখা যায়। সূর্য্য-গ্রহণের সময় শবরগণ অত্যন্ত ভীত এবং ব্যথিত হয়। যে সত্যনিরঞ্জন সূর্য্য শবরপল্লীর একমাত্র সহায়, তাঁহার রাহুগ্রাসপীড়ায় সমগ্র শবরপল্লী মর্ম্মাহত হয়। গ্রহণের সময় তাহারা কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া একান্তমনে সূর্য্যের নিষ্কৃতি প্রার্থনা করে। গ্রীকদেশে এবং পূর্ব্ব কালের প্রায় সকল সমাজেই সূর্য্য-গ্রহণকে লোকে অমঙ্গলের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া মনে করিত। শবরগণ সূর্য্য-গ্রহণকে অমঙ্গলের নিদর্শন বলিয়া মনে করে না। তাহাদিগের প্রিয়দেবতা শত্রুর করাল গ্রাসে কবলিত হইয়া মর্ম্মপীড়া পাইতেছেন, এই ধারণায় তাহারা শোকে দুঃখে অধীর হইয়া পড়ে। গ্রহণের সময় অনেক সরলহৃদয়া শবরনারী অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। তাহাদিগের দুঃখ যে আন্তরিক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, তাহারা সভ্যতার ছলাকলা জানে না। হাসেন হুসেনের জন্য শিয়া সম্প্রদায়ের ধনিগণ মহরমের সময় ভাড়া করিয়া ক্রন্দনকারী গায়কদিগকে শোভাযাত্রায় বাহির করেন। হাসেন হুসেনের জন্য মহরমের সময় যে

অশ্রুধারা বহে, তাহার তুলনায় শবরদিগের অশ্রুধারা কেমন স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী!

উড়িষ্যার কন্দ নামক আর একটী অসভ্য জাতি আছে। উড়িষ্যার কন্দমাল এবং অন্যান্য গড়জাতে এই জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। গঞ্জামের অন্তর্গত ঘুমসর নামক স্থানে অনেক কন্দ আছে। এই কন্দজাতি কিছু দিন পূর্ব্বে বের পেন্নু বা পৃথ্বী দেবীর নিকট নরবলি দিত। ইংরাজরাজ বহু চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে নরবলি বন্ধ করিয়াছেন। এই কন্দজাতি বেল পেন্নু ও সুণ্ডীপেন্নু নামে সূর্য্য চন্দ্রকে পূজা করিয়া থাকে। কন্দদিগের সমস্ত দেবদেবীর পূজায় বলিদানের প্রথা আছে। কিন্তু সূর্য্যচন্দ্রের কোনও বিশেষ পূজার বিধি নাই। সূর্য্য বা চন্দ্রমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য কন্দগণ বলি প্রদান করে না। কিন্তু যে কোনও পূজা পার্ব্বণ বা উৎসবের পূর্ব্বে কন্দগণ প্রকাশ্যে সূর্য্যচন্দ্রমার স্তুতিবাদ করিয়া থাকে। হিন্দুর যে কোনও পূজারম্ভে যেরূপ সূর্য্যপূজার বিধি আছে, কন্দগণও সেইরূপ তাহাদিগের প্রত্যেক উৎসবে সূর্য্যের বন্দনা করিয়া থাকে।

'The sun and the moon are universally recognised as Deities by the Khonds, but no ceremonial worship is addressed to either. They are acknowledged by a simple reverence, which is paid to them when visible, upon every occasion of public solemnity whither religious or not.'—Lient Macpherson's Report upon the Khonds of the districts of Ganjam and Cuttack 1842.

সূর্য্যগ্রহণের দিন কন্দগণ পান ভোজন বন্ধ করে। দেবতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহারা সে দিন উৎসব বা সমারোহ করে না। কন্দগণ সূর্য্যকে সাক্ষী রাখিয়া সত্য গ্রহণ করে। এরূপ সত্যনিষ্ঠ জাতি আজ কাল একান্ত বিরল। লেফটেনেণ্ট ম্যাকফার্সন বলিয়াছেন যে, এমন কি, কন্দবালকগণও জাতীয় সত্য রক্ষা করিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না।

'In superiority to physical suffering the Khonds are surpassed by no people of whose manners that virtue has been the boast. In a period of suffering ranly paralelled, during which the people of Baramootah wasted for two months beneath famine, disease and the sword, no single Khond was found to falter in his devotion to the common cause and when at length the fathers of that tribe were betrayed and condemned to die with what admirable courage, what affecting resignation, what simple dignity, did they meet an ignominious fate on the sites of their ruined homesteads.'

সাঁওতালরা সবিতাকে সৃষ্টির আদি কারণ বলিয়া মনে করে। তাহারা সূর্য্যকে

সিং চান্দো এবং চন্দ্রকে নিন্দা চান্দো বলিয়া থাকে। সিং চান্দো এবং নিন্দা চান্দো সাঁওতালদিগের দেবতা। সাঁওতালেরা সৃষ্টি এবং প্রলয়ে বিশ্বাস করে। পূর্ব্বে [বোধ হয় সত্যযুগে] আকাশ পৃথিবীর অতি নিকটে ছিল। তখন ধানের শীষে চাল ফলিত, এবং শিমুল গাছে কাপড় ফলিত। পরিশ্রম করিয়া কায়ক্লেশে জীবনযাপন করিতে হইত না। কিন্তু লোকের অত্যাচারে যুগপরিবর্ত্তন হইল, এবং ঠাকুর জীবনযাত্রা কষ্টকর করিয়া তুলিলেন। তখন সিং চান্দো ও তাঁহার স্ত্রী নিন্দাচান্দো তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততি তারাগণকে লইয়া আকাশের এক স্থানে বিরাজ করিতেন। দিবা রাত্রি তারা ও চন্দ্রমা সূর্য্যের কাছে দেখা যাইত। লোকে বাড়ীর সামনে ময়লা ও এঁটো পাতা ফেলিতে লাগিল। কোনও কোনও সাঁওতাল-রমণী গরুর সেবা করিয়া গোবর-হাত শিমুলগাছের কাপড়ে মুছিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া সিং চান্দো তুষের আবরণ দিয়া চাউকে ঢাকিলেন; এবং শিমুল গাছে কাপড় ফলা বন্ধ করিলেন। তাহাতেও লোকের চৈতন্য হইল না। এক দিন সিং চন্দো মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তেজোমালা বিস্তার করিয়া জগৎ সংসার পুড়াইতে বসিলেন। তাঁহার স্ত্রী নিন্দাচান্দো অনেক মিনতি করিয়া একটী স্ত্রী এবং একটী পুরুষকে বাঁচাইলেন। তাহারাই বর্ত্তমান সাঁওতালদিগের আদি মিথুন। তাঁহাদিগের নাম পীলচু হারম ও পীলচু বুধি। সাঁওতালদিগের বিশ্বাস, সূর্য্য সমস্ত জীবের পাতা। তিনিই সকল জীবকে আহার দিয়া থাকেন। আর একটী মজার কথা বলিব। সাঁওতালরা পর-জন্মে বিশ্বাস করে। মৃত্যুর পর সুখ নাই। চান্দো দেবতা সদাসর্ব্বদা জীবাত্মা-দিগকে খাটাইয়া লন। যে সকল স্ত্রীলোকের পুত্রাদি হয় নাই, তাহাদিগকে পরজন্মে সমস্ত দিন খাটিতে হয়। কিন্তু যে সকল স্ত্রীলোক পুত্রাদি রাখিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে স্তন্যদান করিবার জন্য মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহজন্মে যাহাদিগের দোক্তা পাতা খাওয়া অভ্যাস, তাহারাও কাজের মাঝে দোক্তা খাইবার জন্য অবসর পায়। কিন্তু ধূম্রপায়ীর অবসর নাই। মেয়ে মানুষ মরিলে চুরণী হয়। সেই সকল চুরণীর হাতে পড়িলে আর নিস্তার নাই। মেয়ে মানুষ মরিলে তাহাদিগের পায়ে লোহার শলাকা মারিয়া দেওয়া হয়। ঐরূপ শলাকা মারিয়া দিলে ভূত হইয়াও তাহারা অতি ধীরে চলাফেরা করে। দৈবযোগে কোনও লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে চুরণী তাহাকে দৌড়িয়া ধরিতে পারে না। [Legends and customary beliefs of the Santals, Folklore of the Santal Parganas by C. H. Bompas, page

401.—17] চান্দো দেবতা ইহলোক এবং পরলোক আরত্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা, এবং জগতের মালিক।

উৎকলে একটী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আছে, তাহার নাম কুম্ভিপটুয়া, বা অলেখ-ধর্ম্মী। এই সম্প্রদায়ের সাধুরা কুম্ভি নামক বৃক্ষের ছাল বা পটুয়া পরিধান করেন বলিয়া তাঁহাদিগের নাম কুম্ভিপটুয়া হইয়াছে। তাঁহাদিগের সংখ্যা কত, তাহা নির্ণীত হয় নাই। তবে যত দূর জানা যায়, তাঁহাদিগের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ঢেঙ্কানল নামক করদরাজ্যের অন্তর্গত জারিনা নামক স্থানে তাঁহাদিগের প্রধান আড্ডা। এই সম্প্রদায়ের একটী নিয়ম এই যে, প্রত্যেক ব্রহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া স্নানাদিসমাপনান্তে সূর্য্যের স্তব করেন। সূর্য্যাস্তের পর এই সম্প্রদায়ভুক্ত কেহই পান ভোজন করেন না। এই সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীরা হিন্দুর দেব দেবতার, এমন কি, জগন্নাথ মহাপ্রভুরও প্রসাদ গ্রহণ করেন না। কোনও গৃহস্থের বাটীতে ভিক্ষালব্ধ আহারীয় পাইলে রাস্তায় বাহির হইয়া তাহা ভক্ষণ করেন। সন্ন্যাসীদিগের মস্তকে তালপত্রের বড় পাখাকে ভাঁজ করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ এক প্রকার ছত্র থাকে, এবং হস্তে কমণ্ডলু ও বিশাল যষ্টি থাকে।

বেণী ঘড়ি রাত আউ স্নান করুথিবে।
উদে অস্ত রবিবিম্ব দর্শন করিবে॥
অস্তবেলে সেহি পরি দণ্ডমাত্র খাই।
নমস্কার করুথিবে অস্তগিরি ধ্যাই॥
অগ্নি দেবতাকু কিছি অল্পে মানুথিবে।
অন্য দেব দেবী কেহি কিছিন মানিবে॥—যশমতী মালিকা।

অনেকে বলেন, অলেখ ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের শাখামাত্র। বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে সূর্য্য ও অগ্নিদেবের পূজার প্রচলন ছিল। ললিতবিস্তর নামক গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ হিন্দু দেবতার মধ্যে সূর্য্য এবং অগ্নিকে সমধিক ভক্তি করিতেন। বৌদ্ধভাবাপন্ন অলেখধর্ম্মীরাও সূর্য্য এবং অগ্নির উপাসনা করেন, অন্য কোনও দেবতাকে মানেন না। যশমতী মালিকায় অলেখ-সম্প্রদায়ের যে সকল নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে, তাহা বৌদ্ধসঙ্ঘের নিয়মাবলীর অনুরূপ।

| | |
|---|---|
| স্বজাতি যে কুলধর্ম্ম সমস্ত ছাড়িবে। | জম্বুদ্বীপে মহিমাক বীজ সে বুনিবে। |
| হোমকর্ম্ম যাগ ক্রিয়া সকল ত্যজিবে॥ | নিজ ব্রহ্ম গুরুপদে আনন্দ লভিবে॥ |
| দানাহুত বিভব্রত ক্রিয়া ত্যাজ্য করি। | অনাকার মহিমা নামকু করি শিক্ষা। |
| কুম্ভিপট পিন্ধি শিরে বিবে প্রভাধরি। | নব পুত্র ঘরে মাগি খেলুথিবে ভিক্ষা॥ |

তেলী তন্তী ভাট কেয়া রজক কুলারক। নব শূদ্র ঘরে অন্ন ভিক্ষাকু ভুজিবে।
ব্রহ্ম ক্ষেত্রী চণ্ডাল যে অবুরিলা পিক॥ নগর বাহারে কাল নিদ্রাকু কাটিবে॥
এহি নব জাতি ঘরে ভিক্ষা ন ঘেনিবে। দিবসরে নিদ্রাকলে কাল করে বাস।
অশুদ্ধ এমানে শাস্ত্রে লেখিয়ছি পূর্ব্বে॥ রাত্রে অন্নভোজন আহারে হয় দোষ॥
এমানে অটন্তি অধা জন্মর জাতকি। প্রভুঙ্কর ভক্ত যে দিবসে ভুঞ্জিবে।
তেনু করি নব শূদ্রে বাছিরখিছন্তি॥ রাত্রে উপবনে যমকালকু জগিবে॥
নব শূদ্র অটন্তি প্রভুঙ্ক নিজ দাস। নিশি উজাগরে রহি ধূনি কি জানিবু।
তাঙ্ক ঘরে অন্নভিক্ষা ন লাগই দোষ॥ পক্ষিণ প্রকৃতি তেবে পাংশ করিবু॥
মহা প্রকাতেজরে যে হই যাই ভস্ম। জপ নাহি তপ নাহি উদাসী ভাবরে।
শূদ্র ঘরে ভিক্ষা কলে নাহি তাঙ্ক দ্রব্য॥ একা মহিমাকু নাম জপিবু হৃদয়রে॥

উড়িষ্যায় সূর্য্যপূজার যে সকল প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা প্রবন্ধে লিখিলাম। তবে এ প্রবন্ধকে কোনওক্রমে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান সূর্য্য-পূজার বিধি, মন্ত্র ও উপকথা সংগ্রহ করিতে হইলে বহু পরিশ্রম আবশ্যক। এ কাজ কোনও ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সম্ভবপর হইবে না। গবেষণার প্রসার বাড়াইতে হইলে লোকবল আবশ্যক।

শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায়।

---

# মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

তত্ত্ববোধিনী। শ্রাবণ।—'তব নামে' সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি ব্রহ্মসঙ্গীত।—বিশেষত্ব নাই। ক্ষিতীন্দ্রবাবুর 'ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন' সাম্প্রদায়িক সন্দর্ভ। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দত্তের 'প্রার্থনা' 'তব নামে'র জুড়ীদার। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের 'পরমেশ্বর বিশ্বরক্ষকে'র ও 'ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী'র অনুবাদ দিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরের মারাঠী অনুবাদ ও তাহার ব্যাখ্যার অনুবাদ। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের 'পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী' নামক প্রবন্ধের নামকরণে মৌলিকতা আছে। প্রসন্নবাবুর 'পণ্ডিত' বিশেষণটি সম্পূর্ণ মৌলিক। প্রসন্নবাবু 'বিদ্বান' ছিলেন, তাঁহার 'পণ্ডা'রও অভাব ছিল না, তাহা কে অস্বীকার করিবে? মন্মথবাবু'ও কি সেই অর্থে 'পণ্ডিত' ব্যবহার করিয়াছেন? অথবা সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন বলিয়া অগত্যা তিনি 'পণ্ডিত' হইলেন? আমরা জানিতাম, তিনি ইংরেজীনবীশ ছিলেন। বাবু রসময় দত্তও কিছু কাল সংস্কৃত কলেজে কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। তিনিও কি 'পণ্ডিত'? অথবা, মন্মথবাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব পরিচয় দিবার জন্যই কলম ধরিয়াছেন? মন্মথবাবু আদিশূরের আমোল হইতে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণের 'কাহিনী' আরম্ভ করিয়াছেন। দশরথের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ সুরেশ্বর উড়িষ্যায় দেওয়ান বা শাসনকর্ত্তা

নিযুক্ত হন। জীবনচরিত-কার এই অপূর্ব্ব ইতিহাসের ঐতিহাসিক প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিলেন না কেন? জাতির পক্ষে তাহা যে আবশ্যক। 'তত্ত্ববোধিনী'তে এবার 'Worship' নামক একটি ইংরেজী প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাও নূতন। অনুবাদ দিলে ভাল হইত না? 'বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত গীতা-রহস্য—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ' চলিতেছে।

ভারতী। শ্রাবণ।—শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রের 'রূপম্' নামক পত্রে প্রকাশিত, শ্রীঅক্ষয়-কুমার মৈত্রের কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষায় রচিত 'বিষ্ণুবাহন গরুড়' নামক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীঅশীতিপর শর্ম্মা 'বিকর্ণ কি শণ্টাকর্ণ' প্রবন্ধে যে রসের উদ্গার করিয়াছেন, তাহা ভদ্রসমাজের অযোগ্য। আমাদের তাহা ঘাঁটিবার প্রবৃত্তি নাই। পরের ধর্ম্মকে গালি দিতে নাই, সভ্য-সমাজে এই ধরণের একটা অনুশাসন ছিল। 'অশীতিপর শর্ম্মা' তাহাও ভুলিয়াছেন। এ যুগেও যাহারা অন্যের ধর্ম্মকে আক্রমণ করে, তাহারা কৃপার পাত্র। তাহাদের বেয়াদবীর উত্তর সম্মার্জ্জনী নয়, চাবুক নয়,—পাদুকা। 'অশীতিপর শর্ম্মা' লিখিয়াছেন,—'নবকুমার কোম্পানির এই একটা বিশেষ বাহাদুরির লক্ষণ সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে তাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান করেন না, সত্যেরই নাকি সম্মান করে থাকেন।' বাপ-পিতামহ একটা প্রকাণ্ড সত্য, এবং সেই পরিচয়ে নিজের পরিচয়, আশা করি, 'নবকুমার কোম্পানীরা'ও তাহা অস্বীকার করিবেন না! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই 'সত্যে'র দালালেরা ইতরের ভাষায় প্রতিপক্ষকে গালি দিবার সময় এই 'পরম সত্য'টাই গোপন করেন। কেহ অশীতিপর শর্ম্মা, কেহ গোস্বামী, ইত্যাদি খোলস পরেন। তাহাতে 'সত্য' কি বড় উজ্জ্বল হইয়া উঠে? যাহারা আপনার পরিচয়ের সত্যটুকু সূর্য্যালোকে প্রকাশ করিতে পারে, তাহারা হনুমানের পূজক হইলেও, 'সত্য' তাহাদিগের প্রতি অপ্রসন্ন হইবেন না। কিন্তু যাহারা অসত্য-পরিচয়ে বংশ হইতে সত্যকে চিরনির্ব্বাসিত করিতেও কুণ্ঠিত—সঙ্কুচিত—লজ্জিত হয় না, তাহারা উপনিষদের বরপুত্র হইলেও মিথ্যার দাস, এই 'সত্য'টাও ত কোনও মতে অস্বীকার করা যায় না। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনের 'মিথের ইতিহাসে শিবাজী ও আফজল খাঁ' উল্লেখযোগ্য।

পল্লী-বাণী। শ্রাবণ।—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীনিখিলনাথ রায় মহাশয় 'পল্লী-বাণী'র সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'পল্লী-বাণী'তে তাহার কোনও লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি না। এই সংখ্যার সাতটি কবিতা, একটি গান, একুনে আটটি 'কাব্যি' ও দুইটি গল্প ও দুইটি উপন্যাস আছে। কবিতায় ও গল্পেই 'পল্লী-বাণী' নিঃশেষিত হইয়াছে। কোনও রচনাতেই বিশেষত্ব নাই। অধিকাংশই জঞ্জালের মত। যেন পল্লীর খাদ ভরাট করিবার জন্যই ছাপা হইয়াছে। একটি প্রবন্ধ আছে,—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমাদের পল্লীকথা'। প্রবন্ধটি পড়িয়া বাইবেল মনে পড়িল,—'আদিতে বাক্য ছিল, সেই বাক্যই ঈশ্বর হইল।' সমস্ত প্রবন্ধটিই বাক্য—'শতভালিযুক্তা জীর্ণতরী' আছে; 'বীচিবিক্ষেপের স্পর্শসুখ' আছে; কিন্তু জানিবার কথা বড় বড় বাক্যেই আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। 'পল্লী-বাণী' নিখিল-বাবুকে বলিতে পারে,—

'উচল বলিয়া অচলে চড়িনু, পড়িনু অগাধ জলে!'

## গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা আগামী বর্ষে 'সাহিত্যে'র গ্রাহক থাকিতে না চান, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ২০শে চৈত্রের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে ভি, পি, পাঠাইতে নিষেধ না করিলে, আমরা ভি, পি, ডাকে 'সাহিত্যে'র প্রথম সংখ্যা প্রেরণ করিব। গ্রাহকগণ তিন টাকা এক আনা দিয়া গ্রাহক করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। মনিঅর্ডার করিলেও গ্রাহকদিগকে মাশুল দিতে হইত; সুতরাং ভি, পি, ডাকে মূল্য দিলে তাঁহাদের কোনও ক্ষতি নাই।

## 'বঙ্গদর্শন'—সম্পূর্ণ প্রথম বর্ষ।

যে সকল গ্রাহক 'বঙ্গদর্শন' লইবেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা অনুমতি দিলে আমরা 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বর্ষের মূল্যও 'সাহিত্যে'র মূল্যের সঙ্গে ভি, পি, ডাকে আদায় করিতে পারি। 'সাহিত্যে'র বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা, 'বঙ্গদর্শনে'র মূল্য ২৲ দুই টাকা ও ভি, পি মাশুল ৵০ দুই আনা, মোট পাঁচ টাকা দুই আনা দিয়া ভি, পি, লইবেন।

'বঙ্গদর্শন' ছাপা শেষ হইলে গ্রাহকদিগের নিকট বুকপোষ্টে প্রেরিত হইবে।

যে সকল পুরাতন ও নূতন গ্রাহক চৈত্র মাসের মধ্যে মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারাই ৩৲ তিন টাকা মূল্যে 'সাহিত্য' পাইবেন; পরে মূল্য বাড়িবে।

ম্যানেজার, 'সাহিত্য'।
২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর; কলিকাতা।

২৯শ ভাগ। চৈত্র; ১৩২৬। ১২শ সংখ্যা।

মাসিকপত্র ও সমালোচন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।



লেখকগণের নাম

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয়, শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, শ্রীপ্রিয়লাল দাস, শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সম্পাদক।

সূচী

# ডোয়ার্কি-এঁর

# বক্স হারমোনিয়ম।

বাজারে আমাদের অপেক্ষা সস্তা হারমোনিয়ম পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহা কি স্বরে বা স্থায়িত্বে আমাদের জিনিসের কাছেই আসে না।

আমাদের হারমোনিয়ম যাঁহারা ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই সন্তুষ্ট। আমাদের 'গ্রামোলা হারমোনিয়ম', জিনিস হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা।

মূল্য ৩ অক্টেভ, তিন ষ্টপ, ১ সেট রিড বাক্স সমেত মূল্য ২৪৲
ঐ ঐ ২ সেট রিড মূল্য ৩৬৲

ডোয়ার্কিন ফুলুট হারমোনিয়ম ৭৫৲ হইতে ২০০৲।

সচিত্র

## তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

# ডোয়ারকিন এণ্ড সন্স,

৮ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

---

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

---

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

# অতিথিগ্ব দিবোদাস।
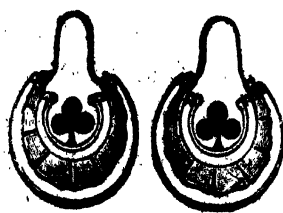
বৈদিক যুগে অতিথিগ্ব দিবোদাস নামে এক নরপতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষির ঋক হইতে জানা যায়, তিনি পুরু-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। (১) তাঁহার পিতার নাম বধ্র্যশ্ব ছিল, ইহা ভরদ্বাজ ঋষি-রচিত এক ঋকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২) সম্ভবতঃ হবির্দাতা বধ্র্যশ্ব সরস্বতীতীরে বাস করিতেন; এই জন্য সরস্বতী তাঁহাকে ঋণমোচনকারী, বলবান দিবোদাস-রূপ পুত্ররত্ন প্রদান করিয়াছিলেন, ভরদ্বাজের ঋকে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি অতিথিবৎসল ছিলেন বলিয়া, বোধ হয়, অতিথিগ্ব উপাধি প্রাপ্ত হন। পর্ণয়, করঞ্জ, বর্চি ও শম্বর নামক দস্যুজাতীয় রাজার পুর তিনি জয় করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শম্বর দাসের ৯৯ পুরের জয় বৈদিক কালে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। বৈদিক ঋষিগণ শম্বর-জয়ের যশোগানে ঋগ্বেদ মুখরিত করিয়াছেন। ভরদ্বাজ (৩) ও তাঁহার পুত্র গর্গ (৪), বশিষ্ঠ (৫), বিশ্বামিত্র (৬), গৃৎসমদ (৭), বামদেব (৮), কুৎস (৯) প্রভৃতি

---

(১) ভিনৎ। পুরঃ। নবতিং। ইন্দ্র। পূরবে। দিবোদাসায়।—১।১৩০।৭

হে ইন্দ্র! পুরুবংশীয় দিবোদাসের নিমিত্ত নবতিসংখ্যক পুর ভগ্ন করিয়াছ। [দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষির রচিত।]

(২) ইয়ং। অদদাৎ। রভসাং। ঋণচ্যুতম্। দিবোদাসম্। বধ্র্যশ্বায়। দাশুষে॥—৬।৬১।১

ইনি (অর্থাৎ সরস্বতী নদী) হবির্দাতা বধ্র্যশ্বকে বলবান, ঋণমোচনকারী দিবোদাসকে দান করিয়াছেন।

* ১।৫৩।৮, ২।১৪।৬, ৭।৯৯।৫, ১০।৪৮।৮

(৩) যস্য। ত্যৎ। শম্বরং। মদে। দিবোদাসায়। রন্ধয়ঃ।
অয়ং। সঃ। সোমঃ। ইন্দ্র। তে। সুতঃ। পিব॥—৬।৪৩।১

(৪) পুরুণি। যঃ। চ্যৌত্না। শম্বরস্য। বি। নবতিং। নব। দেহ্যঃ। হন্॥—৬।৪৭।২

যিনি শম্বরের অনেক বল ও ৯৯ পুরী নষ্ট করিয়াছেন।

(৫) ইন্দ্রাবিষ্ণূ। দৃংহিতাঃ। শম্বরস্য। নব। পুরঃ। নবতিং। চ। শ্নথিষ্টম্।
শতং। বর্চিনঃ। সহস্রং। চ। সাকম্। হথঃ। অপ্রতি। অসুরস্য। বীরান্॥৭।৯৯।৫

(৬) যে। ত্বা। অহিহত্যে। মঘবন্। অবর্ধন্। যে। শাম্বরে।—৩।৪৭।৪

(৭) দিবোদাসায়। নবতিং। চ। নব। ইন্দ্রঃ। পুরঃ। বি। ঐরৎ। শম্বরস্য।—২।১৯।৬

(৮) অহম্। পুরঃ। মন্দসানঃ। বি। ঐরম্। নব। সাকম্। নবতীঃ। শম্বরস্য।
শততমং। বেশ্যং। সর্বতাতা। দিবোদাসম্। অতিথিগ্বং। যৎ। আবম্॥—৪।২৬।৩

(৯) যাভিঃ। মহাং। অতিথিগ্বং। কশোজুবম্। দিবোদাসং। শম্বরহত্যে। আবতম্॥
—১।১১২।১৪

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঋষিগণ শম্বর-বিজয়ের উল্লেখ করিয়া ঋক্ রচনা করিয়াছেন। কতকগুলি ঋক্ হইতে জানা যায় যে, ভরদ্বাজ, অথর্ব তৎপুত্র দধীচি ও ভরত ঋষি দিবোদাসের একটী যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন (১)। উদ্ধৃত ঋক্‌গুলির প্রতি পাঠকদিগকে বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে বলি। দেখা যাইতেছে, এই ঋক্‌গুলি একই সূক্তের অন্তর্গত। তাহা হইলে কোনও একটী যজ্ঞের জন্য যে ইহা রচিত হইয়াছিল, তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকে না। এই সূক্তটী যে ভরদ্বাজ ঋষির বিরচিত, তাহার প্রমাণ ৫ম ঋকে বর্ত্তমান। চতুর্থ ঋকে ভরদ্বাজ বলিতেছেন :— 'ত্বাং। ঈড়ে। অধ। দ্বিতা। ভরতঃ। বাজিভিঃ শুনম্' ॥—'অনন্তর দুই ভাগে বিভক্ত তোমাকে (অর্থাৎ অগ্নিকে) ভরত হবিঃ-রূপ অন্ন দ্বারা সুখে স্তব করিয়াছেন।' অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই যজ্ঞে ভরত ঋষি উপস্থিত ছিলেন। পাঠক মনে রাখিবেন, একটী যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সাত জন হোতার আবশ্যক হইত। এই সাত জনের মধ্যে চার জন প্রধান। তাঁহাদিগকে অধ্বর্যু, হোতা, ব্রহ্মা ও উদ্‌গাতা বলা হইত। ভরত ঋষি কুশিক-বংশ-জাত এক জন প্রসিদ্ধ ঋষি। সায়ণের মতে, ভরত দুষ্মন্তের পুত্র। ঋগ্বেদে দুষ্মন্তের নাম পাওয়া যায় না, কিন্তু ভরত ঋষির নাম আছে। এই যজ্ঞে দিবোদাস সোমাভিষবকারী ও ভরদ্বাজ হবির্দাতা হইয়াছিলেন,৫ম ঋকে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩শ ও ১৪শ ঋকে অথর্বা ও তাঁহার পুত্র দধীচির নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এই যজ্ঞে অথর্বা অগ্নি মন্থন করেন, এবং দধীচি অগ্নিবেদিতে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, বর্ণিত হইয়াছে। অতএব কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না যে, দিবোদাসের যজ্ঞে এই

---

(১) ত্বং। ইমা। বার্যা। পুরু। দিবোদাসায়। সুন্বতে।
ভরদ্বাজায়। দাশুষে ॥—৬।১৬।৫

(হে অগ্নে!) তুমি এই সকল বরণীয় (ধন) সোমাভিষবকারী দিবোদাসকে, হবির্দাতা ভরদ্বাজকে (দান কর)।

ত্বাং। অগ্নে। পুষ্করাৎ। অধি। অথর্বা। নিঃ। অমন্থত:।
মূর্দ্ধ্নঃ। বিশ্বস্য। বাঘতঃ॥—৬।১৬।১৩

হে অগ্নে! সকল বাহনের মস্তকস্বরূপ পুষ্কর হইতে তোমাকে অথর্বা মন্থন করিয়াছেন।

। উঁ। ত্বা। দধ্যঙ্। ঋষিঃ। পুত্রঃ। ঈধে। অথর্বণঃ। বৃত্রহনং। পুরন্দরম্।—৬।১৬।১৪

অথর্বার পুত্র দধীচি ঋষি বৃত্রহন্তা, পুরবিদারণকারী সেই তোমাকে প্রজ্বালিত করিয়াছেন।

আ। অগ্নিঃ। অগামি। ভারতঃ। বৃত্রহা। পুরুচেতনঃ।
দিবোদাসস্য। সৎপতিঃ॥—৬।১৬।১৯

বৃত্রহননকারী, সর্ব্বজ্ঞ, সৎপতি দিবোদাসের ভারত অগ্নি আসিয়াছেন।

সকল প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন ঋষিগণ উপস্থিত ছিলেন না। যদ্যপি ইহাতেও কাহারও সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হয়, তবে আমরা ভরদ্বাজ-পুত্র গর্গের রচনা নিম্নে উদ্ধার করিয়া আমাদের মতের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছি। (১) ২২শ ও ২৩শ ঋকে অতিথিগ্ব দিবোদাসের নাম রহিয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে শাম্বর ধন ও দশটী হিরণ্যপিণ্ড ঋষি যে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। ২৪শ ঋকে ভরদ্বাজ-পুত্র পায়ু ও অথর্ব-বংশীয় ঋষিগণ একত্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া দশ রথ ও শত গো প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেখা যাইতেছে। অতএব ভরদ্বাজবংশীয় ঋষিগণ অথর্ব-বংশীয় ঋষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ করিতেন, ইহা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। এই যজ্ঞ শম্বর-জয়ের পর সাধিত হয়, দেখা যাইতেছে। তাহা হইলে, পূর্ব্বোল্লিখিত দিবোদাসের যজ্ঞে অথর্বা, দধীচি ও ভরত যে ভরদ্বাজের সহিত মিলিত হইয়া দিবোদাসের যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার অবসর থাকে না। আমরা দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষির বিরচিত নিম্নোদ্ধৃত ঋকের প্রতিও পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পাঠক দেখুন, ঋষি বলিতেছেন যে, তাঁহার জন্মের কথা দধীচি, প্রাচীন অঙ্গিরা, প্রিয়মেধ, কণ্ব, অত্রি ও মনু অবগত ছিলেন। (২) তিনি শম্বর-জয়ের ঋক্ও রচনা করিয়া-

(১) দিবোদাসাৎ। অতিথিগ্বস্য। রাধঃ।
শাম্বরং। বসু। প্রতি। অগ্রভীষ্ম ॥—৬।৪৭।২২
দশ। অশ্বান্। দশ। কোশান্। দশ। বস্ত্রা। অধি। ভোজনা।
দশো। হিরণ্যপিণ্ডান্। দিবোদাসাৎ। অসানিষম্ ॥—ঐ ২৩।
দশ। রথান্। প্রষ্টিমতঃ। শতং। গাঃ। অথর্বভ্যঃ।
অশ্বথঃ। পায়বে। অদাৎ ॥—৬।৪৭।২৪

অতিথিগ্বের অন্ন (ও) শম্বর-সম্বন্ধীয় ধন দিবোদাস হইতে গ্রহণ করিয়াছি। ২২
দশ অশ্ব, দশ কোশ, দশ বস্ত্র ভোজন দক্ষিণা। দিবোদাস হইতে দশ হিরণ্যপিণ্ড লাভ করিয়াছি। ২৩
প্রষ্টিযুক্ত দশ রথ, শত গো অথর্বদিগকে (ও) (ভরদ্বাজ-পুত্র) পায়ুকে অশ্বথ দিয়াছে। ২৪

(২) দধ্যঙ্। হ। মে। জনুষং। পূর্বঃ। অঙ্গিরাঃ। প্রিয়মেধঃ। কণ্বঃ।
অত্রিঃ। মনুঃ। বিদুঃ। তে। মে। পূর্বে। মনুঃ। বিদুঃ।
তেষাং। দেবেষু। আযতিঃ। অস্মাকম্। তেষু। নাভয়ঃ।
তেষাং। পদেন। মহি। আ। নমে। গিরা। ইন্দ্রাগ্নী। অনমে। গিরা ॥—১।১৩৯।৯

দধীচি, প্রাচীন অঙ্গিরা, প্রিয়মেধ, কণ্ব, অত্রি, মনু আমার জন্ম জানিতেন; তাঁহারা (ও) মনু আমার পিতা পিতামহকে জানিতেন। দেবতাদিগের মধ্যে তাঁহাদিগের সম্বন্ধ; তাঁহাদিগের

ছিলেন। (১) অতএব কেহ আর সন্দেহ করিতে পারেন না যে,দিবোদাসের যজ্ঞে দধীচি ও তাঁহার পিতা অথর্ব ঋষির উপস্থিতি অসম্ভব ছিল। সায়ণ যে ভাবে ঐ সকল ঋকের অর্থ করিয়াছেন, কোনরূপে তাহার সমর্থন করা যায় না। যে সকল ঘটনা সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ লোকে চাক্ষুষ দেখিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। ঐ সকল ঘটনা যে ইহলোকে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী ঋষিগণ ভুলিয়া গিয়া উহাদিগকে স্বর্গলোকের ব্যাপার-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই রূপে এক কালের ঘটনা পরবর্ত্তী কালে দেবকীর্ত্তিরূপে উপাখ্যানে পরিণত হয়। বৈদিক কালে এই পরিবর্ত্তন সত্বর সাধিত হইত। বৈদিক যুগে কোনও বীর যুদ্ধে জয় লাভ করিলে, সে কালের লোকে বিশ্বাস করিতেন, বিজয়ী বীরের হোতাদিগের আহ্বান ইন্দ্র, বরুণ ও মরুৎগণ সত্যই শ্রবণ করিয়া আগমন করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্য যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছে।

শম্বর-জয়ের সম্বন্ধে আরও কি কি তথ্য ঋগ্বেদ হইতে প্রাপ্ত হই, এক্ষণে আমরা তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। পরুচ্ছেপ ঋষি শম্বরের ৯০ পুর জয়ের কথা বলিয়াছেন, পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যান্য ঋষি ৯৯ পুর জয়ের উল্লেখ করেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শম্বর পর্ব্বতে লুক্কায়িত থাকে। তাহাকে চল্লিশ বৎসর পরে বাহির করিয়া সংহার করা হইয়াছিল, কোনও কোনও ঋষি ইহাও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। (২) শম্বর-হত্যা-কালে দিবোদাসও জলমগ্ন

মধ্যে আমাদিগের নাভি সকল ; তাঁহাদিগের মহৎ পদে স্তুতি দ্বারা নমস্কার করি ; ইন্দ্রাগ্নিকে স্তুতি দ্বারা নমস্কার করি।

(১) ভিনৎ। পুরঃ। নবতিং। ইন্দ্র। পূরবে। দিবোদাসায়।
মহি। দাশুষে। নৃতো। বজ্রেণ। দাশুষে। নৃতো।
অতিথিগ্বায়। শম্বরং। গিরেঃ। উগ্রঃ। অব। অভরৎ।
মহঃ। ধনানি। দয়মানঃ। ওজসা। বিশ্বা। ধনানি। ওজসা॥—১।১৩০।৭

পূরুবংশীয় দিবোদাসের নিমিত্ত, হে নর্ত্তনকারি! মহৎ দাতা (দিবোদাসের) নিমিত্ত, হে নর্ত্তনকারি! দাতা দিবোদাসের নিমিত্ত বজ্র দ্বারা নবতিসংখ্যক পুর ভগ্ন করিয়াছ ; উগ্র (ইন্দ্র) অতিথিগ্বকে শক্তি দ্বারা মহৎ ধন সকল, শক্তি দ্বারা বিশ্বধন সকল দান করিতে করিতে শম্বরকে গিরি হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছিলেন।

(২) যঃ। শম্বরং। পর্বতেষু। ক্ষিয়ন্তং। চত্বারিংশ্যাম্। শরদি। অন্বঅবিন্দৎ॥—২।১২।১১
যিনি (অর্থাৎ ইন্দ্র) পর্ব্বতে লুক্কায়িত হইয়া অবস্থিত শম্বরকে ৪০ বৎসর শেষে অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। [গৃৎসমদ-ঋষি-রচিত।]

হইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু ইন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করেন, অঙ্গিরার পুত্র কুৎস-ঋষি-রচিত ঋকে তাহা দেখিতে পাই। (১) শম্বর যে দেশে বাস করিত, তাহার নাম উদব্রজ, ইহা ভরদ্বাজ-পুত্র গর্গের রচিত ঋক্ হইতে জানা যায়। (২) শম্বরের প্রজাগণ 'অশ্মন্ময়ী' নামে অভিহিত হইয়াছে। (৩) ইহা হইতে মনে হয়, এই জাতি প্রস্তর দ্বারা পুরী ও অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ করিত।

বোধ হয়, আমরা পাঠকের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, দিবোদাস বৈদিক যুগের এক জন বীরপুরুষ ছিলেন; এবং শম্বর নামক দাস এই পৃথিবীতেই বাস করিত। এই দাসের ইহলোকের রাজ্য দিবোদাস জয় করেন। এক্ষণে আমাদের মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, শম্বর দাসের রাজ্য 'উদব্রজ' নামক দেশ কোথায় ছিল?—ভারতের মধ্যে, না বাহিরে? আমরা অনুমান করি, আরাবল্লী পর্ব্বতের নিকটস্থ ও আজমীরের অন্তর্গত শম্বর হ্রদই এই বেদ-প্রসিদ্ধ শম্বর দাসের নামে এখনও পরিচিত, এবং ঐ দেশকেই বৈদিক যুগে উদব্রজ বলা হইত। এই দেশে বহু হ্রদ বিদ্যমান আছে বলিয়া, মনে হয়, উহা এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার উত্তরে মৎস্য দেশ, এবং তাহারও উত্তরে যমুনাতীরে মথুরা। যে দেশের মধ্যে মথুরা ও বৃন্দাবন অবস্থিত, তাহা প্রাচীন কাল হইতে ব্রজ নামে প্রসিদ্ধ। (৪) বৈদিক যুগে যমুনা-তীরের গো বিখ্যাত ছিল। বোধ হয়, এই জন্যই ঐ দেশকে ব্রজ বলা হইত। মহাভারতের কালে আমরা এই দেশকে যদুবংশীয়দিগের বাস-স্থান-রূপে দেখিতে পাই। কৃষ্ণপ্রমুখ অনেক যাদব জরাসন্ধের ভয়ে এই দেশ হইতে পলায়ন করিয়া দ্বারকায় রাজ্যস্থাপন করেন।

---

অব। গিরেঃ। দাসম্। শম্বরং। হন্।

প্র। আবঃ। দিবোদাসম্। চিত্রাভিঃ। উতী।—৬।২৬।৫

গিরি হইতে দাস শম্বরকে (বাহির করিয়া) সংহার করিয়াছেন; দিবোদাসকে বিবিধ রক্ষা দ্বারা রক্ষা করিয়াছেন। [ভরদ্বাজ-ঋষি-রচিত।]

(১) শম্বর-হত্যা-কালে যে সকল (রক্ষার) দ্বারা জলমগ্ন মহান্ অতিথিগ্ব দিবোদাসকে রক্ষা করিয়াছিলে।—১।১১২।১৪ [পূর্ব্বে ঋক্ উদ্ধৃত হইয়াছে।]

(২) অহন্। দাসা। বৃষভঃ। বস্নয়ন্তা। উদব্রজে। বর্চিনং। শম্বরং। চ।

বৃষভ (ইন্দ্র) উদব্রজে বাসকারী বর্চি ও শম্বর (নামক) দাসদ্বয়কে বধ করিয়াছেন।

(৩) শতং। অশ্মন্ময়ীনাং। পুরাং। ইন্দ্রঃ। বি। আস্যৎ। দিবোদাসায়। দাশুষে।

—৪।৩০।২০

পাষাণময়ীদিগের শত পুর ইন্দ্র হবির্দাতা দিবোদাসকে প্রদান করিয়াছেন। [বামদেব-রচিত।]

(৪) ঋগ্বেদ—৫।৫৩।১৭

এক্ষণে দেখা যাউক্, ঋগ্বেদে আমাদের মতের সমর্থক কিছু পাওয়া যায় কি না। তুর্বশ ও যদু এই দুই নাম আমরা ঋগ্বেদের নানা স্থানে দেখিতে পাই। অগস্ত্য ও ভরদ্বাজ ঋষিদ্বয়ের ঋকে যদু ও তুর্বশ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) বামদেব ঋষির মতে, তুর্বশ ও যদু অনভিষিক্ত রাজা ছিলেন। (২) অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষির রচিত ঋক্ হইতে জানা যায়, যদু, তুর্বশ, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু, এই পাঁচটী প্রধান আর্য্য সম্প্রদায় ছিল। ইহারা ইন্দ্র ও অগ্নির উপাসক ছিল। (৩) বোধ হয়, এই সকল নামে ইহাদের রাজাদিগকেও বুঝাইত।

ভরদ্বাজ ঋষি একটী সূক্তে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইন্দ্র দেববানের পুত্রকে বৃচীবানের রাজ্য ও সৃঞ্জয়কে তুর্বশ প্রদান করিয়াছিলেন। (৪) ইহার সরল অর্থ এই যে, দেববানের পুত্র বৃচীবানদিগের, এবং সৃঞ্জয় তুর্বশদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। আমরা 'সুদাস' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, সুদাসের পিতা পিজবন দেববানের পুত্র। অতএব, ভরদ্বাজ ঋষি যে দেববানের পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই সুদাসের পিতা পিজবন। ভরদ্বাজের পুত্র গর্গ এক সৃঞ্জয়-পুত্রের যজ্ঞ করেন, এবং সেই যজ্ঞে দান গ্রহণ করেন। অতএব, এই দুই সঞ্জয় যে এক, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ভরদ্বাজ ও গর্গ ঋষি যে পিজবন ও সৃঞ্জয়ের সমসাময়িক, ইহাতে তাহা প্রমাণিত হইল। সুদাস প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে যে, তিনি যমুনাতীরে দশ জন অযাজ্ঞিক রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে অজ, শিগ্রু ও যক্ষুগণ যে তাঁহার সহায়তা করে, তাহা বসিষ্ঠ ঋষি একটী ঋকে প্রকাশ করিয়াছেন। (৫) তিনি আর এক ঋকে তুর্বশকে যক্ষু ও মৎস্যদিগের অগ্রণী বলিয়াছেন। (৬) ইহাতে, যক্ষুগণ যে মৎস্য দেশের অধিবাসী ছিল, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। ঋগ্বেদের

---

(১) প্র। যৎ। সমুদ্রং। অতি। শূর। পর্ষি।
পারয়। তুর্বশং। যদুং। স্বস্তি॥—১।১৭৪।৯ (অগস্ত্য); ৬।২০।১২ (ভরদ্বাজ)

হে শূর (ইন্দ্র)! যখন সমুদ্রকে অতিক্রম করিয়া (উদক) বিস্তৃত হইল, (তখন) তুর্বশ ও যদুকে সুমঙ্গলে পার করিয়াছিলে।

(২) উত। ত্যা। তুর্বশাযদূ। অস্নাতারা। শচীপতিঃ।
ইন্দ্রঃ। বিদ্বান্। অপারয়ৎ॥—৪।৩০।১৭

শচীপতি, বিদ্বান, ইন্দ্র সেই অনভিষিক্ত তুর্বশ যদুকে পার করিয়াছিলেন।

(৩) যৎ। ইন্দ্রাগ্নী। যদুষু। তুর্বশেষু। যৎ। দ্রুহ্যুষু। অনুষু। পুরুষু। স্থঃ।
অতঃ। পরি। বৃষণৌ। আ। হি। যাতং। অথ। সোমস্য। পিবতং। সুতং॥—১।১০৮।৮

(৪) ৬।২৭।৭ (৫) ৭।১৮।১৯ (৬) ৭।১৮।৬

সর্ব্বত্র তুর্বশ ও যদু নাম যুক্ত হইয়া বর্ত্তমান। অতএব তুর্বশের মৎস্য দেশে বাস সত্য হইলে, যদুদিগের বাস তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে হইবে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। যমুনাতীরে যদুদিগের বাস ছিল, মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। এই নিবাস ঋগ্বেদের যুগেই যে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অঙ্গিরার পুত্র অমহীয়ু ঋষি বলিয়াছেন যে, ইন্দ্র দিবোদাসকে প্রথমে শম্বরের পুর ও পরে তুর্বশ ও যদুদিগের রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। (১) সুদাসের পুরোহিত বসিষ্ঠ ঋষি একটী যজ্ঞে তুর্বশ যদুদিগকে অতিথিগ্বের অধীনে আনিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। (২) ভরদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেন, ইন্দ্র সৃঞ্জয়কে তুর্বশ প্রদান করেন। তাঁহার পুত্র গর্গ শম্বর-জয়ের পর দিবোদাস ও সৃঞ্জয়-পুত্রের যজ্ঞ করেন। ইহা হইতে অনুমান করি, সৃঞ্জয়ের মৃত্যুর পর তুর্বশগণ বল সংগ্রহ করিয়া সৃঞ্জয়-পুত্রের অধীনতা হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করে। তখন সৃঞ্জয়-পুত্র দিবোদাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুদাসের পিতা ও সৃঞ্জয়ের জয় একত্র উল্লিখিত হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে মিত্রতার অনুমান করি। সম্ভবতঃ এই কারণে মৎস্যদিগের অগ্রণী তুর্বশ ও আয়ুর পুত্র, দ্রুহ্যু, পুরু ও ভৃগুদিগের সহিত মিলিত হইয়া সুদাসের রাজ্য আক্রমণ করে, এবং পরুষ্ণী নদীর কূল ভেদ করিয়া দেয়। (৩) এই যুদ্ধে কিন্তু তৃৎসু সুদাস আয়ুর রাজ্য জয় করেন। (৪) দ্রুহ্যু ও ভৃগু জলমগ্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (৫)

---

(১) পুরঃ। সদ্যঃ। ইৎথা। ধিয়ে। দিবোদাসায়। শম্বরম্।
অধ। ত্যং। তুর্বশং। যদুম্॥—৯।৬১।২

সত্যকর্ম্মা দিবোদাসকে সদ্য শম্বরের পুর, অনন্তর সেই তুর্বশ যদুকে (দিয়াছিলেন)।

(২) নি। তুর্বশং। নি। যাদ্বং। শিশীহি
অতিথিগ্বয়ে। শংস্যং। করিষ্যন্।—৭।১৯।৮

অতিথিগ্বকে যশস্বী (বা সুখী) করিতে তুর্বশ ও যদুদিগকে বশে আনয়ন কর।

(৩) ৭।১৮।৬

(৪) বি। আনবস্য। তৃৎসবে। গয়ং। ভাক্।
জেষ্ম। পূরুং। বিদথে। মৃধ্রবাচম্।—৭।১৮।১৩

আয়ুর পুত্রের গৃহ (বা রাজ্য) তৃৎসুকে ভাগ করিয়া দেন। যুদ্ধে মৃধ্রবাচ পুরুকে জয় করিব।

(৫) ৭।১৮।১২
সিম। পুরু। নৃসূতঃ। অসি। আনবে। অসি। প্রশর্ধ। তুর্বশে।—৮।৪।১

হে শ্রেষ্ঠ (ইন্দ্র)! আয়ুর পুত্রের নিমিত্ত নেতাদিগের বহু অভিযুত (সোম) তোমাকে আনয়ন করুক; হে প্রশর্ধ! তুর্বশের জন্য (আনীত) হও।

কণ্ব-গোত্র দেবাতিথি একটী সূক্তে এই আনুর পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তথায় দেখিতে পাই, আনুর পুত্র তুর্বশ ও যদুদিগের মধ্যে বাস করেন। আমরা মনে করি, দিবোদাস পরুষ্ণী নদীর যুদ্ধে তুর্বশদিগের বিরুদ্ধে সুদাসের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই মিলনের ফলে দিবোদাস তুর্বশ যদুদিগকে জয় করেন। এই জয়ের সংবাদ অমহীয়ু ও বসিষ্ঠ ঋষির ঋকে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বসিষ্ঠ ঋষির আর এক সূক্তেও আমাদিগের মত সমর্থিত হয়, দেখান যাইতেছে।

রাজা সুদাসের বিজয়-উৎসব-যজ্ঞে বসিষ্ঠ ঋষি যে সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে শম্বর-জয়ের উল্লেখ ও সুদাসের পিতাকে দিবোদাসের মত রক্ষা করিবার প্রার্থনা রহিয়াছে। (১) ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, দিবোদাস ও পিজবন রাজার মধ্যে মিত্রতা ছিল। পরুষ্ণী নদীর যুদ্ধ শম্বর-জয়ের পর ঘটিয়াছিল, তাহাও শম্বর-জয়ের উল্লেখ দ্বারা জানা যাইতেছে। অতএব, দিবোদাসের তুর্বশ-যদু-জয় যে এই সময়ে সাধিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

আমরা এই প্রবন্ধে অতিথিগ্ব দিবোদাসের শম্বর-জয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই বিষয় সপ্রমাণ করিতে গিয়া দেখাইয়াছি যে, ভরদ্বাজ, অথর্ব, বসিষ্ঠ, ভরত, কণ্ব, মনু প্রভৃতি ঋষিগণ একই কালে জীবিত ছিলেন। আরও অবগত হওয়া যায়, যমুনাতীরে ব্রজ ও তাহার দক্ষিণে মৎস্য দেশ, এবং তাহার দক্ষিণে উদব্রজ নামক দেশ বর্ত্তমান ছিল। দিবোদাস উদব্রজ

---

তে। বৃষ্ণঃ। অভিচক্ষ্যং। কৃতং।
পশ্যেম। তুর্বশং। যদুং॥—৮।৪।৭

কামনাপূর্ণকারী তোমার কৃত কার্য্য কীর্ত্তনীয়; তুর্বশ যদুতে (আমরা তোমার কীর্ত্তি) দেখিলাম।

স্থূরং। রাধঃ। শত অশ্বং। কুরঙ্গস্য। দিবিষ্টিষু। রাজ্ঞঃ।
ত্বেষস্য। সুভগস্য। রাতিষু। তুর্বশেষু। অমন্মহি॥—৮।৪।১৯

স্বর্গপ্রাপ্তি হেতু দান সকলের মধ্যে দীপ্ত ও শোভন-ধন-যুক্ত রাজা কুরঙ্গের প্রভূত ধন, শত অশ্ব তুর্বশদিগের মধ্যে লাভ করিয়াছি।

(১) অব। অনা। বৃহতঃ। শম্বরং। ভেৎ।—৭।১৮।২০

স্বয়ং বৃহৎ (শৈল) হইতে শম্বরকে বধ করিয়াছ।

ইমম্। নরঃ। মরুত। সশ্চত। অনু। দিবোদাসম্। ন। পিতরং। সুদাসঃ।—৭।১৮।২৫

হে নেতা মরুৎগণ! সুদাসের পিতাকে দিবোদাসের মত রক্ষা কর।

জয় করিয়া আর্য্যশক্তির বিস্তার করেন। কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে তুর্বশ ও যদুগণ যমুনাতীরে এবং মৎস্য দেশে রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। সরস্বতীতীরে পুরুবংশীয়গণ বাস করিতেন। (১) তাঁহারা তুর্বশ যদুদিগকে, এবং শম্বর ও অর্বুদ দাসকে জয় করিয়া সাম্রাজ্যস্থাপন করেন।

আবু পর্ব্বতের নাম অর্বুদ। ইহাকে টড রাজস্থানের অলিম্পস বলিয়াছেন। (২) অর্বুদ নাম আমরা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। গৃৎসমদের ঋকে বর্ণিত আছে, ইহাকে ইন্দ্র ত্রিতের জন্য বধ করেন। (৩) কণ্ব-গোত্র মেধাতিথি ঋষির স্তোত্রেও অর্বুদ-বধের উল্লেখ আছে। (৪) সায়ন এ স্থলে অর্বুদ অর্থে মেঘ করিয়াছেন। গৃৎসমদ ঋষি একটী স্তোত্রে উরণ, অর্বুদ প্রভৃতি বধের উল্লেখ করিয়াছেন। (৫) আমরা মনে করি, ইহারা কোল ভীল জাতীয় লোক ছিল।

দিবোদাস শম্বর জয় করিলে পর, আর্য্যশক্তি বর্ত্তমান রাজপুতানায় যে আরও বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা অর্বুদ, উরণ ও বাহুদিগের জয় নির্দ্দেশ

(১) উৎ। যৎ। তে। মহিনা। শুভ্রে। অন্ধসী। অধিক্ষিয়ন্তি। পূরবঃ।—৭।৯৬।২
হে শুভ্রে (সরস্বতি)! তোমার মহিমা দ্বারা পুরুগণ (তোমার) উভয় তীরে নিবাস করিতেছে। [বসিষ্ঠ ঋষি।]

(২) The celebrated Aboo, or Arboodha, the Olympus of Rajasthan, was the scene of contention between the ministers of Soorya and these Titans.—*Tod's Rajasthan, P. 76.*

(৩) অস্য। সুবানস্য। মন্দিনঃ। ত্রিতস্য।
নি। অর্বুদম্। বাবৃধানঃ। অস্তঃ॥—২।১১।২০

এই সোমবান ত্রিতের (সোমপানে) মত্ত (ও) বর্দ্ধিত (ইন্দ্র) অর্বুদকে সংহার করিয়াছেন।

(৪) নি। অর্বুদস্য। বিষ্টপং। বর্ষ্মাণং। বৃহতঃ। তির।
কৃষে। তৎ। ইন্দ্র। পৌংস্যম্॥—৮।৩২।৩

হে ইন্দ্র! বৃহৎ অর্বুদের শরীর ও বাসস্থান বিদ্ধ করিয়াছ, সেই বীরকর্ম্ম করিয়াছ।

(৫) অধ্বর্যবঃ। যঃ। উরণম্। জঘান। নব। চখ্বাংসং। নবতিং। চ। বাহূন্।
যঃ। অর্বুদং। অব। নীচা। ববাধে। তং। ইন্দ্রং। সোমস্য। ভৃথে। হিনোত॥
—২।১৪।৪

হে অধ্বর্য্যুগণ! যিনি উরণকে, ৯৯ চক্ষ্বাংস বাহুদিগকে বধ করিয়াছেন, যিনি অর্বুদকে অধোমুখ করিয়া বধ করিয়াছেন; সেই ইন্দ্রকে সোমপূর্ণ করিবার জন্য স্তোত্র দ্বারা প্রীত কর।

সৈন্ধব সৌবর্চল......সামুদ্ররোমকৌদ্ভিদৌষর......লবণবর্গ।—চরক, বিমান-স্থান, ৮।১১৮

সৈন্ধব সৌবর্চল বিড় পাক্য রোমক সামুদ্রক......লবণ-বর্গ। সুশ্রুত:, সূত্র-স্থান। ৪২।১২

রোমক=শাম্ভরী।

করিতেছে। আমরা অনুমান করি, অর্বুদ দাস আবু পর্ব্বতে বাস করিত। এখনও সেই জন্য ঐ পর্ব্বত অর্বুদ দাসের নাম ধারণ করিয়া আর্য্য-বিজয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সাঁওতাল জাতিদিগের মধ্যে যে উরাঁও নামে এক জাতি আছে, তাহা সকলেই জানেন। ইহারাই বেদে উরণ নামে অভিহিত। ইহারা কোন্ পর্ব্বতে বাস করিত, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে ঐ সকল জাতির সহিত আর্য্যগণ যে যুদ্ধ করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

চরক ও সুশ্রুতে রৌমক বা রোমক লবণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা শম্বর হ্রদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া শাম্ভরী নামে খ্যাত। রোমক নাম কেন ইহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ জানা নাই। ঋগ্বেদে আমরা কণ্ব-গোত্রীয় দেবাতিথি ঋষির ঋক্ হইতে জানিতেছি যে, সে কালে রুম নামে এক দেশ ছিল। (১) ঐ দেশে প্রাপ্ত বলিয়া লবণের নাম রৌমক হইয়াছে, মনে করি। তাহা হইলে, বৈদিক যুগে শম্বর হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্থানকে রুম নাম প্রদান করা হইয়াছিল। ইহাতেও দেখা যাইতেছে, রাজপুতানা বৈদিক যুগেই আর্য্য জাতির রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদে কণ্ব-গোত্র সোভরি নামক এক ঋষির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার রচিত একটী ঋকে দিবোদাসের অগ্নির উল্লেখ আছে। (২) তিনি পুরুবংশীয় পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যুর, এবং তৎপুত্র তৃক্ষির যজ্ঞ করেন। (৩) ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, সোভরি ঋষিও ত্রসদস্যু দিবোদাসের সমসাময়িক ছিলেন। অপর এক প্রবন্ধে পুরুকুৎস ও ত্রসদস্যুর কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

দিবোদাসের দুই পুত্রের নাম ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। এক জনের নাম

---

(১) যৎ। বা। রুমে। রুশমে। শ্যাবকে। কৃপে। ইন্দ্র। মাদয়সে। সজ।—৮।৪।২

হে ইন্দ্র! যদ্যপি রুম, রুশম, শ্যাব ও কৃপ (রাজ্যে) তুমি মত্ত হও।

(২) প্র। দৈবঃ দাসঃ। অগ্নিঃ। দেবান্। অচ্ছ। ন। মজ্মনা।—৮।১২।২

বল দ্বারা (জাত) দিবোদাসের অগ্নি দেবদিগের নিকট (গমন) করেন নাই।

(৩) অদাৎ। মে। পৌরুকুৎস্যঃ। পঞ্চাশতম্। ত্রসদস্যুঃ। বধূনাম্।—৮।১৯।৩৬

পুরুকুৎস্যের পুত্র ত্রসদস্যু আমাকে ৫০টী বধূ দিয়াছেন।

যেভিঃ। তৃক্ষিং। বৃষণা। ত্রাসদস্যবম্।
মহে। ক্ষত্রায়। জিন্বথঃ।—৮।২২।৭

হে বৃষদ্বয়! ত্রসদস্যুর পুত্র তৃক্ষিকে মহৎ বলের নিমিত্ত যাহাদের দ্বারা প্রীত কর।

পরুচ্ছেপ ঋষি, এবং অপরের নাম ইন্দ্রোত। (১) পরুচ্ছেপ ঋষির নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি ১ম মণ্ডলের ১২৭ হইতে ১৩৯ ঋক রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

---

# স্থাপত্য শিল্প।

৯

সৌধকে শুদ্ধ বৈশিষ্ট্য-নির্দ্দেশক হিসাবে নির্ম্মিত করিলে ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। এগুলিকে কোনও গভীরার্থ-জ্ঞাপক ভাবে কল্পনা করা উচিত। শব্দের যেমন অভিধা শক্তি বা লক্ষণা শক্তি দ্বারা সমস্ত তাৎপর্য্যের প্রতীতি হয় না, ইহার জন্য যেমন ব্যঞ্জনাশক্তির প্রয়োজন, তেমনই সৌধের বিভিন্ন অঙ্গগুলির যোজনা করিলেই ইহার লক্ষ্যে পঁহুছান যায় না; স্থূলতঃ ইহার উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে, স্বীকার করি, কিন্তু যে সূক্ষ্মার্থ স্থাপত্যের ব্যঞ্জনাশক্তির সাহায্যে বোধগম্য হয়, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? সৌধের অভিধা ও লক্ষণাশক্তির দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহা বাস করিবার বাটী, সমাধি-হর্ম্ম্য, দেবালয়, বা মন্ত্রণাগার; কিন্তু কোন শক্তির সাহায্যে মানুষ বলিবে—

'———মহাকাল পদতলে,
মুগ্ধনেত্রে উর্দ্ধমুখে রাত্রি দিন বলে।
কথা কও, কথা কও, কথা কও প্রিয়ে,
কথা কও, মৌন বধূ, রয়েছি চাহিয়ে।'

(১) বট্। অশ্বান্। অতিথিগ্বে। ইন্দ্রোতে। বধূমতঃ।
সচা। পূতক্রতৌ। সনম্॥—৮।৬৭।১৭

পূতক্রতু অতিথিগ্ব-পুত্র ইন্দ্রোত হইতে বধূযুক্ত ছয় অশ্ব লাভ করিয়াছি।

[ অঙ্গিরা-গোত্র প্রিয়মেধ। ]

পাঠকদিগের সুবিধার জন্য নিম্নে বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল।—

দেববান
|
পিজবন
বা
দাশরাজা
|
সুদাস

বধ্র্যশ্ব
|
অতিথিগ্ব
দিবোদাস
|
ইন্দ্রোত — পরুচ্ছেপ

সৃঞ্জয়
|
প্রস্তোক

অঙ্গিরা
|
বৃহস্পতি
|
ভরদ্বাজ
|
গর্গ — পায়ু

অথর্ব
|
দধীচি
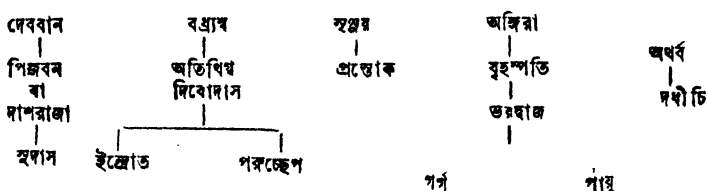
বাস্তবিক, তাজ দেখিলে এরূপ বোধ হয় না কি? তাজের কঠিন বহিরাবরণের নিম্নে যে রূপ রহিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হয় না, এমন মানব-মন কোথায়? বহু বর্ষ পূর্ব্বে চন্দ্রিকাস্নাত তাজের অঙ্গনে দাঁড়াইয়া যে রূপ দেখিয়াছিলাম, তাহাতে বাস্তবিকই বোধ হইয়াছিল,—

'জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা।
ত্রিলোকের হৃদি-রক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা।'

ব্যঞ্জনাশক্তির প্রভাব ও সার্থকতা এই খানে সবিশেষ পরিস্ফুট।

ইংরাজী সাহিত্যসমালোচক প্যাটিসন্ (Pattison) মিল্‌টনের কবিতা-লোচনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে, ব্যঞ্জনাশক্তি না থাকিলে কবিতার সার্থকতা থাকে না। কোনও কবিতার একটি পংক্তিতে যে ভাব অন্তর্নিহিত আছে, হয় ত অন্য কোনও কবিতা-নামধেয় ছন্দোবন্ধের সমগ্র অংশ অন্বেষণ করিলে তাহা মিলিবে না। এইরূপ, সকল সৌধেরই সার্থকতা নাই। দেখিতে বিশালায়তন বা বহুল প্রকোষ্ঠসংবলিত নানাকারুকার্য্যযুক্ত অট্টালিকা অপেক্ষা অনেক সামান্যায়তন সহজ সরল সৌধে যে মন দ্রব হইতে পারে, সে বিষয়ে বিস্মিত হইবার কোনও কারণই নাই। তক্ষশিলার উপকণ্ঠস্থিত জৌলিয়ান্ গিরিশৃঙ্গের উপর যে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের প্রকোষ্ঠ বিন্যাস দেখিয়াছি, তাহা দিবসব্যাপী বৈদ্যুতিক-প্রদীপালোকিত আধুনিক কালের অনেক অট্টালিকায় মিলিবে না। ক্ষুদ্রায়তন মতি মস্‌জিদে যে স্থাপত্য-সম্পৎ বিদ্যমান আছে, বিশালাকৃতি জুম্মা মস্‌জিদ বা 'বাদশাহী' মস্‌জিদে হয় ত তাহার শতাংশের একাংশও নাই।

স্থাপত্যে ভাবদ্যোতক ব্যঞ্জনাশক্তির প্রভাব দেখা গেল। এ শক্তির স্ফুরণ ব্যাপারে ইহার কোন্ অঙ্গগুলি কিরূপ সহায়তা করে, বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। যেখানে জীবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সেইখানেই ভাবের বিকাশ সম্ভবপর। গতিতেই জীবনীশক্তির লক্ষণ পরিস্ফুট; যেখানে গতি নাই, বা তাহা অসম্ভব, সেখানে জীবনীশক্তির লীলা আশা করা যায় না। সকল স্থানেই শুদ্ধ গতি দেখিয়াই যে জীবন আছে মনে করিব, এমন আশা করা যায় না; এমনও হইতে পারে যে, গতিটি প্রচ্ছন্ন বা Potential ভাবে রহিয়াছে, ক্রিয়মাণভাবে বা kinetic ভাবে প্রকাশিত হইবার অবসর পায় নাই। একটি বংশখণ্ডকে বাঁকাইয়া ধনুর আকারে পর্য্যবসিত করিলে আমরা এই আকারে ধরিয়া রাখিতে বিশেষ বল অনুভব করিয়া থাকি। যদিও বাহিরে গতির কোনও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহা

অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, ইহাতে শক্তি বিদ্যমান নাই। ভূতলে শায়িত বংশখণ্ডে শক্তির বিকাশ আশা করা যায় না, কিন্তু ধন্বাকারে পরিণত বংশদণ্ড শক্তিশালী, ছাড়িয়া দিলেই শক্তির বিকাশ প্রত্যক্ষ হইবে। যে কোনও শক্তির বিকাশের সহিত জীবনীশক্তির গতিগত সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহা প্রাণশক্তিব্যঞ্জক বলিয়া কল্পনা করিলে অন্যায় হইবে না; সুতরাং বুঝিলাম যে, যে সৌধ খিলান-যুক্ত, তাহা কেন জীবনীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সৌধকে কত প্রকারে নির্ম্মিত করা যাইতে পারে, এবং ইহার কি প্রকারে অঙ্গ-সন্নিবেশ সম্ভবপর, আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কোনও জানালার মাথায় খিলান দিয়া ভরাট করা যাইতে পারে, কিংবা খিলানের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ বা লৌহ বা অন্য কোনও পদার্থের কড়ি বা সর্‌দাল্ (Lintel) দিয়াও উপরকার ভিত্তি রক্ষিত হইতে পারে। কোনও সৌধ বা প্রকোষ্ঠের শীর্ষদেশ কাষ্ঠ বা লৌহের কড়ি ও টালির সাহায্যে নির্ম্মিত করা যাইতে পারে, কিংবা ইহার উপর গম্বুজ বা অর্দ্ধবর্ত্তুলাকার খিলান সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। কড়ি বা সর্‌দাল্ না বসাইয়া ক্রমবর্দ্ধিত ইষ্টক বা প্রস্তর দ্বারাও নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে; এ পদ্ধতির ইংরাজি নাম corbelling; এ পদ্ধতিতে নির্ম্মিত সর্ব্বোপরি বিন্যস্ত ইষ্টক বা প্রস্তরখণ্ড সর্‌দালের কার্য্য করে বলিয়া আমরা corbelling পদ্ধতির নাম রাখিলাম 'সর্‌দাল্' পদ্ধতি। তাহা হইলে, আমরা দুই প্রকার নির্ম্মাণ-প্রণালীর পরিচয় পাইলাম—খিলান ও সর্‌দাল্ পদ্ধতি। এই দুই প্রকার নির্ম্মাণ-প্রণালীতে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। খিলান বা গম্বুজ সজীবতার পরিচায়ক, কড়ি বা সর্‌দাল্ নির্জীবতার দ্যোতক; শেষোক্তটি যেন চিরনিদ্রিত শবের ন্যায়। ইংরাজীতে একটী প্রবচন আছে যে, 'an arch never sleeps'—খিলান কখনই নিদ্রা যায় না; বাস্তবিক, ইহা সততই জাগ্রত থাকে, কোনও সময়ে কোনও কিছু অসাধারণ ঘটিলেই ইহার সাড়া পাওয়া যায়। কথাটা একটু বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

কড়ি বা সর্‌দাল্‌কে শবের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; জীবনীশক্তির বিকাশ গতির প্রেরণায়; শবের কোনও অঙ্গে আঘাত করিলে অন্য কোনও অঙ্গ স্পন্দিত হয় না; কিন্তু সজীব ব্যক্তির কোনও অঙ্গে আঘাত করিলে, পেশী ও স্নায়ুর সাহায্যে অন্য অংশও কম্পিত হয়। যাঁহারা গতিবিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সবিশেষ অবগত আছেন যে, ভার খিলানের এক অংশ

হইতে আর এক অংশে কিরূপ ভাবে প্রেরিত ও সংক্রামিত হয়। ভারের প্রেরণ বা সংক্রমণ দেখিলে বোধ হইবে যে, খিলানের অঙ্গগুলি মাংসপেশীর ন্যায় স্থিতিস্থাপকতা অথচ কাঠিন্য যুক্ত; কড়ি বা সরদালে এরূপ ভাবে স্থিতিস্থাপকতা দৃষ্ট হয় না। যেখানে সজীবতা সেইখানেই জরা, বা ব্যাধি; যাহার সজীবতা নাই, তাহার জরাও নাই, ব্যাধিও নাই। ভূমি বসিয়া যাইয়া বা অন্য কোনও কারণে ভারের ইতর-বিশেষ, বৈলক্ষণ্য প্রভৃতি ঘটিলে খিলান ফাটিয়া যায়; কড়ি বা সরদালে এ অসুবিধার কোনও সম্ভাবনা নাই। পুনশ্চ, জীব লোককে অধীন রাখিতে যে বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন, ইহা সাধারণের সহজেই বোধগম্য। কি রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ভাবে, বা কি ব্যক্তিগত ভাবে জীব-বিজ্ঞানের এই মূল সূত্রটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিশেষজ্ঞেরা জানেন যে, কি কৌশলের সহিত খিলান বা গম্বুজের উপর কার্য্যকারী বলটিকে ভূমির অংশবিশেষের উপর পাতিত করিতে হয়; ইহা না পারিলে খিলানটি অস্থায়ী হইয়া পড়ে; কোনও সামান্য কারণেই হয় ত খিলানের সহিত সৌধটি ভূমিসাৎ হইয়া পড়িবে। পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে খিলানে বা তৎসদৃশ গম্বুজে সজীবতার পরিচয় পাওয়া গেল।

খিলানের দ্বারা স্থাপত্যে অসাধ্য সাধন হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার সাহায্যে কত বৃহদায়তন স্থানকে যে আবৃত ও সুশোভন করা হইয়াছে, তাহা বলা অসাধ্য। খিলান বা গম্বুজ না থাকিলে তাজের মত বিশাল ও সুন্দর সমাধিহর্ম্ম্যের রচনা কখনই সম্ভবপর হইত না। 'সরদাল' পদ্ধতি দ্বারা নির্ম্মাণেও অনেক সময় সুন্দর সুন্দর ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে, স্বীকার করি; কিন্তু খিলানের মত ইহা সরল, সহজ নহে।

স্থাপত্যের মূল নিয়মই এই যে, এমন অঙ্গের সমাবেশ করিতে হইবে, যাহা স্বয়ম্ সহজ সুন্দর হয়, এবং যাহার সাহায্যে অন্যান্য সুন্দর অঙ্গেরও যোজনা করা যাইতে পারে; খিলানের দ্বারা সৌন্দর্য্য সহজে রক্ষিত হয়, ইহা স্বীকার্য্য, এবং ইহার সমাবেশেও যে অন্যান্য সুন্দর অংশের যোজনা সম্ভবপর হয়, তাহা খিলানের চতুঃপার্শ্ব পরীক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে। খিলানের মধ্যস্থ ও শীর্ষস্থিত প্রস্তরখানির বিষয় চিন্তা করা যাউক।

এই প্রস্তরখানির উপর নানা সুন্দর ভাস্কর্য্যের যোজনা সম্ভবপর হইতে পারে। খিলানের উপরও নানা সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের ব্যবস্থা দ্বারা বিচিত্র সৌন্দর্য্যের কল্পনা করা যাইতে পারে। খিলান যে অতুল সৌন্দর্য্যের আকর,

তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, যে জাতীয় প্রাচীন লোকেরা খিলানের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহারাও তাঁহাদের স্ব স্ব নির্ম্মাণ-পদ্ধতির সাহায্যে খিলানের কল্পনা করিবেন কেন? প্রাচীন হিন্দুদিগের কথা ধরিয়া লওয়া যাউক। তাঁহাদের প্রাচীন সৌধগুলির গাত্রে খিলানাকৃতি অঙ্গের সমাবেশ কেন? ইহারা প্রকৃতপক্ষে খিলান নহে; অর্থাৎ, এগুলিকে কেন্দ্রগ (Radiating) প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত করা হয় নাই। প্রস্তরখণ্ডকে ক্রমে ক্রমে বহিঃবর্দ্ধিত করিয়া খিলান নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই আকৃতি মনোমোহন না হইলে এইরূপ খিলানাকারে অঙ্গের যোজনার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। শুদ্ধ তাহাই কি? যাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের স্থাপত্যের অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ অবগত আছেন যে, ভারতীয় পদ্ধতিতে নির্ম্মিত কত অসংখ্য প্রকারের খিলান বিদ্যমান আছে। শুদ্ধ বারাণসীর মন্দিরগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, 'হিলালীদার ডার', 'পেয়ালাদার ডার', 'তোলওার' প্রভৃতি কত প্রকারের যে খিলান নয়নগোচর হইবে, তাহা বলা অসাধ্য। খিলান শোভন না হইলে অজন্তা, নাসিক, বা কার্লার চৈত্যগুলিতে ইহার এত প্রাচুর্য্য দেখা যাইত না। শুদ্ধ ইহাই নহে; ইহাদের ছাদগুলিও খিলানাকার (vaulted)। খিলান সুন্দর বলিয়াই অজন্তার ১৯ সংখ্যক চৈত্যগুম্ফার দুই পার্শ্বে চতুরস্র বা আয়তাকার কুলুঙ্গির সমাবেশ করিয়া মধ্যদেশে অশ্বক্ষুরাকৃতি খিলানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাচীন বারহুত রেলিংএর উপরকার কারুকার্য্য নিরীক্ষণ করিলে আমরা যে বিহার ও চৈত্যের চিত্র দেখি, তাহাতেও অশ্বক্ষুরাকৃতি ও অন্য আকারের খিলানের প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। কলিকাতাস্থ মিউজিয়মে বারহুতের যে তোরণটি রক্ষিত আছে, তাহার দক্ষিণদিকস্থ স্তম্ভের উপরিভাগ বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা খিলান নির্ম্মিত ছাদযুক্ত ও পার্শ্ব প্রকোষ্ঠ বা aisle সমন্বিত চৈত্যের চিত্র দেখিতে পাই। ইহা নিশ্চয়ই ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত; ইংরাজী পণ্ডিতদিগের সাধারণ মতের অনুসরণ করিয়া কেহ এগুলিকে কাষ্ঠ ও খড় নির্ম্মিত বলিতে সাহসী হইবেন না; যাহা দ্বারাই নির্ম্মিত হউক না, খিলান যে স্থাপত্যের এক আবশ্যক অঙ্গ, এবং উহা দ্বারা যে শোভা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা প্রাচীন স্থপতিরা বিলক্ষণ বুঝিতেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত মহাবলীপুরস্থ রথসংজ্ঞক সৌধগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা শীর্ষে বর্ত্তুলাকার বা খিলানাকার ( vaulted ) গম্বুজ দেখিয়া বুঝি যে, দাক্ষিণাত্যস্থ পল্লব নৃপতিদিগের অধীনস্থ স্থপতিরাও

খিলানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বুঝিতেন। প্রথমোক্ত প্রকারের উদাহরণ-স্বরূপ ধর্ম্মরাজরথ এবং শেষোক্ত প্রকারের জন্য সহদেবরথ ও গণেশরথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি যে প্রকৃতপক্ষে খিলান নহে, পরন্তু খিলানাকৃতি, পাঠক-গণকে ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত মনে করি।

স্থাপত্যে খিলানাকৃতির উপযোগিতা ভারতবাসীরা যে বহু প্রাচীন কাল হইতে বুঝিতেন, তাহা স্থূলতঃ পূর্ব্বোক্ত কথা হইতে বুঝা গেল। এ হিসাবে প্রাচীন গ্রীকেরা একটু পৃথক্‌মতাবলম্বী ছিলেন; তাহা হইলেও, তাঁহাদের দুই একটী প্রাচীন সৌধেও খিলানাকৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ আকৃতিটি সৌধের বহির্দেশে দৃষ্ট হয় না; ইহার অন্তর্দেশেই খিলানাকারের কল্পনা করা হইয়াছিল; কেন যে হইয়াছিল, আমরা এ প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করিব না। সাধ্বী আর্টিমিসিয়ার আদেশে তাঁহার মৃত স্বামী মসোলসের ( Mausolos ) উদ্দেশে নির্ম্মিত সমাধিহর্ম্ম্যের অন্তর্দেশে আমরা খিলানাকারের পরিচয় পাই; আর পরিচয় পাই, গ্রীস দেশের অন্তর্গত নিডাসস্থ (Cnidus) সিংহশীর্ষ সমাধি-হর্ম্ম্যে। রোমকদিগের অভ্যুদয়ে 'ক্রমবর্দ্ধিত' সরদাল প্রণালীর (Corbelling) মূলে বিশেষ আঘাত লাগে, এবং স্থাপত্যের এক বিশেষ যুগ বা যুগান্তরের সূচনা হয়। এ যুগান্তরে স্থাপত্য নবপ্রস্ফুটিত রবিকরোদ্ভিন্ন শিশিরস্নাত প্রসূনের দিব্য কান্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; যাহা কখনই সম্ভবপর হইত না, তাহাও সম্ভাব্য হইয়া উঠিল। আমার মন্তব্যটি বুঝিবার জন্য আমি প্যান্‌থিয়নের চিত্রটির চিন্তা করিতে বলি। প্রথমতঃ মনে করিয়া দেখা যাউক, এক বিঘা দুই কাঠা পরিমাণ বৃত্তাকার ভূমি-খণ্ডের উপর মধ্যদেশে স্তম্ভ বা ভিত্তিহীন একটি প্রকাণ্ড ও অত্যুচ্চ ( প্রায় ১৪১ ফিট উচ্চ ) প্রকোষ্ঠের নির্ম্মাণ কি দুরূহ ব্যাপার! খিলানাকারের সাহায্য না লইয়া ও ভিতরে স্তম্ভের ব্যবস্থা না করিয়া এইরূপ বিস্তৃত স্থানকে আবৃত করা অসম্ভব। 'সরদাল্' পদ্ধতিতে নির্ম্মাণ করিলে দেখা যাইবে যে, ভিতরটা আপনা-আপনি গম্বুজাকার হইয়া পড়িবে, সুতরাং খিলান পদ্ধতিতে নির্ম্মিত না করিলেও আকৃতিটা খিলানের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। প্রকৃতপক্ষে প্যান্‌-থিয়নের গম্বুজের নিম্নদেশের কিয়দংশের নির্ম্মাণে খিলান পদ্ধতির আদৌ সাহায্য লওয়া হয় নাই; সোজাসুজি ক্রমবর্দ্ধিত ভাবে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

উপরিলিখিত কথাগুলি হইতে বুঝা গেল যে, নির্ম্মাণ-ব্যাপারে খিলানের কিরূপ উপযোগিতা; সৌন্দর্য্যবিধানে যে ইহার তদপেক্ষা অধিকতর উপযোগিতা, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। এই স্থলে একটি কথা বলিয়া

রাখা উচিত মনে করি। 'সর্‌দাল্‌' পদ্ধতিতে নির্ম্মাণ করিলে প্রস্তর বা ইষ্টক প্রভৃতি উপকরণের অনেক অপব্যয় ঘটে; অর্থাৎ, খিলানে যে পরিমাণ মাল মশলার প্রয়োজন হয়, ইহাতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রয়োজন হইবে।

বৈষম্য, বৈচিত্র্য প্রভৃতি গুণদ্যোতক হিসাবে অর্দ্ধবৃত্ত বা বৃত্তাংশাকৃতি দ্বারা স্নায়বিক উত্তেজনা সাধিত হইয়া যে সৌন্দর্য্য জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তাহা পূর্ব্বে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে; ইহা ভিন্ন এই সকল আকৃতির সাহায্যে অনেক জটিলাকৃতির সৃষ্টিও সম্ভবপর হয়। অর্দ্ধবৃত্ত হইতে অনুমেয় যে তিন, পাঁচ, বা সাত খাঁজযুক্ত খিলানের প্রচলন দেখা যায়, তাহাতে অনেক স্থানে দিব্য সৌন্দর্য্যের বিকাশ লক্ষিত হয়। আমাদের বঙ্গদেশীয় ঠাকুরদালানের খিলানগুলি দেখিলে আমার মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। এক্ষণে চিন্তা করা যাউক যে, এই খিলানগুলির তিরোধান করিয়া যদি স্তম্ভের উপরে কড়ি বা সরদাল্‌ রক্ষিত হইত, তাহা হইলে দালানটি কিরূপ দেখাইত। ইহা যে নিতান্ত অশোভন হইত, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। চারিধারে কাষ্ঠের ঝিল্‌মিল্‌ দ্বারা বদ্ধ আধুনিক কালের ঠাকুরদালান, নাটমন্দির ও চাঁদ্‌নী দেখিয়া কেহ নিশ্চয়ই বলিবেন না যে, ইহার সহিত দুই তিন শত বৎসরের পুরাতন সেকালের ঠাকুর-দালানের তুলনা হইতে পারে। শান্তিপুরের শ্যামচাঁদের মন্দির, বিষ্ণুপুরস্থ কৃষ্ণরায়ের জোড়-বাঙ্গলা, কিংবা শ্যামরায়ের মন্দির, কিংবা দিনাজপুরের সন্নিকটস্থ কান্তনগরের কান্তজীর মন্দিরের যে কোনও একটি যাঁহারা নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই বলিবেন না যে, ইহাদের খিলানের সৌন্দর্য্য নাই, বা ইহাদের সহিত আধুনিক কালের ঠাকুরদালানের (যেমন কলিকাতাস্থ আনন্দময়ী বা সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির) তুলনা হইতে পারে। তলদেশ মার্ব্বেল প্রস্তরে বা রক্তবর্ণ পেটেণ্ট ষ্টোনে ও ইহা হইতে তিন বা চারি ফুট পরিমাণ উচ্চ গৃহভিত্তি 'মিন্‌টন্‌ টালি' দ্বারা যতই আবৃত করা হউক না, কিংবা সূক্ষ্ম-কারুকার্য্য-যুক্ত ঝাড়-লণ্ঠন বা বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা ইহাদিগকে যতই আলোকিত করা হউক না, ইহারা কখনই সৌন্দর্য্যে ও স্থাপত্য-গৌরবে সে কালের দালানের সমকক্ষ হইতে পারিবে না; ইহাদের 'মিন্‌টন্‌ টালি' বা ঝিল্‌মিল ইহাদিগকে বর্ব্বরতার চিহ্নে মলিন ও নিষ্প্রভ করিয়া রাখিবেই।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলি হইতে আমরা খিলানের বা খিলানাকৃতির উপযোগিতা বুঝিলাম। খিলানকে জীবনীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত রূপে কল্পনা করা হইয়াছে; প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, ভূমিতে অংশবিশেষের উপর খিলানের

উপর কার্য্যকারী বলটি প্রযুক্ত না হইলে সামান্য কারণে ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী। এই বলরেখার অবস্থানকে মানুষের চরিত্রবলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। আমাদের চারি দিকে প্রলোভন বিদ্যমান; এই প্রলোভন সর্ব্বদা আমাদিগকে উৎপথপ্রস্থিত করিতে চেষ্টা করিতেছে; চরিত্রবলের সংরক্ষণ করিতে পারিলে, বা ইহার ধারার রক্ষা করিতে পারিলেই মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা পায়; খিলানের বল-রেখার নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবস্থানের ব্যত্যয় ঘটিলেই ইহার স্থায়িত্বও সংশয়ের বিষয় হইয়া পড়ে। এই কারণেই এঞ্জিনীয়ারেরা খিলানের কল্পনা ও নির্ম্মাণ করিবার সময় সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন, যেন ইহার বল-রেখাটি এক নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কাহারও উপর যাঁহাদের দায়িত্ব রহিয়াছে, তাঁহারাও সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন যে, পূর্ব্বোক্তের চরিত্রবল যেন সর্ব্বদা অব্যাহত থাকে, যেন অভিভাবক নির্দ্দিষ্ট রেখা হইতে ভ্রষ্ট বা বিচ্যুত না হয়। আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা উচিত মনে করি; যদিও বিশেষজ্ঞ পাঠক ভিন্ন সাধারণে ইহার তাৎপর্য্য সহজে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না, ইহার অনুল্লেখে আমার তুলানটি অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে,বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। যাঁহারা ব্যাবহারিক স্থিতি বা গতিবিজ্ঞান ( Applied Mechanics ) পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, খিলানের বল-রেখাটি যতই খিলানের মধ্য দিক দিয়া প্রযুক্ত হইবে, ততই ইহার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, এবং যতই ইহার খিলানের বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিবে, ততই ইহার সাম্য ও স্থায়িত্ব-রক্ষা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। মানুষের চরিত্রও এইরূপ; মানুষের চরিত্র-বলের সহিত যতই ইহার ভিতরে সম্বন্ধ ও যোগ,ততই ইহা প্রকৃত ও স্থায়ী, এবং যে চরিত্রের সহিত মানুষের ভিতরের সম্বন্ধ নাই, যাহা তাহার বাহিরে বাহিরে সামাজিক সুবিধা নিয়ন্ত্রিত হইয়া প্রকটিত হয়, তাহার স্থায়িত্ব কোথায়? সামান্য প্রলোভনেই তাহা অবসন্ন হইয়া পড়িবেই। ইহা আমরা প্রতিনিয়ত পর্য্যবেক্ষণ করি। আমরা দেখি না কি, কত আপাততঃ ঋষিস্বভাব ব্যক্তি প্রলোভনের মায়াচক্রে পড়িয়া কত বিপর্য্যস্ত হইয়া চরিত্র হারাইয়া ফেলিয়াছেন, আর কত সমাজলাঞ্ছিত, পীড়িত ও সাধারণ চক্ষে হীন ব্যক্তি বিষম প্রলোভনে পড়িয়াও আপনার চরিত্র অক্ষুণ্ণ, অব্যাহত রাখিয়াছেন; ইহার মহীয়ান্ মহিমায় সমাজকে দিব্য জ্যোতিতে মণ্ডিত করিয়াছেন। ইঁহাদের চরিত্রবলের যে ঐকতানিক প্রবাহ হৃদয়ের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিত, তাহা কেহ জানিতেও পারে নাই।

আর এক কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। যে মানুষকে যত প্রলো-

ভনের মধ্য দিয়া চলা-ফেরা করিতে হয়, তাহার স্খলনের সম্ভাবনা তত অধিক ; ইহা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হইলে বিশেষ চরিত্রবলের প্রয়োজন, এবং চরিত্ররক্ষা ব্যাপারটি অতিশয় জটিল হইয়া পড়ে। এই প্রকার অবস্থাপন্ন মানুষের আকৃতির সহিত জটিল-আকৃতি খিলান বা গম্বুজের তুলনা করা যাইতে পারে। যাঁহারা মোগল-রীতির অন্তর্গত গম্বুজ-নির্ম্মাণ-প্রণালী নিরীক্ষণ করিবার অবসর পাইয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে,ইহার স্থায়িত্ব-সংরক্ষণে স্থপতিকে কতই না কৌশলের অনুসন্ধান করিতে হয়, এবং ইহার সামান্য ক্রটীতে এবংবিধ কত প্রাচীন খিলান বা গম্বুজ অস্থায়ী হইয়া ভূমিশায়ী হইয়াছে। যাঁহারা গথিক্ রীতিতে নির্ম্মিত গির্জ্জা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন যে, মধ্যস্থ উপাসনা-গৃহের খিলানাকৃতি ছাদ ও তৎসংলগ্ন ভিত্তিকে রক্ষা করিবার জন্য এক একবার খিলানাকার 'চাড়া'র ( flying buttress ) ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং এই চাড়াকে রক্ষা করিবার জন্য বহির্ভিত্তির উপর ভারযুক্ত শেখরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলি হইতে বুঝা গেল যে, খিলানকে বশে আনা, বা ইহার সাম্য রক্ষা করা কি কঠিন ব্যাপার। সম্প্রতি কোনও সুপ্রসিদ্ধ দাতব্য চিকিৎসালয়ের খিলানগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য আহূত হইয়া দেখিলাম, ইহার বহির্ম্মণ্ডপের সমস্ত খিলানগুলি ফাটিয়া গিয়াছে ; এগুলির নির্ম্মাণে সামান্য অনন্যসাধারণত্ব ছিল বলিয়াই এই দুর্দ্দশা। 'সরদাল্' পদ্ধতি বা ক্রমবর্দ্ধিত পদ্ধতিতে এ বিপত্তির সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু ইহাতে খিলানের ন্যায় দিব্য শোভা-বিকাশের সম্ভাবনা ও সুবিধাও নাই।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

# প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস।

[ শ্রীযুক্ত মোনাহান মহোদয়ের সঙ্কলিত চতুর্থ প্রবন্ধের অনুবাদ। ]

**[ অতীশের পরিচয় ও বিক্রমশিলার অবস্থান ;—তিব্বত-রাজ হ্লা লামার বৌদ্ধধর্ম্ম-সংস্কারের চেষ্টা ;—হ্লা লামার নির্য্যাতন ও চ্যান-চাবের সহিত কথোপকথন ;—অতীশকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য চ্যান-চাবের চেষ্টা ও তজ্জন্য নাগ-চোকে ভারতে প্রেরণ ;—নাগ-চোর ভারতযাত্রা ও ভ্রমণকাহিনী। ]**

১

মহীপালের পর তাঁহার পুত্র নয়পাল রাজ্যাধিকারী হয়েন। তারানাথের উক্তি অনুসারে মহীপালের রাজত্ব-কালের পরিমাণ বায়ান্ন বৎসর ; তাহা

অতীশের পরিচয় ও বিক্রমশিলার অবস্থান।

হইলে, নয়পালের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল ১০৩২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। প্রবীণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সংস্কারক অতীশের তিব্বত-গমনই নয়পালের রাজত্বকালের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে হয়। এই অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামেও পরিচিত ছিলেন। পরলোকগত রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস কতকগুলি তিব্বতীয় ইতিহাস-গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া অতীশের যে জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহা হইতে অতীশের জীবনের প্রথম অংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি। নয়পাল কর্ত্তৃক অতীশ বিক্রমশিলা মহা-বিহারের মহাস্থবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই মহাপ্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থান এখনও নির্ণীত হয় নাই; তবে, একখানি তিব্বতীয় ইতিহাস গ্রন্থে উহা গঙ্গার দক্ষিণ তীরে একটি ক্ষুদ্র শৈলের বা টিলার উপর অবস্থিত বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত বর্ণনা অনুসারে ঐ স্থানকে ভাগলপুর জেলার সুলতানগঞ্জ বলিয়াই মনে হয়;—সুলতানগঞ্জে একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নস্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং তথাগতের অস্থ্যাধারযুক্ত একটি স্তূপও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল ভগ্নস্তূপের ভিতর ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি পরিমাণ উচ্চ একটি তাম্রনির্ম্মিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি, এবং দুইটি পাষাণ-মূর্ত্তি, এবং আরও কতকগুলি বৌদ্ধ ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু সুলতানগঞ্জের বিহার যে বিক্রমশিলা-বিহার হইতে অভিন্ন, ইহার কোনও নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মূর্ত্তির উপরে যে সকল লেখ আছে, তাহার লিপি গুপ্ত-যুগ প্রচলিত লিপি। তিব্বতীয় গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, বিক্রমশিলা, নালন্দা এবং বজ্রাসন বা বুদ্ধ-গয়া হইতে অধিক দূরে অবস্থিত ছিল না।

তিব্বত-রাজ হ্লা লামার বৌদ্ধধর্ম্ম-সংস্কারের চেষ্টা।

তিব্বতীয় ইতিহাস গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তিব্বত-রাজ হ্লা লামা নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ছিলেন; তান্ত্রিক বীরাচারের সংমিশ্রণে স্বদেশীয় বৌদ্ধ অধ্যাপকগণের ধর্ম্মমত হীনতা প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি [ ১০২৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত ] থোডিং-এর বিহারে শিক্ষিত করিয়া একবিংশতি-সংখ্যক যুবক বৌদ্ধ শ্রমণকে অধ্যয়নের নিমিত্ত, কাশ্মীরে, মগধে ও ভারতের অন্যান্য যে সকল স্থানে বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল—তথায় প্রেরণ করেন, এবং কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রত্নবজ্রকে ও মগধের বৌদ্ধ মহাস্থবিরকে, এবং এতদ্ব্যতীত তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম-সংস্কার-কার্য্যক্ষম অন্যান্য পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত শ্রমণ-

গণের প্রতি আদেশ করেন। এইরূপে তিব্বতরাজ হ্লা লামা ত্রয়োদশ জন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতের সহায়তা-লাভে সমর্থ হয়েন, কিন্তু ভারতে প্রেরিত ভিক্ষু-গণের মধ্যে উনবিংশ জনই ভারতভূমিতে গ্রীষ্মাধিক্য, জ্বর, সর্পাঘাত প্রভৃতি নানা কারণে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েন। অবশিষ্ট দুই জন লোচাভ—(সংস্কৃতজ্ঞ তিব্বতীয়গণ ঐ নামেই আখ্যাত হইতেন) বিক্রমশিলা দর্শন করিতে গিয়া অতীশের প্রখ্যাতি শুনিতে পান;—অতীশ তৎকালে মগধের বৌদ্ধ সুধীবর্গের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিতেছিলেন, এবং পঞ্চশত অর্হতের ম সজ্ঘিকা নামক সম্প্রদায়ের তিনি দ্বিতীয় 'সর্ব্বজ্ঞ' ছিলেন। লোচাভগণ তাঁহা আমন্ত্রণ করিতে সাহসী না হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং রাজসমীপে তাঁহাদিগের ভারত-যাত্রা-কাহিনী এবং মগধের বৌদ্ধ মহাবিহারের অবস্থা নিবেদন করিলেন। নৃপতি হ্লা লামা, অতীশের দর্শনার্থ অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইয়া শতসংখ্যক অনুচর ও বহুপরিমাণ সুবর্ণ সহ গিয়াৎসন সেন্ জে নামক এক ব্যক্তিকে বিক্রমশিলায় প্রেরণ করিলেন। বিক্রমশিলায় পঁহুছিয়া গিয়াৎসন অতীশকে তিব্বতরাজের পত্র ও তৎসহ বৃহৎ এক খণ্ড সুবর্ণ উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করিলেন, এবং অতীশকে তিব্বতে পদার্পণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলেন। অতীশ উপঢৌকন গ্রহণ করিলেন না, তিব্বত-গমনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। গিয়াৎসন তাহাতে নিরতিশয় কাতর ভাবে ক্রন্দন করি-লেন—আপনার পরিচ্ছদ-প্রান্তে অশ্রুমোচন করিলেন। অতীশ সেই নৈরাশ্যক্ষুব্ধ ভিক্ষুকে যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নৃপতির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

গিয়াৎসন তিব্বতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজসদনে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পুরাংএর দক্ষিণে একটি সুবর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রাজা কিছুকাল পরে, নেপালের সেই সীমান্ত-প্রদেশে অধিকতর সুবর্ণ সংগ্রহের নিমিত্ত গমন করিলেন; সুবর্ণের পরিমাণা-ধিক্য ঘটিলে অতীশের আর তিব্বতাগমনে আপত্তি থাকিবে না, রাজার এইরূপই ধারণা জন্মিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

হ্লা লামার নির্য্যাতন ও চ্যান-চাবের সহিত কথোপকথন।

সুবর্ণখনির নিকট উপস্থিত হইয়া গারলোগ-রাজের সৈন্যগণের সহিত তিব্বত-রাজের সাক্ষাৎকার ঘটিল,—গারলোগ-রাজের অবলম্বিত ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বৈরসম্বন্ধ। এই গারলোগ স্থানটি কোথায়, অথবা ঐ সুবর্ণ খনির অধিকার লইয়া কোনও বিবাদ ছিল কি না, তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না; কিন্তু তিব্বত-

রাজের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা গারলোগ-রাজের সৈন্য-সংখ্যা অধিক ছিল, তাহারা তিব্বতরাজকে বন্দী করিয়া জয়োল্লাস সহকারে আপনাদিগের রাজধানীতে লইয়া গেল। হ্লা লামাকে দেখিয়া গারলোগ-রাজ না কি বলিয়াছিলেন :— 'ইনি মগধ হইতে জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিতকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার করিবেন, তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। আমাদিগের দাসত্ব স্বীকার না করিলে, আমাদিগের ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে, আমরা ইঁহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না।' ইহা হইতেই অনুমান হয়, গারলোগ-রাজের বৈরিতা সুবর্ণখনির বিবাদঘটিত নহে, উহা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষজনিত বটে। সে যাহা হউক, নৃপতি হ্লা লামা গারলোগ-রাজ-কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইলেন। তৎপর, হ্লা লামার ভাগিনেয় চ্যান চাব তাঁহার মুক্তির নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন, গারলোগ-রাজও সম্মত হইলেন;—কিন্তু সর্ত্ত হইল, হয়—হ্লা লামাকে তাঁহাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাদেরই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে হইবে, নয়— নিষ্ক্রয়স্বরূপ হ্লা লামার দৈহিক-আকার-পরিমিত নিরেট সুবর্ণরাশি প্রদান করিতে হইবে। প্রথমোক্ত সর্ত্ত অপেক্ষা শেষোক্ত সর্ত্তই হ্লা লামার পক্ষে গ্রহণীয় হওয়ায়, তাঁহার পুত্রগণ তিব্বতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রজাবর্গের নিকট হইতে সুবর্ণ সংগ্রহের নিমিত্ত অমাত্যবর্গকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু যাহা সংগৃহীত হইতে পারিল, তাহাও প্রয়োজনের পক্ষে ন্যূন রহিয়া গেল। কথিত আছে, সুবর্ণ গলাইয়া যখন বন্দীকৃত নরপতির মূর্ত্তিগঠনের নিমিত্ত ঢালাই করা হইল, তখন দেখিতে পাওয়া গেল, মস্তকনির্ম্মাণোপযোগী সুবর্ণ ন্যূন রহিয়া গিয়াছে। গারলোগ-রাজের অনুমত্যনুসারে হ্লা লামার সহিত তাঁহার ভাগিনেয় চ্যান-চাবের সাক্ষাৎকার ঘটিল, সে কাহিনী অত্যন্ত সকরুণ। চ্যান-চাব তাঁহাকে সমুদয় অবস্থা বুঝাইয়া বলিয়া পরিশেষে ব্যক্ত করিলেন, ইহা তাঁহারই (হ্লা লামার) কর্ম্মফল; ইহাও কহিলেন—'গারলোগ-রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিলে গারলোগ-রাজ মুক্তি প্রদান করিতে সম্মত আছেন।' হ্লা লামা উত্তর করিলেন, 'এই পাপাশয় নাস্তিক নৃপতির অধীনতা-স্বীকার অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে অধিকতর বাঞ্ছনীয়।'

চ্যান-চাব পুনরায় সুবর্ণ-সংগ্রহের নিমিত্ত যাইতে চাহিলেন, কিন্তু হ্লা লামা বলিলেন, 'বৎস, পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম ও চিরাচরিত অনুষ্ঠানসমূহ রক্ষা করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। এ কার্য্যের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমার মতে, আমাদের দেশে বৌদ্ধশাস্ত্রসম্মত নিয়মাবলীই পালন করা কর্ত্তব্য। আমার

যেরূপ কর্ম্ম, তাহাতে আমার আকাঙ্ক্ষিত ধর্ম্মসংস্কার আর আমি দেখিয়া যাইতে পারিব না। আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, যমের দুয়ারেই আসিয়া পড়িয়াছি। আমাকে যদি মুক্ত করিতেও সমর্থ হও, আমাকে দশ বৎসরের অধিক আয়ুঃ দান করিতে সমর্থ হইবে না। আমার বিশ্বাস, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মে আমি বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্য প্রাণপাত করিতে পারি নাই। অতএব এবার আমাকে ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দাও। এই নৃশংস নৃপতিকে সর্ষপপরিমিত সুবর্ণও প্রদান করিও না। সমুদয় ফিরাইয়া লইয়া যাও; ইহা দ্বারা মহাবিহারসমূহের ধর্ম্মকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিও। জনৈক ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতকে তিব্বতে আনয়ন করিও। সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নিকট যদি কখনও কাহাকেও পাঠাও, আমার এই কথাগুলি তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইও; 'বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যের জন্য এবং তাঁহার জন্য সুবর্ণ-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে গিয়া, তিব্বতরাজ হ্লা লামা গারলোগ-রাজের হস্তে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব পণ্ডিত মহাশয় যেন তাঁহাকে জন্মজন্মান্তরে কৃপা করেন--আশীর্ব্বাদ করেন। হ্লা লামার জীবনের প্রধান সংকল্প ছিল,—তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া গিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্কারসাধন করিবেন; কিন্তু হায়! তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। পণ্ডিত মহাশয়ের দিব্য মূর্ত্তি কবে সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য ঘটিবে, তাহারই সতৃষ্ণ প্রতীক্ষায় তিনি তথাগতের শ্রীচরণে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।'

অতীশকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য চ্যান-চাবের চেষ্টা ও নাগ-চোকে ভারতে প্রেরণ।

গারলোগ-রাজ এই সাক্ষাৎকার অধিকতর কাল স্থায়ী হইতে দিলেন না, কাজেই কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গেল; চ্যান-চাব চলিয়া যাইতে যাইতে লৌহ-গরাদে বিশিষ্ট দ্বারের ভিতর দিয়া হ্লা লামার চকিত-দর্শন-লাভের আশায় ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়াছিলেন,—জীবন কাহিনীতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। মাতুলের মুক্তির আশা পরিত্যাগ না করিয়া চ্যান-চাব তিব্বতে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় সুবর্ণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হ্লা লামার মৃত্যু হইল। মাতুলের রাজসিংহাসনে চ্যান-চাব অধিষ্ঠিত হইলেন। পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে ভাগিনেয় হ্লা লামার উত্তরাধিকারী হইলেন, ইহা হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে,—তিব্বত রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারস্বত্ব দুহিতৃবংশেই বর্ত্তিত, সুতরাং পুত্র রাজ্যাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়ই রাজ্যলাভ করিতেন। চ্যান-চাব সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই স্বর্গগত মাতুলের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার

—ভারতবর্ষের এক জন প্রধান পণ্ডিতকে তিব্বতে আনয়ন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার সাধন করিবার, সঙ্কল্প করিলেন; এবং তদুদ্দেশ্যে শূলক্রিম নামক একটি তিব্বতীয় পণ্ডিতকে মনোনীত করিলেন। শূলক্রিম ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে গমন করিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং এক জন বিচক্ষণ লোচাভ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৌদ্ধ অধ্যাত্ম দর্শন বিনয়পিটকে তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বিনয়াধার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই যুবকটি নাগ-চো-বংশীয়, এবং তিব্বতীয় ইতিহাসে তিনি কখনও নিজ শূলক্রিম নামে, কখনও বিনয়াধার রূপে, কখনও বা নাগ-চো ভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁহাকে শেষোক্ত উপাধিতেই উল্লেখ করিব। রাজা চ্যান-চাব নাগ-চোকে ভারতবর্ষে পাঠাইলেন, বলিয়া দিলেন—যদি সম্ভব হয়, অতীশকে তিব্বতে লইয়া যাইতে হইবে, অন্যথায় জ্ঞানে ও পুণ্যে যিনি পণ্ডিতসমাজে অতীশের অব্যবহিত নিম্ন পদ অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহাকেই লইয়া যাইতে হইবে।

নাগ-চোর ভারত-যাত্রা ও ভ্রমণকাহিনী।

নাগ চো পাঁচ জন লোক সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে চলিলেন,—ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত মহাশয়কে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত প্রায় অর্দ্ধ সের পরিমিত একটি সুবর্ণখণ্ড তাঁহার সহিত চলিল; এতদ্ব্যতীত নাগ-চোর নিজের জন্য ১৭ ভরি স্বর্ণ, তাঁহার ব্যয়ের নিমিত্ত ১৭ ভরি স্বর্ণ, এবং মগধের দ্বি-ভাষীকে দিবার নিমিত্ত ১২ ভরি স্বর্ণ তাঁহার সঙ্গে চলিল।

ভারত-সীমান্তে উপনীত হইয়া তাঁহারা একটি বংশনির্ম্মিত গৃহে অবস্থান করিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সুবর্ণের লোভে কতকগুলি স্থানীয় লোক তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে জানিতে পাইয়া তাঁহারা সায়ংকালে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন, এবং সমস্ত রাত্রি পথ চলিয়া প্রাতে এক নেপালী রাজকুমারের দলবলের সহিত তাঁহাদিগের দেখা হইল—তাঁহারাও বিক্রমশিলাতেই যাইতেছিলেন। তাঁহাদিগের সহযাত্রিক হইয়া, স-সঙ্গী নাগ-চো সূর্য্যাস্তকালে গঙ্গাতীরে পঁহুছিলেন। সুতরাং নয়পালের রাজ্যের সীমান্ত-প্রদেশ হইতে গঙ্গাতীর পঁহুছিতে তাঁহাদিগের কিঞ্চিন্ন্যূন অষ্ট প্রহরের প্রয়োজন হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তাঁহারা পদব্রজেই গমন করিয়াছিলেন, এবং পথিমধ্যে স্থানে স্থানে স্বল্পকাল বিশ্রামও করিয়াছিলেন। তাঁহারা গঙ্গার যে স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন, সে স্থানে একটি খেয়াঘাট ছিল, এবং যাত্রী-বোঝাই একখানি খেয়া নৌকা তখনই ছাড়িয়া দিল। খেয়ার নৌকায় তাঁহাদিগের

আর স্থান ছিল না। মাঝি বলিল, ফিরিয়া আসিয়া সে তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিবে। গোধূলির পর নৌকা ফিরিয়া আসিল। নাগ-চো ও তাঁহার পাঁচ জন সহযাত্রীকে নদীতীরে ফেলিয়া রাখিয়া মাঝি রাজপুত্র ও তাঁহার দলবলকে পারে লইয়া চলিল। যতই রাত্রি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা শঙ্কিত হইলেন। নিকটে কোনও বসতি নাই; কিয়দ্দূরে যাহাদের বাস, তাহাদিগেরও দুর্ণাম ছিল বলিয়াই অনুমান হয়।

তীর্থিকগণ বা নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ ও অন্যান্য বিধর্ম্মিগণ বৌদ্ধদিগের প্রতি বৈরভাবাপন্ন ছিল। সুতরাং পান্থগণ বালুকাগর্ভে তাঁহাদিগের সুবর্ণ-সম্পদ প্রোথিত করিলেন, এবং খেয়ার নৌকা আর তাঁহাদিগকে লইতে আসিতেছে না মনে করিয়া অনাবৃত স্থানেই শয়নের ও নিদ্রার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু অধিক রাত্রে, দাঁড়ের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল, নৌকাও আসিয়া উপস্থিত হইল। নাগ-চো মাঝিকে বলিলেন—'আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি আর এখন আসিবে না।' মাঝি উত্তর করিল, 'আমাদের দেশে আইনের শাসন আছে। আপনার নিকট আসিব বলিয়া বাক্যদান করিয়া যদি না আসিতাম, আমার শাস্তি হইতে পারিত।' তৎপর তাঁহারা বালুকাগর্ভ হইতে সুবর্ণ উত্তোলন করিয়া নৌকারোহণ করিলেন, এবং গঙ্গা উত্তীর্ণ হইলেন। নদী-তীরে বিষধর সর্পের ভয় আছে, সুতরাং তথায় যেন তাঁহারা নিদ্রা না যান, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া মাঝি বলিল,—'বরাবর বিহারে চলিয়া যান, সেখানে তোরণ-দ্বারের গম্বুজের নীচে রাত্রিযাপন করিবেন। রাত্রে সেখানে কোনও ভয় নাই। আশা করি, চোরে উপদ্রব করিবে না।' মাঝির এই উত্তরের ভিতর এমন কিছু ছিল যাহা তিব্বতীয়-গণের নিকট নূতন বলিয়া ঠেকিল। মাঝি যেন কিছু সগর্ব্বেই বলিয়া-ছিল—'আমাদের দেশে আইনের শাসন আছে'; তাহাতেই বুঝিতে হয়, ভারতবর্ষে তখনও প্রাচীন সভ্যতা বর্ত্তমান ছিল, ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ সুশাসনে অভ্যস্ত ছিল, ভারতবর্ষে রীতিমত আইনের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল—তিব্বতে হয় ত যাহার অভাব পরিদৃষ্ট হইত। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে,—ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল হইতে আইনের রাজ্য,—ইহার অধিবাসিবর্গ চির-কাল বিধি নিষেধ মানিয়া চলিয়াছে; ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে অশান্তি ও অরাজকতার অভ্যুদয় ঘটিলেও, ভারতবাসিগণ যে সমষ্টি ভাবে, বিধি-নিষেধের প্রচলনকর্ত্তৃরূপে স্থায়ী ও শক্তিশালী শাসনতন্ত্রকেই স্বীকার করিতে সমুৎসুক, সাধারণতঃ তাহারই পরিচয় তাঁহারা প্রদান করিয়াছেন।

এই আখ্যায়িকার ভিতর নানা স্থানে চোরের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, নয়পালের রাজ্যে পুলিশের ব্যবস্থা অসাধারণ কার্য্যদক্ষ ছিল না; পক্ষান্তরে ইহাও দৃষ্ট হইতেছে, কয়েক জন মাত্র লোক বহুল পরিমাণে সুবর্ণ সঙ্গে লইয়া বিনা বিপদ্‌পাতে সুদূর তিব্বত হইতে নেপাল অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া পঁহুছিতে পারিয়াছিলেন।

তিব্বতীয় ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে,—বিক্রমশিলার বৌদ্ধবিহার গঙ্গা-নদীর তীরে একটী ক্ষুদ্র শৈল বা টিলার উপর অবস্থিত ছিল। এই বর্ণনার সহিত সুলতানগঞ্জের অবস্থান মিলিয়া যায়।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয়।

# সহযোগী সাহিত্য।

## মুসলমানগণ কি জাতি?

মান্দ্রাজের অধ্যাপক এম্, রঙ্গস্বামী 'Quarterly Journal of Mythic Society' পত্রিকায়, মুসলমান জাতি যখন ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা কি জাতি ছিলেন, সে সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তাহার একটী চুম্বক দিলাম।

প্রায় আট শত বৎসর ধরিয়া (১০০০ খ্রীঃ—১৮০০ খ্রীঃ) মুসলমানগণ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই মুসলমান রাজত্ব বুঝিতে হইলে, তাহাদের উত্থান-পতনের ইতিহাস জানিতে হইলে, দেশ তাহাদের নিকট হইতে কি পাইল, এবং তাহাদের সংস্পর্শে কি হারাইল, তাহা বুঝিতে হইলে, প্রথমে বুঝিতে হইবে. এই মুসলমান জাতি, যাহারা বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছে, ভারতের ধনভাণ্ডার যাহাদের লুব্ধদৃষ্টিকে বার বার প্রলুব্ধ করিয়া নিজের বিধ্বংসের কারণ হইয়াছে, অবশেষে যাহারা এ দেশে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে এত দিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছে, তাহারা কি শ্রেণীর লোক—কোন্ জাতি। তাহারা যখন প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল, তখন তাহাদের সভ্যতা ও শিক্ষা কিরূপ ছিল, এবং তাহা তাহাদের মধ্যে কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল? বস্তুতই তাহারা সে সময় সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিত কি না, বা তাহারা বর্ব্বর-শ্রেণীভুক্ত ছিল? তাহাদের উপজীবিকা কৃষি, না মেষপালন ছিল? তাহাদের যাহা ছিল, তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত, না আরও চাই, আরও চাই—এইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা তাহাদিগকে উত্তেজিত করিত? নূতন কিছু ভাবের ধারা তাহাদের সমাজে কিরূপ ভাবে গৃহীত হইত, না তাহারা নূতনকে বর্জ্জন করিয়া চলিত? নূতনের তরঙ্গ তাহাদের মনে কিরূপ ঢেউ তুলিত? মুসলমান রাজত্বকে ঠিক করিয়া বুঝিতে হইলে, এ সকল প্রশ্ন ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে, নচেৎ তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞানলাভের আশা নাই।

তাঁহারা মুসলমান ছিলেন, এইটুকু প্রথমেই আমরা দেখি। এই মুসলমানত্বই কি তাঁহাদের সব ছিল? মুসলমান ধর্ম্ম ছাড়া আর কি কিছু তাঁহাদের ছিল না? ছিল বৈ কি—মহম্মদের ধর্ম্ম ছিল তাঁহাদের ধর্ম্ম—এই ধর্ম্ম তাঁহাদের সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কারের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা কি জাতীয় মানুষ ছিলেন, কি জাতীয় শিক্ষা, সংস্কার ও সভ্যতায় তাঁহাদের জীবন মন গড়িয়া উঠিত, তাহা দেখিতে হইবে। যে সকল মহম্মদপন্থী মানব ভারতবর্ষে বিজয়িবেশে আসিয়াছিলেন, আরবগণই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। ৭১২ খ্রীঃ সিন্ধু প্রদেশে আরবদের বিজয়পতাকা প্রথম উড্ডীন হইয়াছিল, কিন্তু সে অতি অল্প দিনের জন্য। তাঁহাদের আগমন পদ্মপত্রের জলবিন্দুর ন্যায় কোনও রেখাপাত না করিয়াই ঝরিয়া পড়িয়াছিল। সিন্ধু প্রদেশে তার পর আর যদি কোনও মুসলমান-আক্রমণ না হইত, তাহা হইলে এই আরব-আক্রমণের কাহিনী শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই থাকিয়া যাইত। দেশের স্তরে ইহার কোনও চিহ্নই তাহা রাখিয়া যাইতে পারে নাই। আরবরা আর ভারত আক্রমণ করেন নাই। তার পর যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ বা তুর্কী, কেহ বা আফগান। তুর্কীরাই অধিকবার ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। বিখ্যাত গজনীর মামুদ ও তাঁহার সৈন্যগণ সবাই তুর্কী ছিলেন। যে দাসবংশ প্রায় সমস্ত ত্রয়োদশ শতাব্দী ধরিয়া দিল্লীর ভাগ্যগগনে উদীয়মান ছিলেন, তাঁহারাও তুর্কী। তোগলকবংশ (১৩২১—১৪১৪ খ্রীঃ) ও মুঘল বংশ (১৫২৬—১৮৫৭ খ্রীঃ) উভয়েরই পূর্ব্বপুরুষ তুরুষ্ক দেশের লোক। আফগানেরা তুর্কীদের অপেক্ষা অল্প দিন ভারতের রাজদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। খিলিজিরা (১২৯০—১৩১৪ খ্রীঃ), সৈয়দরা (১৪১৪—১৪৫১ খ্রীঃ), লোদীরা (১৪৫১—১৫২৬ খ্রীঃ), সকলেই আফগান ছিলেন। যে শেরশাহ কিছু দিনের জন্য (১৫৩৯—১৫৫৬ খ্রীঃ) মুঘল রাজলক্ষ্মীকে ভারতের রত্নসিংহাসন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তিনিও আফগান ছিলেন। কিন্তু তুর্কীরাই বেশী প্রবল হইয়াছিল। আফগানের সৌভাগ্য-রবি অধিক দিন ভারতগগন আলোকিত করিয়া রাখিতে পারে নাই। তুর্কীদের প্রভাব ভারতবর্ষে কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় দাক্ষিণাত্যের তামিল ও তেলগু ভাষার মধ্যেও পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে তুর্কী বলিলেই মুসলমান বুঝিতে হয় (তামিলে তুলখান, তেলগুতে তুরকদু)। এই ভারতবিজয়ীরা তুর্কী বা আফগান, যাহাই হউক না কেন, ইঁহাদের সভ্যতার ধারা প্রায়ই একই রকম ছিল। তাঁহারা যে মহাজাতির অংশ হউন না কেন, যখনই যে কোনও বেশে ও উপায়ে ভারতে আসুন না কেন, যে বংশেরই লোক হউন না কেন, রাজ্যশাসনপ্রণালী, সামাজিক প্রথা, সভ্যতার বিকাশ, সকল মুসলমান রাজাদের মধ্যেই প্রায় একই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে একরূপ রাজনীতিক বন্দোবস্ত, সামাজিক নিয়ম ও সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম, তাঁহাদের এই আট শত বৎসরব্যাপী রাজত্বকে, তাঁহাদের জাতিগত ও বংশগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও, অখণ্ড করিয়া রাখিয়াছিল। দাস বা তোগলক, আফগান বা মুঘল, সব রাজত্বেই একই আদর্শ, একই প্রথা, একই গুণ, একই দোষের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার অন্যতম কারণ,—তাঁহাদের সভ্যতা ও শিক্ষা পরস্পর সংসৃষ্ট ছিল।